প্রথম মুদ্রণ

১৩৬৬

৪২, কর্নওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা-৬, ডি এম লাইব্রেরীর পক্ষে
শ্রীগোপালদাস মজুমদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং শ্রীভোলানাথ
হাজরা রূপবাণী প্রেস ৩১, বাদুড়বাগান স্ট্রীট
কলিকাতা-৯ হইতে মুদ্রিত।

মা-কে

—আশা

নিবেদন

এই গ্রন্থটি রচনায় বহু সুধী ব্যক্তির নিকট হইতে নানা ভাবে সহায়তা পাইয়া উপকৃত হইয়াছি। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক চিরহিতার্থী শ্রীযুক্ত দেবীপদ ভট্টাচার্য্য প্রথম হইতেই নানাভাবে উৎসাহ ও সহযোগিতা দান করিয়াছেন। শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাস মূল্যবান উপদেশ দিয়াছেন, সাহিত্য পরিষদের সম্পাদক শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এবং কর্ম্মী শ্রীযুক্ত অনাদি দাসের অকুণ্ঠ সাহায্যও কৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করিতেছি—অনাদিবাবুর অশ্রান্ত শ্রম না থাকিলে বহু গ্রন্থই দৃষ্টির অগোচরে থাকিয়া যাইত। পরিষদের অপর কর্ম্মী শ্রীযুক্ত সনৎকুমার গুপ্তের ব্যক্তিগত সংগ্রহ হইতেও উপকৃত হইয়াছি। কয়েকখানি মূল্যবান বই দিয়াছেন সাহিত্যিক ও সাংবাদিক আত্মীয় প্রতিম শ্রীযুক্ত প্রাণতোষ ঘটক। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের রীডার মাননীয় ডক্টর শ্রীযুক্ত তারাপদ মুখোপাধ্যায় এবং লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক কীর্ত্তিমান ছাত্র স্নেহাস্পদ শ্রীমান শিশিরকুমার দাস কয়েকটি অপ্রাপ্য গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া দিয়া বইখানির গৌরব বাড়াইয়াছেন—তাঁহাদের ঋণ অপরিশোধ্য। কল্যাণীয় শ্রীমান অমলেন্দু চক্রবর্ত্তী ও শ্রীমান রুদ্রপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী নানা উপলক্ষ্যে আমার জন্য যে শ্রম স্বীকার করিয়াছেন সেজন্য তাঁহাদের আশীর্ব্বাদ জানাইতেছি। ডি. এম লাইব্রেরীর শ্রীযুক্ত গোপালদাস মজুমদার এবং শ্রীযুক্ত অমূল্যগোপাল মজুমদার এই গ্রন্থের প্রকাশে যে যত্ন ও অর্থব্যয় বরণ করিয়াছেন, তাঁহাদের ব্যক্তিগত স্নেহ-প্রীতির কথা মনে রাখিয়া সেজন্য ধন্যবাদ জানাইতেও কুণ্ঠা বোধ করিতেছি।

—লেখিকা

বাংলা শিশু-সাহিত্যের ক্রমবিকাশ

(১৮০০-১৯০০)

আশা গঙ্গোপাধ্যায়

সূচী

মুখবন্ধ

উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলা শিশু সাহিত্যের যে আবির্ভাব এবং ক্রমবিকাশ ঘটিয়াছিল তাহার একটি ইতিহাস রচনা করাই এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য। ১৮১৮ সালে বাংলা ভাষায় প্রথম সাময়িক পত্র "দিগ্‌দর্শন" প্রচারিত হয়। শিক্ষার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া ছাত্রপাঠ্য বিচিত্র বিষয়-বস্তুর সমাবেশে প্রচারিত এই পত্রিকাটিকেই আধুনিক বাংলা শিশু-সাহিত্যের প্রথম সূচনা বলিতে পারি। কারণ ইহার পূর্ব্বে রূপকথা, লোককথা বা ছড়া ব্যতীত শিশুদের জন্য কোনো সাহিত্যের প্রসার আমাদের দেশে হয় নাই। সংস্কৃত সাহিত্যের "পঞ্চ-তন্ত্র" বা "হিতোপদেশ" আংশিকভাবে এই পর্য্যায়ে পড়িতে পারে—কিন্তু তাহা সর্ব্ববয়সের নরনারীর জন্য সর্ব্ববিষয়ের উপদেশের আকর—শিশুদের জন্য বিশেষভাবে তাহার কোনও ভূমিকা নাই। উনিশ শতাব্দীতে ইউরোপীয় প্রভাবেই আমাদের দেশে প্রথম আধুনিক অর্থে শিশু-সাহিত্য (Juvenile Literature)-এর জন্ম হইল।

এইখানে "শিশু" কথাটির অর্থ একটু পরিষ্কার করিয়া লইতে চাই। "মুকুলে" শিবনাথ শাস্ত্রী বলিয়াছিলেন যে নিতান্তই চার-পাঁচ বৎসরের শিশু বলিতে যাহাদের বুঝায়, তাহাদের জন্য কোনও সাহিত্য রচনা সম্ভব নয়, সুতরাং শিশুর সীমা তিনি ৮।৯ হইতে ১৫।১৬ পর্য্যন্ত প্রসারিত করিয়াছিলেন। এই আলোচনায় শাস্ত্রী মহাশয়ের নির্দ্দেশ অনুসরণ করিয়াই অগ্রসর হইয়াছি, সুতরাং "শিশু-সাহিত্য" বলিতে এখানে আমাদের গণ্ডী কৈশোর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে।

আলোচনার সূত্রপাতে আমরা সংস্কৃত সাহিত্যের প্রাচীন উত্তরাধিকার এবং রূপকথা ও ছড়ার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়াছি, তাহার পর মূল প্রসঙ্গে প্রবেশ করিয়াছি। প্রধানতঃ **তিনটি কাল বিভাগে**

এই আলোচনা বিন্যস্ত হইয়াছে। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ ১৮০০ সালে প্রতিষ্ঠিত হইলে সিভিলিয়ানদের শিক্ষার্থে যে-সমস্ত সরল পাঠ্য পুস্তকাবলী কেরী এবং অন্যান্য পণ্ডিতেরা সংস্কৃত ও ফার্সী হইতে অনুবাদ করিতে শুরু করেন—তাহাতেই অল্পবয়স্কদের জন্য বিশেষ রচনার সূচনা হইল। কের, মৃত্যুঞ্জয় ও গোলোকনাথ শর্ম্মা প্রভৃতি ইহাতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করিলেন। ১৮১৭ সালে স্কুল বুক সোসাইটির প্রতিষ্ঠা হইলে প্রচুর বালকপাঠ্য গ্রন্থ প্রকাশিত হয়, তাহাতে ইতিহাস-ভূগোল-বিজ্ঞানের সমারোহের মধ্যেও এমন কিছু গ্রন্থের সন্ধান মেলে যেগুলিকে শিশু-সাহিত্যের পর্য্যায়ে আনা যাইতে পারে। ইহারই পরিপূরকরূপে দেখা দেয় "দিগ্‌দর্শন" পত্রিকা —"যুবলোকের কারণ সংগৃহীত নানা উপদেশ"। "পশ্বাবলী" প্রমুখ আরো কয়েকটি পত্রিকাও আবির্ভূত হয় এবং শিক্ষাকে চিত্তহারী করিবার জন্য উপদেশাত্মক অসংখ্য গ্রন্থ বাহির হইতে থাকে। ইহাদের মধ্যে "সদ্‌গুণ ও বীর্য্যের ইতিহাস" (১৮২৯) সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান গ্রন্থ। ইহাতে সুন্দর সরল ভাষায় যে সমস্ত সুপ্রসঙ্গ আলোচিত হইয়াছে সমসাময়িক এবং পরবর্ত্তীকালে কোনো সমজাতীয় গ্রন্থে সে উৎকর্ষ দেখিতে পাইনা। এই বিস্তৃত গ্রন্থখানির উপর কিছু আলোকপাত করিতে পারিয়া আনন্দলাভ করিয়াছি।

এই সময় বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমারের আবির্ভাব ঘটে। বিদ্যাসাগর তাঁহার সর্ব্বতোমুখী জীবন-সাধনায় শিশু-কিশোরদেরও উপেক্ষা করেন নাই—তাঁহার আশ্চর্য্য ভাষায় অনুবাদের আশ্রয়ে হইলেও এমন কয়েকটি মনোরম রচনা রাখিয়া গিয়াছেন যেগুলি শিশু-সাহিত্যের প্রথম অরুণরাগ বলিয়া চিহ্নিত হইতে পারে। অক্ষয়কুমার দত্তের "চারুপাঠ" উদ্দেশ্যতঃ "টেকস্‌ট্" বই হইলেও মনীষী লেখকের প্রজ্ঞার স্পর্শে বইখানি শিশুদের জন্য একটি জ্ঞানভাণ্ডারে পরিণত হইয়াছে। এই পর্য্যন্ত সময়কে আমরা শিশু-সাহিত্যের প্রথম পর্ব্ব বলিয়া ধরিয়া লইয়াছি।

কিন্তু দ্বিতীয় পর্ব্বটি ইহার আগেই শুরু হইয়া গিয়াছিল রাজেন্দ্রলাল মিত্র ও তাঁহার অসাধারণ পত্রিকা "বিবিধার্থ সংগ্রহ" (১৮৫১) হইতে। এই পত্রিকা প্রকাশিত হয় ঐ বৎসরেই প্রতিষ্ঠিত "ভার্ণাকুলার লিটারেচার কমিটি"র উদ্যোগে। বিদ্যাসাগর, রাধাকান্ত দেব, হজসন প্র্যাট্ ও রেভারেণ্ড লং প্রভৃতির নেতৃত্বে বাঙ্গলার ঘরে ঘরে ধর্ম্ম-নিরপেক্ষ সুসাহিত্য সঞ্চারিত করিয়া দিবার জন্য "ভার্ণাকুলার লিটারেচার কমিটি"র আবির্ভাব। ইহারই মুখপত্র "বিবিধার্থ সংগ্রহ"।

মহামনীষী রাজেন্দ্রলালের অগণ্য কীর্ত্তির অন্যতম হইতেছে এই পত্রিকাটি। আবাল বৃদ্ধ-নরনারীর নিকট সামগ্রিক জ্ঞান ও আনন্দের পশরা পৌঁছাইয়া দিবার জন্য "বিলাতী পেনী ম্যাগাজিনের" আদর্শে ইহা কল্পিত। এমন উচ্চশ্রেণীর পত্রিকা বাংলা দেশে খুব বেশী বাহির হয় নাই—রবীন্দ্রনাথ তাঁহার "জীবনী-স্মৃতি"-তে সশ্রদ্ধভাবে ইহাকে স্মরণ করিয়াছেন। নীলকরদের বিরুদ্ধে অভিযান চালাইয়া রাজরোষে ইহা বন্ধ হইয়া গিয়াছিল—পরে "রহস্য-সন্দর্ভ" পত্রিকারূপে পুনর্জ্জন্ম গ্রহণ করে।

ইহাও এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় যে বিশুদ্ধ শিশু-পত্রিকার কোনো কল্পনা তখন কেহ করেন নাই, করিতে পারেন নাই। যাহা কিছু সরল ও সহজ করিয়া লেখা হইত, তাহার লক্ষ্য থাকিত শিশু, নারী ও মোটামুটি অক্ষরজ্ঞান-সম্পন্ন জনসাধারণ। রাজেন্দ্রলালের পত্রিকা দুখানিও সেইভাবেই কল্পিত—এবং তরুণ পাঠকেরা সেদিন এই দুইটি পত্রকে নিজেদের বলিয়া বরণ করিয়া লইয়াছিল। ইহার সঙ্গেই জন্ম লইল "গার্হস্থ্য গ্রন্থাবলী" প্রকাশের জন্য "বঙ্গ ভাষানুবাদক সমাজ।" 'ভাষানুবাদক সমাজে'র সহ-সম্পাদক ছিলেন মধুসূদন মুখোপাধ্যায়। আমাদের একান্ত দুর্ভাগ্য, বাংলা-সাহিত্যের ইতিহাস লইয়া যাঁহারা আলোচনা করেন, তাঁহারা অক্লান্তকর্ম্মী মধুসূদন ও তাঁহার অন্যতম সহযোগী রামনারায়ণ বিদ্যারত্নকে প্রায় উপেক্ষাই করিয়া যান। মধুসূদন যদিবা সামান্য উল্লিখিত হন, রামনারায়ণ তো,

একেবারেই বিলুপ্ত হইয়াছেন। বাংলা সাহিত্যের ভবিষ্যৎ ইতিহাস-প্রণেতাদের বঙ্গভাষানুবাদক সমাজ এবং ইঁহাদের দিকে বিশেষভাবে দৃষ্টিপাত করিতে অনুরোধ জানাই।

মধুসূদন, প্র্যাট্-লং-কাউয়েল প্রভৃতির উপদেশ অনুযায়ী শিশু-নারী-স্বল্প শিক্ষিত—সকলেরই জন্য সরল ভাষায় অসংখ্য অনুবাদ রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার অধীতির গণ্ডী বিশাল—হ্যান্স্ অ্যাণ্ডারসন, ইভান ক্রিলভ, কমোডোর পেরী—কাহাকেও তিনি বর্জ্জন করেন নাই। দীর্ঘকাল ধরিয়া মধুসূদন বাঙালীর জন্য সুখপাঠ্য সৎসাহিত্যের যোগান দিয়াছেন। রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন চমৎকার ভাবানুবাদ করিতেন—তাঁহার 'সত্যচন্দ্রোদয়' ও 'গোপাল-কামিনী' নামে উৎকৃষ্ট বই দুখানিকে তমসা হইতে উদ্ধার করিয়া গৌরব বোধ করিয়াছি।

অনুবাদক সমাজের প্রভাবে দেশে শিশু-নারী ও স্বল্প-শিক্ষিতদের জন্য সাহিত্য সাধনার সমারোহ পড়িয়া যায়। আমরা সাধ্যমত কতকগুলির পরিচয় দিয়াছি, তাহাদের মধ্যে হরিনাথ মজুমদারের "বিজয় বসন্ত" বইখানিকে বিশেষ মূল্যবান মনে করি। কারণ যতটা সন্ধান পাইয়াছি, তাহাতে এটিকেই বাংলা শিশু সাহিত্যের প্রথম মৌলিক উপন্যাস বলিয়া মনে হইতেছে।

তৃতীয় পর্ব্ব আরম্ভ করিয়াছি ১৮৬৯ হইতে এবং শেষ করিয়াছি ১৯০০ সালে। বাংলা শিশু-সাহিত্যের ইতিহাসে এই অধ্যায় সর্ব্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। ১৮৬৯ সালে ক্রিশ্চিয়ান পত্রিকা "জ্যোতিরিঙ্গণ" প্রকাশিত হয়। গোঁড়া মিশনারীরা ইহাতে নগ্ন-নির্লর্জ্জ ভাবে হিন্দু-ব্রাহ্ম বিদ্বেষ প্রচার করিলেও সার্থক শিশু-পত্রিকার ইহাই প্রথম প্রয়াস। ইহার পর হইতেই দেশে শিশু-পত্রের স্বর্ণযুগ আসিয়া গেল। মিশনারী সম্প্রদায় ও তাঁহাদের প্রভাবিত গোষ্ঠীর হাত হইতে ব্রাহ্ম-সমাজ নেতৃত্ব গ্রহণ করিলেন। কেশবচন্দ্র সেনের "বালকবন্ধু" (পাক্ষিক) দেখা দিল (১৮৭৮) সালে; দীর্ঘায়ু না হইলেও ইহাই যেন ভবিষ্যতের পথনির্দ্দেশ করিয়া দিল। তাহার পর আসিল কর্ম্মযোগী প্রমদাচরণের "সখা"

(১৮৮৩), সুশিক্ষা ও আনন্দ পরিবেষণে ইহা শিশু-পত্রিকার নূতন ইতিহাস রচনা করিল। জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর সম্পাদনায় ঠাকুর বাড়ীর সাহিত্য-গোষ্ঠীকে কেন্দ্রীভূত করিয়া আসিল অসামান্য "বালক" (১৮৮৪)—ইহাতেই রবীন্দ্রনাথ প্রথম শিশু-সাহিত্য রচনায় কলম ধরিলেন। তাঁর পরে দেখা দিল ভুবনমোহন রায়ের "সাথী" ও "সখা ও সাথী" (১৮৯৩,৯৪) এবং আচার্য শিবনাথ শাস্ত্রীর অত্যুৎকৃষ্ট পত্রিকা স্বনামধন্য "মুকুল" (১৮৯৫)।

এই সব পত্রিকার মাধ্যমে যে লেখকেরা আত্মপ্রকাশ করিলেন, তাঁহারা সাম্প্রতিক বাংলা শিশু-সাহিত্যের অগ্রনায়কের দল। রবীন্দ্রনাথ তো আছেনই, সেই সঙ্গে আসিলেন উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, যোগীন্দ্রনাথ সরকার, নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য, গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী, দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু, জগদানন্দ রায়, হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, দীনেন্দ্রকুমার রায় ও জলধর সেন প্রভৃতি। এই পর্ব্বেই শিক্ষার প্রত্যক্ষ শাসন হইতে শিশু-সাহিত্য মুক্তিলাভ করিল। চিন্তাশীল নবীন লেখকেরা বুঝিলেন, শিশুদের সর্ব্বাঙ্গীণ মানসোৎকর্ষ সাধন করিতে হইলে আনন্দকে পুরোভাগে রাখিয়া নীতিকে নেপথ্যে নিহিত করিতে হইবে এবং তাহাতেই তাঁহাদের উদ্দেশ্য অধিকতর সাফল্য অর্জ্জন করিবে। যোগীন্দ্র নাথের 'হাসি ও খেলা' 'খেলার সাথী' এবং অবনীন্দ্রনাথের 'শকুন্তলা' 'ক্ষীরের পুতুল' এই দিক হইতে অনন্য কৃতিত্বের নিদর্শন।

শিক্ষার সহিত প্রত্যক্ষ সংযুক্ত এবং বিযুক্ত শিশু-সাহিত্যে এ-কালের অপর বৈশিষ্ট্য জাতীয় চেতনার উদ্বোধন। বহু মূল্যবান জীবনী গ্রন্থ এই দেশাত্মবোধের বাণীবহ হইয়া দেখা দিয়াছে। এগুলি সম্পর্কে একটু বিশদ ভাবেই আলোচনা করিয়াছি। উনিশ শতাব্দীর শিশু-সাহিত্য সাধনার পরিণতিরূপে বিংশ শতাব্দীরও একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় যোজনা করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

সর্ব্বশেষ অধ্যায়ে উনিশ শতকে বিশ্ব শিশু-সাহিত্যের একটি রেখাচিত্র দিয়াছি—কারণ বাংলা দেশে আধুনিক শিশু-সাহিত্য সেখান

হইতেই প্রেরণা গ্রহণ করিয়াছে। এই অধ্যায়ের দ্বিতীয় অংশে শিশু সাহিত্যের মর্ম্মকথাও সংক্ষেপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

মোটামুটি ভাবে ইহাই গ্রন্থটির পরিকল্পনা।

শিশু-সাহিত্যের ইতিহাস রচনার পথ সহজ নয়। বস্তুতঃ উনিশ শতকের শেষ ভাগে না আসা পর্য্যন্ত পাঠ্য-পুস্তকের সহিত শিশু-সাহিত্যের কোন সীমারেখা নির্ণয় করাই অসম্ভব—এক মাত্র গার্হস্থ্য গ্রন্থাবলী একটি বৃত্তরেখা আঁকিয়া কিছুটা স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়াছে। গ্রন্থসন্ধানও দুরূহ। বয়স্কের পঠিতব্য বইগুলি সযত্নে রক্ষিত হইয়াছে ; কিন্তু যাহা শিশু-গ্রন্থ—প্রধানতঃ বিদ্যালয় পাঠ্য, তাহা পড়া সাঙ্গ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হইয়া মহাকালের কুক্ষিতে স্থান পাইয়াছে। তাহাদের পুনরুদ্ধার অসম্ভব। বেঙ্গল লাইব্রেরির ক্যাটালগে, নানা-সমালোচনায় ও বিজ্ঞাপনে, অনেকগুলির নামোল্লেখ মাত্র পাওয়া যায়, কিন্তু তাহাদের আর খুঁজিয়া পাইবার পথ নাই।

নাম দেখিয়াও সব সময় শিশু পাঠ্য বলিয়া চিনিবার জো নাই। 'গোপাল-কামিনী' নামকরণ হইতে কে বলিবেন ইহা 'জীবন-তারা' বা 'কামিনী-কুমার' জাতীয় বই নয়, শিশু উপন্যাস? চণ্ডীচরণ সেনের অনুবাদ গ্রন্থ 'টমকাকার কুটীর'কে (Uncle Tom's Cabin) শিশু পাঠ্য বলা হইয়াছে বোধ হয় নাম দেখিয়াই কিন্তু ভিতরে চোখ বুলাইলেই বুঝা যাইবে এই বিপুল গ্রন্থখানি ছোটদের জন্য নয়। কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের 'সদ্ভাব শতক' হইতে কোন কোন কবিতা বাল্য-পাঠ্য হইতে পারে কিন্তু সমগ্রভাবে ইহাকে কিছুতেই শিশু গ্রন্থ বলা যাইতে পারে না। অন্য দিকে প্রমদাচরণ সেনের 'চিন্তাশতক' ব্রাহ্ম সমাজের নীতি প্রচারের জন্যই প্রধানতঃ প্রকাশিত হইলেও ইহা ১৪ —১৫ বৎসরের বালকদের হাতে সাদরে তুলিয়া দিবার সামগ্রী।

এই পথে অগ্রসর হইয়া যাহা কিছু তথ্য সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, তাহা দ্বারা বাংলা শিশু-সাহিত্যের প্রথম পর্য্যায়ের একটি পরিপূর্ণ পরিচয় দিবার চেষ্টা এই গ্রন্থে করিয়াছি। অসংখ্য নূতন নূতন বইয়ের

সন্ধান পাইয়াছি এবং আমাদের পূর্বগামিগণ শিশু-সাহিত্যের মাধ্যমে জাতীয় চরিত্রগঠনের যে বিপুল কর্ম্মোদ্যম রচনা করিয়া গিয়াছেন, তাহা দেখিয়া তাঁহাদের প্রতি শ্রদ্ধায় মস্তক অবনত হইয়াছে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক পরম পূজনীয় ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত এই গবেষণা কার্য্যে দিগ্‌দর্শায়কের ভূমিকা লইয়া লেখিকাকে চিরকৃতার্থ করিয়াছেন। তাঁহার সজাগ সতর্ক দৃষ্টি, জ্ঞানগর্ভ উপদেশ এবং সস্নেহ অনুপ্রেরণা না থাকিলে এই কাজ সম্পূর্ণ করা আমার পক্ষে কখনোই সম্ভব হইত না।

হীরালাল মজুমদার মেমোরিয়াল
মহিলা কলেজ, দক্ষিণেশ্বর,
কলিকাতা-৩৫

—আশা গঙ্গোপাধ্যায়

প্রথম অধ্যায়

শিশু-সাহিত্যের পূর্ব্বলক্ষণ

॥ ১ ॥

সূচনা : উত্তরাধিকার

প্রাচীন ভারতের দিকে চাহিয়া দেখি, সেখানে জীবন-সাধনার কী বিপুল সমারোহ! দর্শন ও তত্ত্বজিজ্ঞাসার ক্ষেত্রে অতীত ভারতবর্ষ পৃথিবীর সমস্ত দেশকে ছাড়াইয়া গিয়াছিল; আর্য্যভট্ট, বরাহ-মিহির ও নাগার্জ্জুন গণিত শাস্ত্রে এবং রসায়ন বিদ্যায় আজও বিশ্বের বিস্ময় হইয়া আছেন। ভাস—কালিদাস—ভবভূতি—ভারবি—বাণভট্ট ভারতের ভারতী-মন্দিরে সারি সারি রত্ন-প্রদীপ জ্বালিয়া দিয়াছেন। রসবেত্তারূপে আসিয়াছেন দণ্ডী—কুন্তক—বামন—আনন্দবর্দ্ধন-অভিনবগুপ্ত। নাট্যতত্ত্বের গূঢ় রহস্য আবিষ্কার করিয়াছেন ভরত ও নন্দিকেশ্বর। সমাজ-বিজ্ঞানের পরাকাষ্ঠা ফুটিয়াছে মনুসংহিতায়, আশ্বলায়নের গৃহ্যসূত্রে, রাজনৈতিক-কুটিলতার নিদর্শন রহিয়াছে কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে। রহিয়াছে রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণের বিশাল উপচার—ভারতীয় সাহিত্য-নির্ঝরিণীর শিখরমালা। কিন্তু শিশু-সাহিত্যের দিকে প্রাচীনদের বিশেষ লক্ষ্য ছিল বলিয়া মনে হয় না।

হয়তো প্রয়োজনও ছিল না। বাল্যে পদক্ষেপ করিয়াই যাঁহাদের বিদ্যাজীবন আরম্ভ হইত এবং তাহার পরেই যাঁহারা গৃহাশ্রমে প্রবেশ করিতেন—তাঁহাদের বিদ্যালাভের বাহিরে আর কোনও উপপাঠের আবশ্যক ঘটিত না। বেদ-বেদান্ত-ন্যায়-ব্যাকরণের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহারা রামায়ণ-মহাভারত, ভাগবত ও পুরাণ পড়িয়া এক সঙ্গেই চতুর্ব্বর্গের পাথেয় সংগ্রহ করিতেন। তাহার পর ভাস

আসিলেন, মহাকবি কালিদাস আসিলেন, নৈষধ-ভারবি-বাণ-মাঘ-ভবভূতি-শ্রীহর্ষ দেখা দিলেন—কাব্য ও নাটকের নবতম রসের সন্ধান তাঁহারা পাইলেন। একান্তভাবে কোনো শৈশবের মধ্য দিয়া তাঁহাদের জীবন সেদিন চিহ্নিত হয় নাই অতএব শৈশবযোগ্য কোনো সাহিত্যও তাঁহাদের জন্য রচিত হইত না; গার্হস্থ্য আশ্রমে প্রবেশের পূর্ব্বেই তাঁহারা সর্ব্বাঙ্গীণ মানসিক প্রৌঢ়ত্ব অর্জ্জন করিতেন।

শিশুদের জন্য নির্দ্দিষ্ট হইয়া যদি কিছু দেখা দিয়া থাকে, তবে তাহা পণ্ডিত বিষ্ণু শর্ম্মার "পঞ্চ-তন্ত্র"। পঞ্চ-তন্ত্রের কাল সম্পর্কে কোনও নিশ্চিত মীমাংসা হয় নাই—সম্ভবতঃ গুপ্তযুগের কোনো এক সময়ে ইহার আবির্ভাব। দাক্ষিণাত্যের "মিহিলারোপ্য" বা "মহিলা-রোপ্য" নগরে অমরশক্তি নামে রাজা ছিলেন; তাঁহার তিনপুত্র—বসুশক্তি, উগ্রশক্তি ও অনেকশক্তি। ইহাদের মেধাহীনতা এবং বিদ্যায় অমনোযোগ দেখিয়া রাজা চিন্তিত হইলেন। ব্রাহ্মণ বিষ্ণুশর্ম্মা অগ্রসর হইয়া তিনি রাজকুমার শিক্ষার ভার লইলেন এবং পাঁচটি অধ্যায়ে বিভক্ত পঞ্চ-তন্ত্র রচনা করিয়া গল্পের ছলে কুমারত্রয়কে সর্ব্ববিষয়ে সুপণ্ডিত করিয়া তুলিলেন।

পঞ্চ-তন্ত্র জীবজন্তু ও মানুষের জীবনকে আশ্রয় করিয়া একাধারে আনন্দ ও উপদেশ পরিবেষণ করিয়াছে। ইহার পাশাপাশি আমরা বৌদ্ধ 'জাতক'-সাহিত্যকেও দেখিতে পাই। 'জাতক' বৌদ্ধ ধর্ম্মাদর্শ শিক্ষা দিবার জন্যই সংকলিত—কালের বিচারে পঞ্চ-তন্ত্র হইতেও প্রাচীন। কিন্তু ইহাদের বহু গল্পই এক—বৌদ্ধ শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ পণ্ডিত নিজেদের উদ্দেশ্য অনুযায়ী গল্পগুলিকে ব্যবহার করিয়াছেন। ইহা হইতে বোঝা যায়—বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ দেশের প্রচলিত লোক কথা হইতে প্রয়োজনমত এগুলিকে আহরণ করিয়া লইয়াছেন। "কেউ তাকে বইয়ে বইয়ে দিয়েছেন জাহ্নবীর পথে, কেউ বা প্রবাহিত করেছেন নিরঞ্জনার খাতে।" ১ এই ধারারই অনুসরণ করিয়া আরো

১। "সাহিত্যে ছোট গল্প" পৃঃ ৩৭

পরে নারায়ণের 'হিতোপদেশ' রচিত হইয়াছিল। ঈশপের গল্পের মতো এই গল্পগুলিকেই ভারতীয় শিশু-সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন বলা যায়। কিন্তু ইহারা নীতিপ্রধান, সাংসারিক বুদ্ধিমত্তার দ্বারা চিহ্নিত; এগুলি পণ্ডিত ও বৈষয়িকজনের নিকট হইতে সরস গল্পচ্ছলে উপদেশ। কিন্তু শিশুর যে-মন স্বপ্ন দেখে—কল্পনার আকাশে ডানা মেলিতে চায়, তাহার জন্যও কি কোনও আয়োজন সেদিন হয় নাই? বস্তুর ভারমুক্ত মেঘচারী শিশুচিত্তের জন্যও কোন উপচারও কি কোথাও ছিল না?

ছিল যে, তাহার প্রমাণ কালিদাসে পাই। তাঁহার মেঘদূতের যক্ষ মেঘকে সম্ভাষণ করিয়া যেখানে উজ্জয়িনীর মহিমা কীর্ত্তন করিতেছেন, সেখানে জানিতে পারি "উদয়ন-কথা-কোবিদ্ গ্রামবৃদ্ধদের" কথা। গুণাঢ্যের 'বৃহৎ কথা' তখনও রচিত হয় নাই, কিন্তু উদয়নের গল্প যে বহুকাল হইতে শিশু-শ্রোতাদের মনোহরণ করিয়া আসিতেছিল, উহা হইতেই তাহার সংকেত মেলে।

বস্তুতঃ প্রাচীন ভারতে রূপকথা সংকলিত হইয়াছে সোমদেবের "কথা সরিৎ-সাগরে"। এই বিরাট বইটি পড়িলেই বোঝা যায়—অসংখ্য নানা জাতের গল্পকে রাজা উদয়ন এবং তাঁহার পুত্র গন্ধর্ব্ব-পতি নরবাহন দত্তের সূক্ষ্ম-সূত্রে কোনোমতে এক সঙ্গে গাঁথিয়া দেওয়া হইয়াছে। উদ্দাম কল্পনা এখানে আসিয়া মুক্তি পাইয়াছে—সম্ভব-অসম্ভবের গণ্ডী পার হইয়াছে, বৈচিত্র্যের পর বৈচিত্র্য ছায়া-ছবির গতিতে সম্মুখে আসিয়া দেখা দিয়াছে। এখানে রাজপুত্র রাজকন্যার জন্য দুঃসাহসিক অভিযানে বাহির হইয়াছেন, বাধা বিপত্তি পথরোধ করিয়াছে, কিন্তু কিছুই শেষ পর্য্যন্ত ঠেকাইতে পারে নাই, রাজকন্যা-রাজপুত্রের মিলন ঘটিয়াছে। ইহার ক্রোড়পত্ররূপে "বেতাল পঞ্চবিংশতি" কয়েকটি বিচিত্র গল্প উপহার দিয়াছে।

প্রাচীন ভারতের শিশুযোগ্য সাহিত্য বলিতে বিষ্ণুশর্ম্মার 'পঞ্চ-তন্ত্র' ও 'হিতোপদেশ', সোমদেবের 'কথাসরিৎ-সাগর' এবং

কালিদাসের নামে চলিত 'দ্বাত্রিংশ পুত্তলিকা'—এই কয়খানাকেই মাত্র নির্দ্দেশ করা যায়। কিন্তু বর্ত্তমানের দৃষ্টিকোণ হইতে দেখিলে ইহাদের বিশুদ্ধ শিশু-সাহিত্য বলা কঠিন। নর-নারীঘটিত এমন সব প্রসঙ্গ এগুলিতে আলোচিত হইয়াছে, এমন শ্লোকের সমাবেশ ঘটিয়াছে—যাহা কখনও কখনও প্রাপ্তবয়স্কদের পক্ষেও গ্রহণ করা দুঃসাধ্য। এই কথাটি এই উপলক্ষে স্মরণ রাখিতে হইবে যে প্রাচীনেরা শিশু-পাঠ্যতার ক্ষেত্রে কোনো বয়সের সীমা টানিয়া দেন নাই; বিদ্যার প্রাসাদে একবার যে প্রবেশ করিয়াছে তাহাকে সমস্ত কক্ষগুলিই একসঙ্গে খুলিয়া দেওয়া যাইতে পারে—ইহাই বোধহয় তাঁহাদের মনোভাব ছিল।

মুস্‌লিম শাসনের যুগে আরব্য ও পারশীয় সাহিত্যের সঙ্গে ভারতের পরিচয় ঘনিষ্ঠতর হইল। পূর্ব্বে ভারতবর্ষ হইতে 'পঞ্চ-তন্ত্র' আরব্য-পারস্যে গিয়া 'বিদ্‌পাই', 'কলিলা-উ-দিমনা' প্রভৃতি নামে অনূদিত হইয়াছিল; এইবার আরব্য-পারস্যের কাছ হইতে ভারতের পুনর্গ্রহণের সময় আসিল। আরব্য ও পারস্য উপন্যাস সম্পূর্ণ ভাবে আসিয়াছিল বলা যায় না, কিন্তু তাহার অনেক গল্পই যে আসিয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। তাহা ছাড়াও ফার্সী কেচ্ছা (কিস্‌সা) রূপে 'গুলে-বকাওলী', 'হাতেমতাই', ও 'বাহার দানেশ' প্রভৃতির গল্প সাধারণের মধ্যে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। ইহাদের বহু অংশই শিশুদের যোগ্য নয়—কিন্তু 'গুলে বকাওয়ালী'র অপূর্ব্ব রোমান্স ও 'হাতেম তাই'য়ের অদ্ভুত অ্যাড্‌ভেঞ্চার, সিন্ধবাদের সমুদ্র যাত্রার বিবরণ ও আলিবাবার গল্প শিশুমনের অনেকখানি জুড়িয়া বসে নাই, এ কথা বলা যায় না।

ইংরেজ আসিবার পূর্ব্বে পর্য্যন্ত সমগ্র ভারতবর্ষের সঙ্গে বাংলা দেশেরও শিশু-সাহিত্যের মোটামুটি লিখিত রূপ ইহাই। কিন্তু মৌখিকভাবে আরো দুইটী জিনিষ বাংলার শিশুচিত্ত অধিকার করিয়া রাখিত। ইহারা যথাক্রমে রূপকথা ও ছেলেভুলানো ছড়া।

॥ ২ ॥

রূপকথা

"Like all traditional literat ıre, fairy tales were originally the possession of everyone, adults and children alike. They were preserved and used and valued by the common folk from the time of the childhood of the human race."১

রূপকথার উৎস কোথায়—কাহারা ইহার স্রষ্টা, সে কথা কেহই বলিতে পারে না। ইহারা সমগ্র জাতির অন্তর হইতে যেন আপনি ফুটিয়া উঠিয়াছে। বংশানুক্রমিক ধারায় ইহারা মাতৃস্নেহে স্নিগ্ধ হইয়া অলস মধ্যাহ্নে ও শান্ত সন্ধ্যায় শিশুদের স্বপ্নাচ্ছন্ন করিয়াছে—গৃহ-প্রাঙ্গণ ছাড়াইয়া তাহাদের মন পক্ষীরাজের পিঠে চড়িয়া সাত সমুদ্র তেঁরো নদী পার হইয়া গিয়াছে। মাটির ঘরের দাওয়া হইতে দরিদ্র কৃষক-সন্তান সোনার কাঠি রূপার কাঠি হাতে লইয়া রাজপুত্রের বেশে ঘুমন্ত রাজকন্যার মর্ম্মর প্রাসাদে গিয়া উপস্থিত হইয়াছে।

১৯০৬ সালে 'ঠাকুরমার ঝুলি' সংগ্রহ করিয়া দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার বাঙালীর রূপকথাকে সাহিত্যের হাটে পৌঁছাইয়া দেন। দেশে তখন বঙ্গ-ভঙ্গকে কেন্দ্র করিয়া যে প্রবল জাতীয়তাবোধ জাগিয়া উঠিয়াছিল তাহাতে বাঙালী তাহার ঘরের এই অমূল্য সঞ্চয়টিকে মাথায় করিয়া তুলিয়া লইল। দক্ষিণারঞ্জনের বিশেষ কৃতিত্ব এই যে তিনি বাঙালী মায়ের মুখের কথাগুলি পর্য্যন্ত যেন ইহাতে সঞ্চার করিয়া দিলেন। বাঙালীর রূপকথা সাহিত্যের স্বীকৃতি পাইল।

১। The Unreluctant Years—L. H. Smith, Page—45

পূর্ব্বে, পশ্চিমে, উত্তরে, দক্ষিণে—বাংলা দেশের সর্ব্বত্র ইহারা বিরাজ করিতেছিল। দক্ষিণারঞ্জন প্রধানতঃ পূর্ব্ববঙ্গকে অবলম্বন করিয়া ইহাদের কতগুলিকে নূতন করিয়া তুলিয়া ধরিলেন। তাঁহার কৃতিত্ব ফ্রান্সের পেরো (Perrault) এবং জার্ম্মানীর গ্রিম ভ্রাতৃদ্বয়ের সহিত তুলনীয়।

এই রূপকথাগুলি পড়িলে ইহাদের সঙ্গে সংস্কৃত কথাসরিৎ-সাগরের একটি ঐতিহাসিক যোগ অনুভব করা যায়। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও ইহারা একান্তভাবে বাংলারই সামগ্রী। এ দেশের শ্যামশ্রী, মাটি—জল—আকাশ, পরিচিত সমাজ ও পারিবারিক জীবনের টুকরো টুকরো ছবি—সব মিলিয়া বিশিষ্টভাবে বাঙালীরই পরিচয় ইহারা বহন করিতেছে। এইরূপ হওয়াই স্বাভাবিক। পেরোর সংকলিত ফরাসী রূপকথাগুলি ফরাসী-মন ও জীবন-দৃষ্টির দ্বারা চিহ্নিত, গ্রিমদের রূপকথাগুলি জার্ম্মানীর অন্তরালোকে উদ্ভাসিত। "গৌড়-কাব্যে"র মতো বাঙালীর রূপকথাকে আমরা নাম দিতে পারি "গৌড়-কথা"।

বাংলা দেশের রূপকথার মধ্যে—অথবা যে-কোনো রূপকথার অন্তরালেই—তিনটি বস্তু লক্ষ্য করিতে পারা যায়। (১) প্রতীক, (২) কল্পনার মুক্তি এবং (৩) ইতিহাসের ক্ষীণ ছায়া।

ফরাসী রূপকথা 'The Sleeping Beauty' গল্পে অভিশপ্তা রাজকন্যা একশো বছরের জন্য মৃত্যু-নিদ্রায় ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। সেই সঙ্গে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে সমগ্র রাজপ্রাসাদ, সিংহাসনে রাজা, অন্তঃপুরে রাণী, পাকশালে পাচক, খাঁচায় পাখী, দ্বারপ্রান্তে দ্বারী। মৃত্যুমগ্ন রাজপ্রাসাদকে ঘিরিয়া অরণ্য দেখা দিয়াছে—দুর্ভেদ্য কণ্টক-তরুতে চারিদিক ঢাকিয়া গিয়াছে—কালের স্রোত বহিয়া চলিয়াছে। একশো বছর পরে আসিলেন নূতন কালের রাজপুত্র—তাহার স্পর্শে ঘুমন্ত রাজকন্যা জাগিলেন, প্রাসাদের প্রতিটি মানুষ প্রাণ ফিরিয়া পাইল। কণ্টক-তরুগুলি ফুলে-পল্লবে মঞ্জরিত হইল। ব্যাখ্যা করিয়া বলা হইয়াছে—"The Sleeping Beauty" আর কিছুই নয়, শীতের

অবসানে বসন্তের মন্ত্রে নবযৌবনা ধরিত্রীর জাগরণ মাত্র। এই গল্প প্রকৃতির প্রতীকবহ গ্রীক পৌরাণিক গল্পের ধারাই অনুসরণ করিতেছে।

বাংলা সাহিত্যেও অনুরূপ গল্প আমরা পাই। "ঘুমন্তপুরী" ('ঠাকুরমার ঝুলি' দ্রষ্টব্য) এই গল্পেরই রূপভেদ মাত্র। সেখানেও রাজপুত্র সোনার কাঠি ছোঁয়াইয়া ঘুমন্ত প্রাসাদের রাজকন্যার সহিত সমস্ত দেশকে জাগাইয়া তুলিয়াছে। পাতালের অন্ধকারে যে রাজকন্যা অজগরের বন্ধনে নিদ্রাচ্ছন্ন ("মণিমালা"), তাহাকে সাপের মাথার মণি দিয়া জাগাইয়া তোলা হয় তো আর কিছুই নয়, বসন্তের সূর্য্যালোক মণি হইয়া শীতের বন্ধনে ঘুমন্ত ফুলের কুঁড়িটিকে ফুটাইয়া তুলিতেছে। ইতিহাসের কোন্ আদি পর্ব্বে প্রতীকরূপে এই গল্পগুলির পত্তন হইয়াছিল, আজ তাহারা রূপকথার স্বপ্নলোকে আসিয়া বাসা বাঁধিয়াছে।

প্রতীক শুধু একদিকে হইতেই নয়; দুর্জ্জয়কে জয় করিবার আশা, দুর্গতি হইতে উত্তীর্ণ হইয়া সুখ-সৌভাগ্য লাভের অকৃত্রিম বাসনা— এগুলি ইহাদের মধ্যে নিহিত। কিন্তু বাস্তবে কামারের ছেলে "দেড় আঙ্গুলে" কখনও রাজার জামাতা হইতে পারে না; তাই প্রতীকের আশ্রয় লইয়াই কল্প-কামনা মিটাইতে হয়। এবং কল্পনাকে এমন একটি জগতে লইয়া যাইতে হয়—যেখানে সোনার গাছে অবলীলাক্রমে মুক্তার ফল ফলে, বিপদে পড়িলে আঙুল চিরিয়া এক ফোঁটা রক্ত দিলেই ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমী সহায়তার জন্য আগাইয়া আসে, পক্ষীরাজ ঘোড়ার পায়ের নীচে হাড়ের পাহাড় দেখিতে দেখিতে চুরমার হইয়া যায়। অসম্ভবের আনন্দ মানুষের মনকে গল্পের স্বর্গলোকে লইয়া যায়— যেখানে সাহস এবং সত্যে আশ্রয় করিয়া দাঁড়াইলে ঐহিক জীবনের চরম প্রাপ্য মিলিয়া যাইতে পারে। বাস্তবের সঙ্গে সম্পর্কে রাখিতে গেলে নিষ্ঠুর সত্য আকাঙ্ক্ষা-তৃপ্তির প্রতিবন্ধক হইয়া দাঁড়ায়—তাই কল্পনার এমন নিরঙ্কুশ বিস্তার রূপকথার একটি প্রধান অবলম্বন হইয়া উঠিয়াছে।

তৃতীয়তঃ এই রূপকথাগুলির আড়ালে লুপ্ত ইতিহাসও উঁকি দিতেছে। ভবচন্দ্র রাজা ও গবচন্দ্র মন্ত্রী বাস্তবেই ছিলেন বলিয়া শোনা যায়। যে পারিবারিক চক্রান্তে দুয়োরাণীর নিরীহ সন্তানদের হত্যা করিবার জন্য সুয়োরাণী মশানে পাঠাইয়া দেন—বহু রাজ-সিংহাসনের পিছনেই অনুরূপ রক্ত-কলঙ্কিত কাহিনী রহিয়াছে। কিন্তু কালক্রমে প্রাচীন ভারতের অনেকখানি ইতিহাস যেমন পুরাণে পরিণত হইয়াছে, তেমনি কোনো-কোনো বাস্তব ঘটনাও রূপকথার মধ্যে আত্মগোপন করিয়াছে।

পৃথিবীর সব দেশেই রাজপুত্র কেন যে রূপকথার নায়ক হইয়া থাকেন, তাহার কারণ অত্যন্ত সুস্পষ্ট। সর্ব্বক্ষেত্রেই রাজপুত্র-রাজকন্যারা সাধারণ হইতে দূরে অপরিমিত ঐশ্বর্য্য ও সমারোহের মধ্যে রাস করেন—বংশ-মর্য্যাদায়, প্রতাপে ও বিলাসের প্রাচুর্য্যে তাঁহারা ইন্দ্রলোকবাসী বলিয়া পরিগণিত হন। রথে বসিয়া বা তেজী ঘোড়ার পিঠে চড়িয়া সশস্ত্র রাজপুত্র পথে বাহির হন—লোকে মুগ্ধ-নেত্রে চাহিয়া থাকে; তাঁহারাই শিকারে যান—যুদ্ধ জয় করেন; রাজ-পরিবারের কোন উৎসব উপস্থিত হইলে কল্পনাতীত সমারোহ পড়িয়া যায়। সাধারণ মানুষের দৃষ্টিতে তাঁহারা দেবতার তুল্যমুল্য। তাই প্রতীক-কাহিনীই হউক অথবা কল্প-কামনাই হউক—রাজপুত্র ছাড়া কাহিনীর নায়ক আর কে হইতে পারেন? আর দৈবক্রমে যদি দরিদ্রের সন্তান কোনো কাহিনীর নায়ক হইয়াই বসে, তাহা হইলে তাহাকে অর্দ্ধেক রাজত্ব এবং রাজকন্যা তুলিয়া না দিলেই বা কেমন করিয়া মন তৃপ্তি পায়!

বাংলা দেশের রূপকথার নেপথ্যে যাহাই থাকে—বস্তুত: ইহাই যথার্থ শিশু-সাহিত্য। এই গল্পগুলি কেবল কল্পনার স্বচ্ছন্দ বিচরণই নয়, ইহাদের মধ্যে কতগুলি দৃঢ়-প্রতিষ্ঠ নীতি আছে এবং মা-দিদিমা-দিদির মুখ হইতে শোনা এই সব কাহিনীই শৈশব হইতে চরিত্র-গঠনের ভিত্তি নির্ম্মাণ করিয়া আসিতেছে। শক্তি ও সাহস, সত্যের প্রতি

অনুগত্য, ধর্ম্মে বিশ্বাস এবং পরিণামে ইহাদের পুরস্কার—এগুলি রূপকথার মধুপানের মাধ্যমে শিশু-চরিত্রের স্বাস্থ্য রচনা করিয়া দিয়াছে। বাঙালীর—অথবা যে-কোনো দেশের রূপকথার সার্থকতা এইখানেই। রূপকথাকে যাঁহারা অলস-কল্পনা বলিয়া মনে করেন, তাঁহারা ভাবিয়া দেখেন না—কোনো বৃহত্তর সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত না হইলে ইহা কিছুতেই এমন ভাবে কালজয়ী প্রাণ-শক্তি লাভ করিত না। রূপকথা আমাদের গৌরবদীপ্ত জাতীয় উত্তরাধিকার।

ছেলে ভুলানো ছড়া

বাংলা মৌখিক শিশু-সাহিত্যের দ্বিতীয় সঞ্চয় "ছেলে ভুলানো ছড়া"। ইহারা রূপকথার মতোই প্রাচীন এবং ইহাদের খণ্ড খণ্ড চকিত আভাসের মধ্যে ইতিহাস ও সামাজিক জীবনের অনেক সত্য প্রচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার অপূর্ব্ব প্রবন্ধ "ছেলে ভুলানো ছড়ায়" বলিয়াছেন:

"শুনা যায় মঙ্গল ও বৃহস্পতির কক্ষ-মধ্যে কতকগুলি টুকরা গ্রহ আছে। কেহ কেহ বলেন একখানা আস্ত গ্রহ ভাঙ্গিয়া খণ্ড খণ্ড হইয়া গিয়াছে। এই ছড়াগুলিকেও সেইরূপ টুকরা জগৎ বলিয়া আমার মনে হয়। অনেক প্রাচীন ইতিহাস প্রাচীন স্মৃতির চূর্ণ অংশ এই সকল ছড়ার মধ্যে বিক্ষিপ্ত হইয়া আছে, কোনো পুরাতত্ত্ববিদ আর তাহাদিগকে জোড়া দিয়া এক করিতে পারেন না, কিন্তু আমাদের কল্পনা এই ভগ্নাবশেষগুলির মধ্যে সেই বিস্মৃত প্রাচীন ভারতের একটি সুদূর অথচ নিকট পরিচয় লাভ করিতে চেষ্টা করে।"১

ইতিহাস যে প্রচ্ছন্ন হইয়া আছে, তাহাতে সংশয়ের অবকাশ মাত্র নাই। "বুলবুলিতে ধান খেয়েছে খাজনা দেব কিসে"—শুনিবা-মাত্র দেশে বর্গীর সেই বীভৎস উপদ্রব মনে পড়িয়া যায়—যাহা এক সময় পশ্চিম বাংলাকে শ্মশানে পরিণত করিয়াছিল। "আগডুম বাগডুম" বাঙ্গালী ডোমের নির্ভীক বীরত্বের স্মৃতি বহন করিতেছে—আগে ডোম পিছে ডোম রায়বাঁশ ও ঢাল-তলোয়ার লইয়া দিগ্বিজয়ে বাহির হইত, "ধর্ম্মমঙ্গল" কাব্যে আমরা তাহার শেষ রশ্মি দেখিতে পাই।

১। লোক সাহিত্য, ছেলে ভুলানো ছড়া।

রবীন্দ্রনাথের ভাষায়—“তরল স্বচ্ছ সরোবরের উপর মেঘক্রীড়িত নভোমণ্ডলের ছায়ার মতো” স্বয়ম্ভু এই ছড়াগুলির প্রধান আকর্ষণ ইহাদের ছন্দের নৃত্য ও চিত্রধর্ম্মিতা। ইহারা রূপকথার পরিপূরক। শিশুর মন কবিতা ভালোবাসে। কবিতার তত্ত্বগত ভাষ্য যাহাই হউক, ইহার চরম ফলশ্রুতি—অন্ততঃ গীতি-কবিতার মাধ্যমে—বাচ্যাতীত একটি ব্যঞ্জনার সৃষ্টি ; ভাষা, ছন্দ ও চিত্রকল্পের সমস্ত সীমা পার হইয়া মনের মধ্যে এমন একটি অনুভব বিস্তার করে যাহা তার-যন্ত্রের সুরের মতো ; তাহা সেতারের তন্ত্রীতে নাই, বাদকের অঙ্গুলিতে নাই, এমন কি যে বিশেষ রাগিণীটি বাজিতেছে তাহাতেও বাঁধা পড়িয়া নাই—আর একটি অভিনব সামগ্রীরূপে শ্রোতার চিত্তকে আন্দোলিত করিতেছে।

ছেলে ভুলানো ছড়ার আশ্রয়ে দ্রুত লয়ের ছন্দ ও ক্রম পরিবর্তনশীল ছবিগুলির মধ্য দিয়া শিশুর মনে ইহাদের অতিরিক্ত যে বস্তুটি সঞ্চারিত হইয়া যায়—তাহা সঙ্গীত। এই ছড়াগুলিই শিশুর মনে প্রথম সুর ও গানের চেতনা জাগাইয়া তোলে :

“নোটন নোটন পায়রাগুলি ঝোঁটন বেঁধেছে।
বড় সাহেবের বিবিগুলি নাইতে নেমেছে।
দুই ধারে দুই রুই কাৎলা ভেসে উঠেছে।
দাদার হাতে কলম ছিল ছুঁড়ে মেরেছে।
ওপারেতে দুটি মেয়ে নাইতে এসেছে।
রুনু ঝুনু চুলগাছটি ঝাড়তে লেগেছে।
আজ দাদার অধিবাস কাল দাদার বিয়ে।
দাদাকে নিয়ে যাবে কাজিতলা দিয়ে।
কাজি ফুল কুড়োতে গিয়ে পেয়ে গেলাম মালা।
টাক্‌ডুমাডুম বাদ্যি বাজে সীতারামের খেলা।”

রবীন্দ্রনাথের পাঠ হইতে আমাদের শোনা ছড়াটি একটু আলাদা—কিন্তু তাহাতে কিছু আসে যায় না। ছন্দের দোলার সহিত ইহাদের

মধ্যে যে ছবির পর ছবির বিকাশ ও বিলয় ঘটিতেছে, তাহাদের এই দ্রুত পরিবর্ত্তন শিশুর মনে কোনো একটি বিশেষ বক্তব্যকে সঞ্চার করে না, বাণীহীন কোনো সুরের মতো অথবা কোনো উৎকৃষ্ট কবিতার ব্যঞ্জনার মতো একটি অপূর্ব্ব আস্বাদন আনিয়া দেয়। এই সব ছড়ার অনেকগুলিই প্রধানতঃ ব্যবহৃত হইত (বোধ করি, এখনও হইয়া থাকে) সুর করিয়া ও থাবড়াইয়া থাবড়াইয়া ঘুম পাড়াইবার সময়, এবং এগুলি মাত্র ছেলে-ভুলানোই নয়—ঘুমপাড়ানীও বটে। ইহাদের আসল উদ্দেশ্য ছিল বিদ্রোহী চঞ্চল মনটিকে সংহত করিয়া আনা—একটি বিচিত্র অনুভূতিতে মগ্ন করিয়া দেওয়া। ইহাতে একধরণের নিরবচ্ছিন্ন সুরের টান এই অনুভূতিটিকে প্রগাঢ় করিয়া তোলে—দেখিতে দেখিতে চোখে ঘুম জড়াইয়া আসে। বাঙালী ঘরের প্রতিটি নরনারীই সম্ভবতঃ শৈশবে ইহার "হিপ্‌নটিক" প্রভাব অনুভব করিয়াছেন।

অলস ছবির মালা গাঁথার সঙ্গে সঙ্গে টুক্‌রা টুক্‌রা সামাজিক জীবনও ইহাদের মধ্যে কি ভাবে বিবৃত থাকে—রবীন্দ্রনাথ সে বিষয়ে চমৎকার আলোচনা করিয়াছেন। "তোর কপালে বুড়ো বরটি আমি করবো কি" অথবা "সুন্দরীকে বিয়ে দিলাম ডাকাতের মেলে" ইহার সুন্দর উদাহরণ।

ইংরেজী নার্সারী রাইমের সঙ্গে বাঙালীর ছড়ার একটু তফাৎ আছে। নার্সারী রাইমের বিষয়বস্তু যতই অকিঞ্চিৎকর হোক তাহাদের মধ্যে বক্তব্যগত একটি ঐক্য থাকে।

যেমন : Mary had a little lamb
With fleece as white as snow
And everywhere that Mary went
The lamb was sure to go"—

ইহার পরের অংশে মেরী ভেড়ার ছানাটি লইয়া স্কুলে যাইবার

পরে কি বিপর্য্যয় ঘটিয়াছিল তাহার বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে, অর্থাৎ একটি সম্পূর্ণ সংক্ষিপ্ত কাহিনী ফুটিয়া উঠিয়াছে। অথবা :

"Hark ! Hark ! Hark !
Dogs do bark !
Beggars are coming to the town,
Some in rags
Some in jags
Some in velvet gown'—

ইহাতেও খেয়ালের ছোঁয়া থাকা সত্ত্বেও একটি স্পষ্ট সম্পূর্ণ ছবি রূপ পাইয়াছে।

কিন্তু আমাদের ছেলে ভুলানো ছড়া যথার্থ ই অলস মেঘের মায়া, যেন শরতের আকাশে ভাসিয়া চলা কয়েক টুকরা বর্ষণহীন মেঘখণ্ড। বাংলা দেশের শান্ত—মন্থর জীবন-যাত্রার উপর দিয়া, তাহার তাল দীঘি ও নীল নদীতে প্রতিবিম্ব ফেলিয়া আম-জাম-জারুলের বনে ছায়াছবি আঁকিয়া উধাও হইয়াছে এবং তাহার সহিত শিশুর মনটিকেও এক নিঃসীম শূন্যে ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছে।

রূপকথার পাশাপাশি স্মরণাতীত কাল হইতেই বাঙালী শিশু ছড়ার আস্বাদ লাভ করিয়া আসিতেছে। রূপকথা তাহার মনে কল্পনার বিকাশ ঘটাইয়াছে এবং চরিত্রের ভিত্তিগঠনে সাহায্য করিয়াছে ; আর ছড়া তাহার কাণে কবিতার প্রথম স্পন্দন আনিয়া দিয়াছে, তাহার মনে সঙ্গীতের বোধ জাগাইয়া তুলিয়াছে। যে কথা বলিয়াছিলাম, বাঙালীর শিশু-সাহিত্যে ইহারা একে অপরের পরিপূরক।

॥ ৪ ॥

ব্রতকথা

আমাদের তৃতীয় উত্তরাধিকার বাংলার ব্রতকথা। এগুলিকে প্রথমে শিশু-সাহিত্য বলিয়া মনে না হইবারই কথা। ইহারা লৌকিক ধর্ম্মের অঙ্গ হইলেও এবং ইহাদের সহায়তায় কোনো বিশেষ ব্রতের বা দেব-দেবীর মহিমা কীর্ত্তন করা হইলেও শিশুদের কল্পনা শক্তিকে জাগাইবার উপকরণ ইহাদের মধ্যেও আছে।

ব্রতের কথার ভিতরে গল্পরসেরও অভাব নাই। উপদেশ ইহারা পরিবেষণ করে বটে, কিন্তু উষার শান্ত আলোকে ধান-দূর্ব্বা হাতে লইয়া সে শ্রোত্রীরা দ্রুতলয়ে কথিত এই ব্রতকথাগুলি শোনে তাহাদের মনে গল্প শুনিবার আনন্দও সমপরিমাণেই সজাগ হইয়া থাকে। ব্রতের ছড়াগুলিও ঘুমপাড়ানি গানের মতো শিশুমনে চিত্র-মালিকা রচনা করিবার শক্তি রাখে ঃ

“ওঠ সূর্য্য উদয় দিয়া
বামন বাড়ীর কোন ছুইয়া।
বামনের মাইয়া বড় সেয়ান
পইতা কাটে বেয়ান বেয়ান।
ওঠ সূর্য্য উদয় দিয়া,
মালীর বাড়ীর কোন ছুঁইয়া,
মালীর মাইয়া বড় সেয়ান,
মালা গাঁথে, বেয়ান বেয়ান।”

ইহা মাত্র ব্রতের অঙ্গই নয়, সূর্য্যোদয়ের লগ্নে পল্লীর একটি সুন্দর ছবিও ইহাতে ফুটিয়া উঠিতেছে।

ইংরেজ আসিবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত, অথবা ইংরাজী শাসন এদেশে প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্য্যন্ত এগুলিই বাঙালীর নিজস্ব শিশু-সাহিত্য, তাহার লৌকিক সম্পদ। কিন্তু নূতন সভ্যতা ও সংস্কৃতির আবির্ভাবে নূতন শিশু-সাহিত্যও জন্ম লইল, জন্ম লইল শিক্ষার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী ভাবে যুক্ত হইয়া। শিশুদের জন্য এই নূতন আয়োজন—ইংরাজী পরিভাষায় যাহাকে আমরা Juvenile Literature বলিয়া চিহ্নিত করি, উনিশ শতকে কিভাবে তাহা আবির্ভূত ও ক্রম-বিকশিত হইল, পরবর্ত্তী অধ্যায়গুলিতে আমরা তাহাই দেখাইতে চেষ্টা করিব।

দ্বিতীয় অধ্যায়

মিশনারী যুগ :—পদসঞ্চার

॥ ১ ॥

ইস্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানি কলিকাতায় তাঁহাদের নূতন জমিদারীর দপ্তরখানা খুলিয়া বসিলেন। বাংলা দেশে তথা সমগ্র ভারতবর্ষে নূতন যুগের আবির্ভাব হইল। ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদের অঙ্কুর বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে দিকে দিকে পরিবর্ত্তনের তরঙ্গলীলা উদ্বেলিত হইয়া উঠিল।

দুই শত বৎসরব্যাপী নির্লজ্জ শোষণের অঙ্কুর প্রথম পত্রোদ্গমোচন করিল বটে, কিন্তু আদ্য পর্ব্বে ইহাকে নূতন শস্যের সমুজ্জ্বল সম্ভাবনা বলিয়াই মনে হইয়াছিল। এইরূপ হইবারই কথা। দ্বৈত-শাসনের নৈরাজ্য—অস্তগামী নবাবী শাসনের দেশব্যাপী দুর্নীতি, দস্যুভীতি এবং অনিশ্চয়তার মধ্যে বাঙালী এইবার আশ্রয় পাইল, আশ্বাস লাভ করিল। খিদিরপুরের জাহাজঘাটা কেবল নবীন সাম্রাজ্যবাদী বৈদেশিক শক্তির বাণিজ্যকেন্দ্রই হইয়া উঠিল তাহা নয়; বাংলা দেশের সহজ কান্নাহাসির—সরল পল্লীজীবনের তটে তটে কল্লোল তুলিয়া যে গঙ্গাপ্রবাহ শান্ত নিদ্রাতুর ছন্দে বহিয়া যাইতেছিল, তাহাতে যেন নীলকান্ত অসীম সমুদ্রের আহ্বান আসিল। গঙ্গা-সাগর সঙ্গম প্রাচ্য-প্রতীচির মিলনের নতুন তীর্থে পরিণত হইল।

সাংস্কৃতিক জীবনে যাঁহারা এই তীর্থপথের পুরোগামী—তাঁহারা হইলেন কয়েকজন বৈদেশিক। "হেয়ার-কল্বিন্-পামরশ্চ"১ যে পঞ্চগোরার বন্দনা একদা বাঙালীর কণ্ঠে উচ্চারিত হইয়াছিল, তাহা

১। সেকাল আর একাল—রাজনারায়ণ বসু; পৃঃ ৬ (সাহিত্য-পরিষৎ)

সেই যুগের নবালোকদীপ্ত কৃতজ্ঞ অন্তরেরই উৎসারিত অভিব্যক্তি মাত্র।

বাংলা ভাষার উন্নয়নে প্রথম পথিপ্রদর্শনের প্রয়াস করিয়াছিলেন পর্ত্তুগীজ পাদ্রী ম্যানোএল-দা-আস্‌সুম্পসাম তাঁহার 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ' গ্রন্থে। ইংরেজ যুগে একে একে আসিলেন ন্যাথানিয়েল ব্রাসি হ্যালহেড্, জোনাথান্ ডানকান্, এন, বি এডমন্‌স্টোন, জন টমাস এবং উইলিয়ম কেরী। "ইহাঁদের সহযোগিতা না পাইলে বিজ্ঞান ও অভিধানের আশ্রয়ে বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইতে বাংলা গদ্যের বিলম্ব হইত।" ১

সিভিলিয়ানদের এতদ্দেশীয় ভাষা ও সংস্কৃতির সহিত পরিচিত করাইবার প্রয়োজনে ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইল। সঙ্গে সঙ্গেই নতুন যুগের বাংলা সাহিত্য—বিশেষতঃ গদ্য-সাহিত্য, প্রাণ-প্রেরণায় সঞ্জীবিত হইয়া উঠিতে লাগি দেশের শিক্ষাপদ্ধতি, ইতিহাসের সন্ধিলগ্নে পদক্ষেপ করিল।

তাই বলিয়া প্রাক্-ইংরাজী পর্ব্বে যে আমরা অশিক্ষা বা নিরক্ষরতার তমসার মধ্যেই একান্তভাবে লীন হইয়া ছিলাম, এ কথাও সত্য নহে। ছাপা-বইয়ের প্রশ্ন উঠিতেই পারে না—এমন কি বিদ্যাচর্চ্চা যে হস্তলিখিত পুঁথিনির্ভর ছিল, তাহাও নয়। শ্রুতি এবং স্মৃতিই সেই শিক্ষার মুখ্য অবলম্বন ছিল, তাহা হইতেই জাতীয় জীবন শক্তি ও উদ্দীপনা লাভ করিত:

"বাংলার পল্লীবাসিদের মধ্যে কেহ কেহ নিরক্ষর থাকিলেও তাহাদের শিক্ষার অভাব কোনকালেই হয় নাই। আকবর লিখিতে পড়িতে জানিতেন না—আমাদের দেশের আর্য্যগণ পূর্ব্বকালে মুখে মুখেই বেদ-বেদান্ত আবৃত্তি করিতেন। পুস্তক লেখা ও পড়ার পাঠ বৈদিক যুগে কমই ছিল। মনে ও স্মৃতিতে তাঁহারা জগতের সব তত্ত্ব গাঁথিয়া রাখিতেন। অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার অর্থ—সমস্ত জ্ঞান আয়ত্ত

১। উইলিয়ম্ কেরী—সাহিত্য সাধক চরিতমালা, সজনীকান্ত দাস

করিয়া চরিত্রের অঙ্গীভূত করা, জ্ঞান শুধু লিপি-পরিচিত প্রচারের অপরিহার্য অঙ্গীয় বলিয়া অনেক সময়ে বিবেচিত হইত না। আমাদের দেশের নিম্ন শ্রেণীর লোকেরা মুখে মুখে এখনও বড় বড় গণিতের সমস্যা পূরণ করিতে পারে। তাহাদের কতকগুলি এমন বাঁধা নিয়ম ছিল যে অতি সহজেই গণিতে এমন জ্ঞান অর্জ্জন করিতে পারিত, যাহা অঙ্কশাস্ত্রে এম, এ উপাধিধারীর পক্ষেও অসাধ্য।" ১

এই শিক্ষার সার্থকতা যাহাই থাক—নূতন কাল এবং নবীন ভাবধারার প্রয়োজনে, পরিবর্ত্তিত অর্থনৈতিক অবস্থায়, কলিকাতার ক্রম-বিবর্ত্তনের ঐতিহাসিক পর্য্যায়ে নবতর শিক্ষা অপরিহার্য্য ভাবেই আবির্ভূত হইল। ১৮০০ সালে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইলে ইংরাজ সিভিলিয়ানদের (এবং অন্যান্য নবাগত বিভিন্ন উদ্দেশ্যবহ বৈদেশিকদের জন্যও) ব্যাপক ভাবে বাংলা গ্রন্থ রচনার আয়োজন চলিল। রামরাম বসুর **'প্রতাপাদিত্য চরিত'** (১৮০১)-কে লইয়া ঘটিল ইহার সূত্রপাত। ক্রমে ক্রমে অগ্রসর হইয়া আসিলেন গোলোকনাথ শর্ম্মা, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, তারিণীচরণ মিত্র, রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায় এবং হরপ্রসাদ রায় প্রভৃতি। বিদ্যা-সাগরের **'বেতাল-পঞ্চবিংশতি'** ও (যদিও পাঠ্যরূপে নির্ব্বাচিত হয় নাই)—এই উদ্দেশ্যেই লিখিত হইয়াছিল।

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের লক্ষ্য ভিন্নতর হইলেও ইহার প্রয়োজনে রচিত কিছু কিছু গ্রন্থ বালকপাঠ্যতার উদ্দেশ্য-সিদ্ধির আনুকূল্য করিয়াছে। এই প্রসঙ্গে পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের ভূমিকা বিশেষ ভাবে স্মর্তব্য। আধুনিক বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের আদিনায়ক মৃত্যুঞ্জয়ের রচনায় প্রাঞ্জলতা ও প্রসাদগুণের অপূর্ব্ব সমন্বয় সাধিত হইয়াছিল এবং তাঁহার লেখাতেই বস্তুতঃ আমরা সাহিত্যের প্রথম স্বাদ পাইলাম। তাঁহার **'বত্রিশ সিংহাসন'** (১৮০২) এবং

১। বৃহদ্বঙ্গ; দীনেশচন্দ্র সেন; দ্বিতীয় ভাগ; পৃঃ ৮৯৬

'হিতোপদেশে'র (১৮০২) এই দিক হইতে সবিশেষ মূল্য আছে। 'বত্রিশ সিংহাসনের' সারাংশ বর্ণনায় মৃত্যুঞ্জয়ের ভাষা এইরূপ :

"*ঐ বিক্রমাদিত্য রাজার স্বর্গাধিরোহণের পরে সেই সিংহাসনে বসিবার উপযুক্ত কেহ না থাকাতে সিংহাসন মৃত্তিকার মধ্যে প্রোথিত* হইয়াছিল কিছুকাল পরে শ্রী:ভোজ রাজার অধিকারের সময়ে ঐ সিংহাসন প্রকাশ হইল। তাঁহার উপাখ্যানের বিস্তার এই।......"

"এইরূপে বিক্রমাদিত্যের দয়া, ক্ষমা, শৌর্য, বীর্য্য, মহত্ত্ব, বীরত্ব, ধীরত্ব প্রভৃতির আখ্যান বিবৃত করিয়া পুত্তলিকাগণ বলিলেন :—আপনি আমাদের মুনির অভিশাপ হইতে মুক্ত করিয়া স্থাবর অবস্থা হইতে জঙ্গম অবস্থায় আনিয়াছেন অতএব আপনি এই সিংহাসনে আরোহণ হইতে বিরত থাকুন। ইহা কহিয়া—তাহারা আসন লইয়া প্রস্থান করিল—"

গোলোকনাথ শর্ম্মাও মোটের উপর তখন বেশ সরল ও বালক-বোধ্য প্রাঞ্জল গদ্য রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার "হিতোপদেশ" গ্রন্থটির (১৮০২) সূচনাপর্ব্ব এই রকম :—

"কোন নদীর তীরেতে পাটলীপুত্র নামধেয় এক নগর আছে, সে স্থানে সর্ব্বস্বামীগুণোপেত সুদর্শন নামে এক রাজা ছিল। সেই রাজা এককালে কোন কাহার মুখে দুই শ্লোক শুনিলেন তাহার অর্থ এই শাস্ত্র সকলের লোচন অতএব যে শাস্ত্র না জানে সে অন্ধ। আর যৌবন ধনসম্পত্তি প্রভুত্ব অবিবেক ইহার যদি এক থাকে তবেই অনর্থ সমুদায় থাকিলে না জানি কি হয়। ইহা শুনিয়া সেই রাজা অত্যন্ত উদ্বিগ্ন মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন যে আমার পুত্রেরা অতিমূর্খ অতএব ইহাদের কি হবে এমন পুত্র থাকা না থাকা তুল্য—"

উইলিয়ম কেরী অনন্যকর্ম্মা পুরুষ। ব্যাকরণ, ওলড্ টেস্টামেণ্ট্ হইতে আরম্ভ করিয়া "কথোপকথন" পর্য্যন্ত সব কিছুই তিনি পরিবেষণ করিয়া গিয়াছেন। বাংলা গদ্যের এবং আধুনিক শিক্ষার ইতিহাসে তাঁহাকে যুগপুরুষ বলিয়া চিহ্নিত করা যাইতে পারে।

কেরীর সংকলিত "**ইতিহাসমালা**" (১৮১২)-কেও শিশু বা কিশোর সাহিত্য রচনার একটি পদক্ষেপ বলিয়া মনে করা উচিত। নামতঃ "ইতিহাস" হইলেও ইহা বিভিন্ন উৎস হইতে সংগৃহীত কতগুলি বিচিত্র রসের গল্পের সংকলন মাত্র। শিক্ষামূলক উদ্দেশ্য এই গল্পগুলির মধ্যে আছে কিন্তু আনন্দ বিতরণের প্রয়াসও সমভাবেই বিদ্যমান। দৃষ্টান্ত স্বরূপ দুটি গল্প উদ্ধৃত করা যাক :—

এক রাজার অতি সুন্দরী কন্যা কিন্তু সে হরিণী বদনা জন্মিয়াছিল রাজা তাহাতে সদা ভাবিত কি ক্রমে বিবাহ হইবেক স্বীকার কেহ করে না এই মতে প্রায় বার তের বৎসর বয়ঃক্রম হইল। এক দিবস রাজা ভাবিত হইয়া সভা মধ্যে বসিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন রাত্রি প্রভাতে প্রথম যাহার মুখদর্শন করিব তাহার সহিত কন্যাই কন্যার বিবাহ দিব। পর দিন প্রথমে একজন মন্ত্রিপুত্রকে দেখিয়া প্রতিজ্ঞা পালন করিলেন। মন্ত্রিপুত্র একদিন রাজকন্যাকে জিজ্ঞাসিলেন তোমার হরিণী বদনের বিবরণ কি কন্যা কহিল তবে শুন যদি তুমি ইহার প্রতিকার করিতে পার তবে আমার মানুষের মুখ হইতে পারিবেক শুন আমি জাতিস্মরা পূর্ব্বজন্মে হরিণী ছিলাম চিত্রকূট পর্ব্বতের মধ্যে একটা অতি বড় কূপ আছে তন্মধ্যে যে যে মানস করিয়া প্রাণত্যাগ করে তাহার জন্মান্তরে তাহাই সিদ্ধ হয়। অতএব আমি রাজকন্যা হইব এই মানস করিয়া তাহাতে পড়িয়াছিলাম কিন্তু আমার মস্তকে একটা লতা লাগিয়া মাথা উপরে ছিল সর্ব্বাঙ্গ জলমধ্যে এ কারণে আমার এদশা তুমি যদি সেই মাথা তথায় যাইয়া সেই জলমধ্যে ফেলিয়া দিতে পার তবে আমার মস্তক মনুষ্যাকার হয়। মন্ত্রিপুত্র তাহা শুনিয়া সেই চিত্রকূট পর্ব্বতে গিয়া সেই মত করিলে রাজকন্যার মনুষ্যের মস্তক হইল। রাজা দেখিয়া এবং বিবরণ শুনিয়া অতি তুষ্ট হইয়া মন্ত্রিপুত্রকে অর্দ্ধরাজ্য দিয়া রাজা করিলেন ইতি।—(৪০ চত্বারিংশ কথা।)

১৪২ দ্বাচত্বারিংশ শতাধিক শততম কথা।—

এক ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ সর্ব্বত্র ভিক্ষা করিয়া কালক্ষেপ করে।

একদিন ভিক্ষার্থে যাইয়া এক মুচীর বাটীতে উপস্থিত হইয়া দেখিল যে ঐ মুচীর দ্বারে পক্ষী মনুষ্যের মত কথা কহিতেছে ভিক্ষুক তাহার নিকটে ভিক্ষা চাহিবা মাত্র ঐ পক্ষী কহিতে লাগিল আরে দুষ্ট ব্রাহ্মণ তুমি ভিক্ষাছলে আমার মুনীবের ঘরে চুরি করিতে আসিয়াছ এইক্ষণে দূর হও এই ২ মত অনেক কটু বাক্য কহিলেন ব্রাহ্মণ তথা হইতে গিয়া এক মুনির বাটীতে গিয়া উপস্থিত হইয়া সেখানে এক পক্ষীকে দেখিয়া কহিল যে আমি অতিথি ইহা শুনিয়া ঐ পক্ষী কহিল মহাশয় আসিতে আজ্ঞা হউক আজি আমার প্রভুর বাটী পবিত্র হইল আপনি পাদ প্রক্ষালন করুন এবং ভোজনাদি করুন এই রূপ স্তুতিবাক্য শুনিয়া ব্রাহ্মণ পক্ষিকে জিজ্ঞাসা করিল হে পক্ষি শুন তোমার মত এক পক্ষী মুচীর বাটীতে দেখিলাম কিন্তু তাহার কটু বাক্যে আমি দুঃখী হইয়াছি তোমরা এক জাতি পক্ষী দেখি কিন্তু স্বভাব ভিন্ন ২ পক্ষী কহিল যে আমি ঐ পক্ষী এক মাতার উদরে জন্মিয়াছি কিন্তু মুনির সংস্পর্শে সেই মত কথা শিখিয়াছি অতএব সংসর্গজা দোষগুণা ভবন্তীতি।

গল্পরস ব্যতীতও রচনা দুইটির প্রসাদগুণ এবং লালিত্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইহাদের ভাষা যে কত সহজ ও সাবলীল মধ্যে মধ্যে প্রয়োজনীয় কয়েকটি ছেদচিহ্ন ব্যবহার করিলেই তাহা সুপরিস্ফুট হইবে। বাস্তবিক পক্ষে "ইতিহাসমালায়" আমরা শিশু সাহিত্যের প্রথম পদধ্বনি শুনিতে পাইতেছি। উইলিয়ম কেরী এইদিক হইতেও একটি নূতন সম্ভাবনাকে সূচিত করিয়া গিয়াছেন। ১

১। "ইতিহাসমালার ভাষা ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের প্রাথমিক যুগের ভাষা অপেক্ষা উন্নত এবং গদ্যরচনার একটা স্টাইলও ইহাতে লক্ষিত হয়।...কেরী যদি স্বয়ং এগুলি রচনা করিয়া থাকেন, তাহা হইলে বলিতে হইবে, বাইবেল-অনুবাদের আড়ষ্টতা তিনি ইহাতে বর্জ্জন করিয়াছেন।"—(সজনীকান্ত দাস, 'কথোপকথনে'র ভূমিকা, পৃঃ ২৸৵০)

॥ ২ ॥

কেরী এবং তাঁহার পণ্ডিতগণের প্রয়াসে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের তীর্থ-তোরণ প্রথম উন্মুক্ত হইল। কিন্তু দেশের অপরিণতচিত্ত শিশু ও কিশোরদের জন্য একান্তভাবে বিশিষ্ট পর্য্যায়ের গ্রন্থ রচনার প্রয়োজন দেখা দিল অন্যভাবে। রামমোহন রায়ের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া বিশাল-হৃদয় ভারত-প্রেমিক ডেভিড হেয়ার প্রাথমিক শিক্ষার একটি সুসামঞ্জস্য রচনা এবং বিস্তৃতির প্রয়োজনে মিশনারীদের সহযোগে ১৮১৭ সালে গড়িয়া তুলিলেন দুইটি প্রতিষ্ঠান (১) **কলিকাতা স্কুল সোসাইটি** এবং (২) **কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটি।** স্কুল সোসাইটির কাজ হইল কলিকাতার ১৩৬টি পাঠশালার পরিচালনা এবং স্কুল বুক সোসাইটি এই পাঠশালাগুলির প্রয়োজনে বিভিন্নবিষয়ক গ্রন্থ বাংলা ভাষায় প্রকাশ করিতে লাগিলেন। আমাদের শিক্ষা ও সংস্কৃতির ইতিহাসে এই দুইটির দান অসামান্য।

১৮১৮ হইতে ১৮৫৮ (?)সালের মধ্যে এই Society যে কী বিপুল উদ্যম এবং কর্ম্মপ্রেরণা লইয়া অগ্রসর হইয়াছিলেন, তাহা ইঁহাদের প্রকাশিত ও প্রচারিত গ্রন্থতালিকার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে। এই তালিকার মধ্যে পিয়ার্সনের 'বাক্যাবলী' আছে, বাংলা ও ইংরাজী ব্যাকরণ Bengali and English Grammar আছে, ফুল্‌টন ও নাইটের অভিধান আছে, ল্যাম্প্রেয়ারের কৃত মহামূল্যবান ক্ল্যাসিকাল ডিক্‌শনারী আছে (Lamprier's Classical Dictionary), আলেকজাণ্ডার পোপের হোমার ও Essay on Man আছে, লসনের Natural History আছে, আবার তারিণীচরণ মিত্রের "নীতিকথা", Aesop's Fables এবং তারাচাঁদ দত্তের "মনোরঞ্জনেতিহাস"ও রহিয়াছে।

এই দুইটি Societyর পরিচালনায় একদিকে যেমন ডেভিড হেয়ার ও উইলিয়ম কেরী প্রমুখ ইউরোপীয় ও মিশনারীরা ছিলেন, অন্যদিকে সেইরূপ দেশীয় প্রতিনিধিরূপে রাজা রাধাকান্ত দেব এবং গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার প্রমুখও ছিলেন। শিক্ষাগ্রন্থ রচনায় এবং শিক্ষার প্রসারে যাহাতে মিশনারী ধর্ম্মীয় মনোভাব প্রাধান্য লাভ না করে সে-সম্পর্কে সতর্কতা অবলম্বন করিয়া রাধাকান্ত দেব প্রভৃতি এই মর্ম্মে একটি আইন পাশ করাইয়া ছিলেন যে, কোনো ধর্ম্মমূলক গ্রন্থ সোসাইটি দুইটি হইতে প্রকাশ প্রচার ও করা চলিবে না।

ছাত্র সংখ্যার ক্রম-বর্দ্ধন, সমিতির ব্যয় বৃদ্ধি এবং বিনামূল্যে গ্রন্থ বিতরণের আতিশয্যে অবস্থা নিয়ন্ত্রণের বাহিরে চলিয়া গেল। শেষ পর্য্যন্ত প্রতিষ্ঠান দুইটিকে তুলিয়া দিতে হইল। কিন্তু ইহাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছিল। প্রায় ৪০ বৎসর আয়ুষ্কালের মধ্যে দেশব্যাপী শিক্ষার যে ব্যাকুলতা ইঁহার সৃষ্টি করিয়া গেলেন, 'তরুণ-গরুড়সম' যে জ্ঞানের সাধনায় সমগ্র বাঙালী জাতি চঞ্চল হইয়া উঠিল—তাহাই ভবিষ্যতের ঐতিহাসিক পদক্ষেপ সূচিত করিল।

স্কুল বুক সোসাইটির অনেক ক'টি গ্রন্থই শিশু-সাহিত্যের পটভূমিকা রচনায় সহায়তা করিয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ তারিণীচরণ মিত্রের **নীতিকথা (১৮১৮)** (রামকমল সেন ও রাধাকান্ত দেবের সহযোগে রচিত) তৃতীয় ভাগ হইতে ঈশপের গল্পের রূপান্তর উদ্ধৃত করা গেল :

১। ভেক আর বৃষ

কোন প্রান্তর মধ্যে প্রকাণ্ড শরীর এক বৃষ চরিতেছিল, সেখানে অতিপ্রাচীন্ একটা বৃদ্ধ হিংস্র ভেক আসিয়া বৃষের দিগে মুখ বিস্তৃত করিয়া আপন অপত্যদের ডাকিয়া কহিতে লাগিল, হেদে দেখ একটা অসম্ভবাকার ষাঁড় চরিতেছে বৃষের শরীর বৃহৎ আর পেটমোটা, কিন্তু যদি আমি ইচ্ছা করি তবে এইক্ষণে ইহা অপেক্ষা দ্বিগুণ স্থূল হইতে পারি। ইহা কহিয়া ভেক দুই চারিবার লম্ফ দিয়া শ্বাস অবরোধ

করিয়া আপন উদর স্ফীত করিতে লাগিল কিঞ্চিৎকালে উদরের চর্ম্ম ফাটিয়া ভেক মরিয়া গেল।

তাৎপর্য্য : আপন শক্তি ও ক্ষমতার অতিক্রম করিয়া কর্ম্ম করা মনুষ্যের অকর্ত্তব্য। যে ব্যক্তি যেমত সে তদনুসারে চলুন, ইহার বিপরীতাচরণ করিলে তাহার প্রশংসা ও মান্যতা হওয়া দূরে থাকুক বরং স্বয়ং নষ্ট হয়। প্রমাণ এই, অনেক লোক ধনবান ব্যক্তিদিগের ব্যবহার ও বিষয় দেখিয়া আপন সামর্থ্য অতিক্রম করিয়া চলে, তাহাতে সে সকল লোক মান্য না হইয়া ত্বরায় অপমানিত হয়, এবং তাহাদের সঞ্চিত অর্থের বিনাশ হয়।"

ভাষ্যের আতিশয্য সত্ত্বেও গল্পটির মধ্যে সরসতা আছে। "বৃষের দিগে মুখ বিস্তৃত করিয়া এবং দু চারি বার লম্ফ দিয়া" বক্তৃতাকারী ভেকের চরিত্রটিতে মূঢ় অহমিকার সুন্দর ইঙ্গিত রহিয়াছে।

তারাচাঁদ দত্তের **মনোরঞ্জনেতিহাস"** (১৮৪২)-ও অনুরূপ গল্পকথার সংগ্রহ। ইহার একটি এইরূপ :—

অসার আশা

অসম্ভব আশার নাহিকো কিছু ফল।
কিছুকাল মনে সুখ শেষেতে নিষ্ফল॥

একজন সিপাহী এক কলসী ঘৃত ক্রয় করিয়া বাজার হইতে আপন ঘরে অনিবার কারণ, চারি আনা মূল্যে এক মুটিয়া ভাড়া করিল, সেই মুটিয়া সেই কুম্ভ মস্তকে লইয়া অতিশয় উল্লসিত হইয়া মনে মনে কহিতে লাগিল, ইহাতে যে বেতন পাইব তাহাতে এক দম্পতি হংস ক্রয় করিব। তাহার বাচ্চা ক্রমে ক্রমে অনেক হইবে, পরে সে সকল বিক্রয় করিয়া এক দম্পতি অজ ক্রয় করিব, তাহার বাচ্চা হইলে দুগ্ধ বিক্রয় করিয়া আমার নির্ব্বাহ হইবে ; এবং ক্রমে ক্রমে পাল বাড়িলে সকল বিক্রয় করিয়া সাত আট সের দুধ দেয় এমন একটি গাভী ক্রয় করিয়া ধন সঞ্চয় করিব। অল্প সময়ে বিস্তর বৎস ও ধেনু ঐ গাভীর দ্বারা হইবে, তাহার মধ্যে যাহাদের দুই চারি দন্ত হইবে তাহা উত্তম

মূল্যে বিক্রয় করিব। এই রূপে বহু ধনাধিপতি হইলে এক সুন্দরী ও উপযুক্তা কন্যা বিবাহ করিব এবং এক বৎসরের মধ্যে সন্তানও হইতে পারিবে। তখন আপনি কোন কর্ম্ম করিব না, আমার দাসেরাই সকল করিবে, আমি কেবল বসিয়া ঠাকুরালী করিব। যখন আমার পুত্র অন্তঃপুর হইতে আসিয়া আমাকে কহিবে যে পিতঃ ভোজন কর আসিয়া, তখন এমনি করিয়া (মাতা নাড়িয়া) বলিব, যে এখন ভোজন করিব না। এই কথা কহিয়া মস্তক নাড়িবামাত্র ঘৃত কুম্ভ মস্তক হইতে পড়িয়া ভাঙ্গিয়া গেল; তাহাতে সিপাহী তাহাকে বেত্রাঘাত করিল।

ইহার তাৎপর্য্য এই, যেজন আপনার পদের কিম্বা অবস্থার অধিক অথবা তৎসম্ভব ও দুর্লভ আশাতে মত্ত হয় তাহাকে নিরাশ ও দুর্দ্দশান্বিত হয়।”

উদ্ধৃত গল্পটি নানা রূপে ‘পঞ্চ-তন্ত্র’ হইতে আরম্ভ করিয়া আর-ব্যোপন্যাস পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত। এ ক্ষেত্রে ইহাই বিশেষ লক্ষণীয় যে যে “মনোরঞ্জনেতিহাস”-কার কাহাকেও অবলম্বন না করিয়া সর্ব্বজন-পরিচিত কাহিনীকে সম্পূর্ণ নূতনভাবে রচনা করিয়াছেন এবং ঘৃতবাহক শ্রমিকটির দিবাস্বপ্নদর্শনের বর্ণনায় তাঁহার মৌলিকতা এবং কল্পনাকুশলতা ফুটিয়া উঠিয়াছে। শিক্ষা আনন্দদানের সহিত অভেদাত্ম—School Book Societyর গ্রন্থ রচয়িতারা তাহা কিছু পরিমাণে উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়।

মাত্র গল্পের মাধ্যমেই যে শিক্ষাদান এবং চিত্তরঞ্জনের প্রয়াস স্কুল বুক সোসাইটি করিয়াছিলেন তাহা নহে, অতিশয় নীরস এবং তত্ত্ব ও বিজ্ঞানমূলক আলোচনাকেও তাঁহারা রসের আধারে উপস্থাপিত করিতে চাহিয়াছিলেন। **“পিয়ার্সনের ভুগোল এবং জ্যোতিষ”** (Dialogues on Geography and Astronomy etc. for the use of Schools) কথোপকথনের মাধ্যমে রচনা করিয়া বিষয়টিকে হৃদ্য ও আকর্ষণীয় করিয়া তোলার চেষ্টা হইয়াছে:

"প্রথম পাঠ

পৃথিবীর আকার এবং পরিমাপের বিবরণ

নিত্যানন্দ পরমানন্দকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন, ওহে ভাই পরমানন্দ, এই পৃথিবীর বিবরণ তোমার ঠাঁই কিছু কিছু জানিতে যাচ্ঞা করি। যদি বলিতে পার তবে অনুগ্রহ করিয়া ক্রমে ক্রমে আমাকে বুঝাইয়া দেও। ইহার মধ্যে আগে এই জিজ্ঞাসা করি, যে পৃথিবীর আকার কেমন ?

পরমানন্দ বলিতেছেন, তবে শুন পৃথিবীর আকার গোল নয়। ফলতঃ উত্তর দক্ষিণে কিঞ্চিত চাপা আছে। তাহার একটি দৃষ্টান্তস্থল বাতাবি লেবু; যেমন তাহার বোঁটার নিকট নীচে কিঞ্চিত নিম্ন থাকে পৃথিবীর আকারও তেমনি জানিবা।"

শিক্ষাদানের প্রয়োজনে এই রম্যতার আশ্রয় গ্রহণ সে যুগে যে বিশেষ ফলপ্রসূ হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। গণিতের গ্রন্থেও কাব্য-সরস্বতীর অধিষ্ঠান ঘটিয়াছে দেখা যায়। চুঁচুড়ার রেভারেণ্ড্ মে-র তত্ত্বাবধানে পাঠশালার প্রয়োজনে সংকলিত "গণিত" (Ganita) গ্রন্থের ১৮১৯ সালে প্রচারিত দ্বিতীয় সংস্করণে বর্গফুটের একটি অঙ্ক এই ভাবে উপস্থিত করা হইয়াছে :

দেউলের মাপ

আছিল দেউল এক বিচিত্র গঠন
ক্রোধ করি জলে ফেলে পবন নন্দন
অর্দ্ধেক পঙ্কেতে তার তিন ভাগ জলে
দশম ভাগের ভাগ শেহলার তলে
উপরে বায়ান্ন গজ দেখি বিদ্যমান
সকলে কতেক দেউল কর পরিমাণ॥

অঙ্কের জটিলতায় কাব্যের স্বাদ লাগিয়াছে। নিষ্করুণ গ্রন্থের নির্ম্মমতা ইহাতে যেন অনেকখানি কোমল এবং সুন্দর হইয়া উঠিয়াছে।

কিন্তু শিক্ষা প্রদানের এই পদ্ধতি যে সকলের পক্ষেই রুচিকর এবং গ্রাহ্য বলিয়া মনে হইয়াছিল তাহা নয়; কোনো-কোনো গম্ভীর-বেদী এই রীতির বিরুদ্ধে সুস্পষ্টই প্রতিবাদ তুলিয়াছিলেন। তাঁহারা ভাবিয়াছিলেন ইহাতে শিক্ষার মর্য্যাদা থাকিতেছে না, জ্ঞানের রস তরল হইয়া যাইতেছে। তাই স্কুল বুক সোসাইটির গ্রন্থ-রচয়িতাদের উদ্দেশ্যে ভ্রুকুটি করিয়া পণ্ডিত মদনমোহন তর্কালঙ্কার তাঁহার জনপ্রিয় "শিশুশিক্ষা" তৃতীয় ভাগের মুখবন্ধে বলিতেছেন:

"কেবল মনোরঞ্জনের নিমিত্ত শিশুগণের উন্মেষোন্মুখ নির্ম্মল চিত্তে কোন প্রকার কুসংস্কার সঞ্চারিত করা আমাদের অভিপ্রেত নহে। এ নিমিত্ত হংসীর স্বর্ণ ডিম্ব প্রসব, শৃগাল ও সারসের পরস্পর পরিহাস নিমন্ত্রণ, ব্যাঘ্রের গৃহদ্বারে বৃহৎ পাকস্থলী ও কাষ্ঠভার দর্শনে ভয়ে বলীবর্দ্দের পলায়ন, পুরস্কারের লোভে বক কর্ত্তৃক বৃকের কণ্ঠে বিদ্ধ অস্থিখণ্ড বহিষ্করণ, ধূর্ত্ত শৃগালের কপটস্বরে মুগ্ধ কাকের স্বীয় মধুর স্বর পরিচয় দান প্রভৃতি অসম্বদ্ধ অবান্তর বিষয় সকল প্রস্তাবিত না সুসম্বদ্ধ নীতিগর্ভ আখ্যান সকল সম্বদ্ধ করা গেল।"

এই বলিয়া লেখক উপদেশপূর্ণ নীতিমূলক প্রসঙ্গের সমাবেশ করিয়াছেন।

মদনমোহন তর্কালঙ্কারের মতো রসিক কবি—যিনি ভারতচন্দ্রের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া "বাসবদত্তা" কাব্য রচনা করিয়াছিলেন, তাঁহার পক্ষে এই বিভ্রান্তি বিস্ময়কর। তাঁহার "পাখী সব করে রব" আজও শ্রেষ্ঠ শিশু কবিতা। চিত্তকে আর একটু সহৃদয় করিয়া এবং চিন্তাকে আরো কিছু প্রসারিত করিয়া দেখিলে মদনমোহন বুঝিতে পারিতেন, স্তুতিমুগ্ধ একটি নির্ব্বোধ কাকের সংক্ষিপ্ত কাহিনী শিশু-মানসে যে শিক্ষার অঙ্কুরটি বপন করিয়া দিবে—দীর্ঘচ্ছন্দে রচিত গুরু-গম্ভীর একটি নীতি-নিবন্ধ তাহার এক দশমাংশও ফলপ্রসূ হইবে না—হইতে পারে না।

॥ ৩ ॥

এই সব শিক্ষা-গ্রন্থে শিশু সাহিত্যের পূর্ব্ব সূচনা দেখা দিলেও ইহাকে অগ্রসর করিয়া লইয়া চলিল কতগুলি পত্র-পত্রিকা। উইলিয়ম কেরী লিখিত কথোপকথনের ভূমিকায় সজনীকান্ত দাস লিখিয়াছেন ঃ

"বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসে ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দ নানা কারণে উল্লেখযোগ্য, এক হিসাবে এই বৎসরকে যুগ-পরিবর্ত্তনের বৎসর বলা চলে ; সে ভাষা এতদিন অনুবাদ গ্রন্থ, বিচার গ্রন্থ ও পাঠ্য পুস্তকের অস্বাভাবিক আশ্রয়ে খোঁড়াইয়া চলিতেছিল, সাময়িকপত্র প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে সেই ভাষাকেই যেন খোঁড়া পায় দৌড় করানো হইল।"

মুদ্রাযন্ত্রের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে বাংলা দেশে গ্রন্থ প্রকাশের যেন বন্যা আসিয়া গেল। ইংল্যাণ্ডে ক্যাক্স্‌টনের মুদ্রা-যন্ত্রের প্রতিষ্ঠাও অনুরূপ ইতিহাসই রচনা করিয়াছিল। শিক্ষা-গ্রন্থ হইতে আরম্ভ করিয়া রস-কাহিনী, উপকথা, প্রেমকাব্য প্রভৃতি সমভাবে মুদ্রিত হইতে লাগিল। বিশেষ ভাবে বালক বা শিশুপাঠ্য কিছু প্রকাশিত হইল না বটে, কিন্তু এই সব গ্রন্থ হইতেই বালকেরা প্রয়োজনীয় সাহিত্য খুঁজিয়া পাইত। শিশুরা সম্ভবতঃ মা-ঠাকুমার মুখ হইতে উপকথার গল্প শুনিয়াই খুশী হইত। আর বালকেরা 'কামিনীকুমার' বা 'চন্দ্রকান্ত' না পড়িলেও 'গোলে বকাওলী'র স্বাদ একেবারে যে লইত না সে কথাও মনে হয় না।

যে বৎসর স্কুল বুক সোসাইটির প্রতিষ্ঠা, সেই বৎসরেই "দিগদর্শনের" আত্ম-প্রকাশ। ইহাই প্রথম বাংলা সাময়িক পত্র এবং ভারতবর্ষে প্রথম তরুণ-পাঠ্য পত্রিকা।

স্কুল বুক সোসাইটির প্রবর্ত্তনায় যে নব শিক্ষার আন্দোলন দেখা

দিল, 'দিগ্‌দর্শন' আবির্ভূত হইয়াছিল তাহারই বাণীবহরূপে। আমরা ইহার দুই বৎসরের একত্র সংকলিত খণ্ডটির আখ্যাপত্র উদ্ধৃত করিতেছি :

Dig-Darshun

or

The Indian Youth's Magagine,

Form April 1818 to Ma-ch 1819

and from

Januay to April 1820

দিগ্দর্শন

যুবলোকের কারণ সংগৃহীত নানা উপদেশ

ইং এপ্রিল ১৮১৮ লাং মার্চ্চ ১৮১৯

এবং

ইং জানেওয়ারি লাং এপ্রিল ১৮১০

শ্রীরামপুরের মিশন প্রেস হইতে 'দিগদর্শন' মুদ্রিত হইত। ইহার সম্পাদক ছিলেন মার্শম্যান। কিন্তু উইলিয়ম কেরীর সহিতও শ্রীরামপুরের 'দিগদর্শন' পত্রিকার পরোক্ষ যোগ ছিল। সর্ব্বসমেত পত্রিকাটির ২৬টি সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছিল।

'দিগদর্শন' নামের মধ্যেই পত্রিকাটির মর্ম্মকথা নিহিত রহিয়াছে। ইহা যেন বিজ্ঞান, সাহিত্য, ইতিহাস ও ভূগোল ইত্যাদি সর্ব্বদিকব্যাপী পরিক্রমার প্রয়াস। পত্রিকাটিকে নিয়ন্ত্রণ করিত সর্ব্বমুখী সন্ধানী বৈজ্ঞানিক চেতনা।

সাধারণভাবে দুই চারিটি পৃষ্ঠা উল্‌টাইলে 'দিগ্‌দর্শনে'র গুরুত্ব বোঝা যাইবে না এবং নবশিক্ষা আন্দোলনের সহিত এই পত্রিকার সম্পর্ক স্মরণ না রাখিলে ইহার যথার্থ তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম হইবে না। ইহা কেবল মিশনারীদের শুভবুদ্ধিদ্বারা প্রণোদিত হইয়াই জন্মলাভ

করে নাই। দিগ্‌দর্শনের জন্মের নেপথ্যে স্কুলবুক সোসাইটির দেশীয় চিন্তাশীল সমাজ (রাধাকান্ত দেব প্রমুখ) এবং বিদেশীয় বুধমণ্ডলী (হেয়ার, কেরী, প্রভৃতি) তাঁহাদের অনুপ্রেরণা সঞ্চার করিয়াছেন।

ইহার পৃষ্ঠায় বিভিন্ন বিষয়ক যে-সমস্ত প্রসঙ্গ পরিবেশণ করা হইয়াছিল, তাহার কিছু কিছু নমুনা এইরূপ :

(১) পৃথিবীর বিভাগের কথা	প্রথম সংখ্যা	৩য় পৃষ্ঠা
(২) আমেরিকার প্রথম দর্শন—	”	”
(৩) চুম্বক পাথরের প্রথম অনুভব	”	”
(৪) কোম্পাসের গুণ	”	৫
(৫) কোম্পাসের দ্বারা প্রথম জাহাজ চালান	”	
(৬) কলম্বাসের বিবরণ	”	”
(৭) বেলুনদ্বারা সদলর সাহেবের আকাশ গমন	”	২৮
(৮) বিসুবিয়াস অগ্নিময় পর্ব্বত	”	৩৭
(৯) রুশ দেশের কথা	”	৪১
(১০) পর্ত্তুগীজদের জাহাজের হিন্দুস্থানে প্রথম গমন	”	৫১
(১১) তাহাদের কলিকত (কালিকট) শহরে পৌছিবার কথা	”	৪৩
(১২) ইক্ষু ও তামাকের কথা	”	৫৯

উদ্ধৃত কয়েকটি বিষয় হইতেই দিগদর্শনের ব্যাপকতা অনুমান করা যাইবে। মাত্র পত্রিকাহিসাবে চিহ্নিত করিলে ইহার উপযুক্ত মর্য্যাদা দেওয়া হয় না। দিগ্‌দর্শনকে সংক্ষিপ্ত এনসাইক্লোপিডিয়ার গৌরব দেওয়া উচিত। বিষয়ের বৈচিত্র্য ও সর্ব্বাঙ্গীণতায় ইহা ভারত ও বিশ্বজগতের একটি সামগ্রিক পরিচিতির প্রয়াস।

স্কুল বুক সোসাইটির তৃতীয় রিপোর্ট (১৮১৯-২০) হইতে জানা যায়

যে পত্রিকাখানি পাঠ্যগ্রন্থের মতো বিষ্ঠালয়ে বিত্থালয়ে বিতরণ করা হইত। দিগ্দর্শন যন্ত্রের মতোই ইহা সেদিন তরুণ শিক্ষার্থী মনের পথিপ্রদর্শকের ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিল। শিক্ষার মধ্যে যে একটা সামগ্রিকতার চেতনা থাকা দরকার, এই পত্রিকার পরিচালক ও লেখকবৃন্দ সে-সম্পর্কে অবহিত ছিলেন।

রচনার ভাষা সহজ ও সুন্দর। ছেদ-চিহ্নের ব্যবহারে যদিও সর্ব্বত্র শৃঙ্খলা রক্ষিত হয় নাই, তাহা হইলেও পড়িতে কষ্ট হয় না।

কলম্বাসের প্রসঙ্গ এইরূপ:

"কলম্বাস স্পানিয়ার রাজার দরবার ছাড়িলে সেখানকার রাজার কতক মন্ত্রিরা রাণীর নিকট প্রার্থনা করিল যে তিনি কলম্বসকে পুনর্ব্বার ডাকেন তাহাতে সে রাণী কলম্বসকে পুনর্ব্বার ডাকিল কিন্তু তাহার স্বামী আপন কার্পণ্যপ্রযুক্ত পুনশ্চ পুনশ্চ তাহাকে হেয় জ্ঞান করিল তাহাতে যেমন কলম্বসের আশার বৃদ্ধি হইয়াছিল তেমনি তাহার আশাভঙ্গেতে দুঃখ হইল।

....ইহার পর কতকদিন মুসলমানেরদের রাজধানী নগর স্পানিয়ারদের অধীন হইল তাহাতে রাজা ও রাণী দরবারস্থুদ্ধ আনন্দে মগ্ন হইল। ইত্যবসরে কলম্বাসের মিত্ররা এই সময়ে উপযুক্ত ভাবিয়া স্পানিয়ার রাণীর নিকট গিয়া ঐ আহ্লাদের সময় কলম্বাসের সাহায্য করিতে প্রার্থনা করিলেন।"

ধর্ম্মীয় আলোচনা বা খ্রীষ্টীয় প্রচার স্কুল বুক সোসাইটির রীতি অনুযায়ী দিগ্দর্শনেও বর্জ্জিত হইয়াছে। সুতরাং ইহার মধ্যে মিশনারীদের প্রচার চেষ্টার কোন স্থূল হস্তাবলেপন পড়ে নাই। তাহা হইলেও পরোক্ষভাবে ইহার নানা প্রসঙ্গে সূক্ষ্ম ইঙ্গিতের দ্বারা প্রাচ্যবাসিগণ অপেক্ষা পাশ্চাত্যজনের সার্ব্বিক উৎকর্ষ প্রদর্শনের চেষ্টা ফুটিয়া উঠিয়াছে। যেমন "হিন্দুস্থানের ইতিহাস" বর্ণনা করিতে গিয়া কেবল যুদ্ধ ও লুটতরাজেরই বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। মামুদ প্রসঙ্গটি এইরূপ:

"সৈন্যেরা দেবালয়ের ধন ও রত্ন লুটিয়া দেবালয় ভাঙ্গিয়া সমভূমি করিল, এবং দেবপ্রতিমা সকল ছিন্ন করিয়া ঐ নগরের রাজপথে ছড়াইয়া ফেলিল; কিন্তু প্রধান প্রতিমাকে অধিক নিগ্রহ করিবার নিমিত্ত রাখিল, তাহার দ্বারা প্রতিমাপূজকদের সে পূজার বায়ু আর না জন্মে, এই কারণে ঐ প্রতিমা গজনেন নগরে লইয়া গেলেন এবং সেখানে সকল লোকের সম্মুখে মস্তক ছেদন করিলেন ও তাহার প্রত্যেক অবয়ব পথে ও রাজপথে ফেলিলেন যে জয়শীল মুসলমানেরা তাহা পায়ের দ্বারা দলন করে।"

এই বিবরণে ইংরাজের তৎকালীন নীতি অনুযায়ী মুসলমানের প্রতি হিন্দুর অন্তরে বিদ্বেষ-বীজ বপনের সূক্ষ্ম প্রচেষ্টা করা হইয়াছে এবং সেই সঙ্গে প্রাচ্যবাসীর বর্ব্বরোচিত চরিত্রেরও কিছু আভাস দেওয়া হইয়াছে। মুসলমানদের প্রতি অপ্রীতির আর একটি নিদর্শন এই রকম ঃ

"আফ্রিকার কেবল উত্তরভাগ মুসলমানদের অধীন ছিল যে ভূমধ্যস্থ সমুদ্রের দক্ষিণ পার্শ্বে। সেখানকার সকল মুসলমানেরা নানা রাজারা পরস্পর যুদ্ধ করিত। এবং সর্ব্বদা যে উপপ্লব হইত তাহা শুনিলে লোকেদের বিরক্ত জন্মে"—(আফ্রিকার মুসলমানদের রাজ্য বিবরণ)।

এই প্রসঙ্গে "বঙ্গভূমির মহাদুর্ভিক্ষ" লক্ষণীয়। পঞ্চাশের মন্বন্তরের বর্ণনায় ইহাতে একটি "সত্য ঘটনা" উপস্থিত করা হইয়াছে। কাহিনীটির মধ্য দিয়া অত্যন্ত কৌশলের সহিত ইংরেজ-চরিত্রের মহিমা এবং বাঙালীর চারিত্রিক দীনতার স্বরূপ নির্দ্দেশিত হইয়াছে।

"সেই সময় কলিকাতাস্থ এই ইংলণ্ডীয় সাহেব ধনার্থে তণ্ডুল সঞ্চয় করিতে এবং লোকের স্ব স্ব আহারার্থে সন্তান বিক্রয় করিতে উদ্যত হইল।......

...ঐ সাহেব আপন চাকরেরদিগকে আজ্ঞা করিলেন যে যত বালক বিক্রয় করিতে আসিবেক তাহাদিগকে ক্রয় কর।"

দুর্ভিক্ষের পরে—"সর্ব্বত্র ঘোষণা দিলেন যে যে লোকের সন্তান আমার এখানে আছে লইতে চাহিলে বিনামূল্যে তাহাদিগকে পাইবেক এই আশ্চর্য্য যে ইহা শুনিয়াও পুত্র লইতে কেহ আইল না, কেবল এক বৃদ্ধ স্ত্রী বধির ও বোবা আপন পুত্রকে লইতে আইল"।

কাহিনীটি সত্য মিথ্যা যাহাই হউক—ইহার অন্তর্নিহিত তাৎপর্য্য সহজেই উপলব্ধি করা যাইতে পারে এবং যুগ-পরিবেশ বুঝিয়া এই মনোভাব অবশ্যই মার্জ্জনীয়।

খ্রীষ্টীয় মিশনারীদের দুর্ব্বলতা আরো স্পষ্ট ভাষায় অসতর্ক মুহূর্ত্তে কখনো কখনো বাহির হইয়া গিয়াছে। যেমন বিসুবিয়াস পর্ব্বতের কাহিনী বলিতে গিয়া উদ্দেশ্যমূলকভাবে মুঙ্গেরের সীতাকুণ্ড প্রসঙ্গকে টানিয়া আনা হইয়াছে ঃ

"মুঙ্গোরের নিকটে সীতাকুণ্ডে ও হিন্দুস্থানের অন্য অন্য স্থানে উষ্ণ জল নির্গত হয় তাহার কারণ এই সেখানকার মৃত্তিকা আগ্নেয় বস্তুতে সম্পূর্ণ। এই এই স্থান হিন্দুরা অতিতীর্থ করিয়া মানে কিন্তু ইউরোপের মধ্যে এই মত অনেক পর্ব্বত আছে যে সেখান হইতে দিবারাত্র অগ্নি ও ধূম নির্গত হয়, এবং কোন কোন সময়ে স্রোতোন্যায় আগ্নেয় বস্তু দ্রবীভূত হইয়া বহে—তাহাতে চতুর্দ্দিগস্থ গ্রামগ্রভূমি নষ্ট হয়। সেই দেশে হিন্দুস্থানীয় এই এই রূপ চমৎকার স্থান হইতেও অধিক চমৎকার স্থান আছে সেই সেই দেশীয়েরা সে স্থানকে তীর্থ বলিয়া মানে না—"

দিগ্‌দর্শনের সামগ্রিক সদুদ্দেশ্য বিবেচনা করিয়া এই সমস্ত ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলিকে বিশেষ গুরুত্ব দান করা সমীচীন হইবে না। কৃতজ্ঞ চিত্তে মনে রাখিতে হইবে—ইহাতেই প্রথম আমাদের ইতিহাস-চর্চ্চার সূত্রপাত হইয়াছে। ফলতঃ এই পত্রিকা দীর্ঘজীবী না হইলেও ইহার স্বল্পায়ু-পরিসরেই এক নব-সঙ্কেত রাখিয়া গিয়াছে আর সেই সঙ্কেতকে অনুসরণ করিয়াই পরে 'বিবিধার্থ সংগ্রহ' ও 'রহস্য সন্দর্ভ পত্রিকা'র পদক্ষেপ ঘটিয়াছে।

পশ্বাবলী

দিগ্‌দর্শনের চারিবৎসর পরে ১৮২২ সনের ফেব্রুয়ারী মাসে "পশ্বাবলী" নামে একখানি বাংলা মাসিক পুস্তিকা প্রকাশিত হইল। নামকরণ হইতেই বোঝা যাইবে, প্রাণিবিদ্যা শিখানোই ইহার উদ্দেশ্য ছিল। ইহার প্রত্যেকটি সংখ্যায় একটি করিয়া জন্তুর কাঠ-খোদাই ছবি এবং সেই জন্তুর বিবরণ দেওয়া থাকিত। বিবরণগুলিকে গল্পের সাহায্যে আকর্ষণীয় করিবার চেষ্টা হইত। এক পাশে ইংরাজী দেওয়া থাকিত—আর একদিকে থাকিত তাহার অনুবাদ।

পাদরি লসন কর্ত্তৃক সংগৃহীত ও পীয়ার্স কর্ত্তৃক অনূদিত হইয়া পশ্বাবলী ছয় সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছিল। স্কুলের ছাত্রদের পারিতোষিক-পুস্তক হিসাবে গ্রহণীয় হইবে ইহা বিবেচনা করিয়া ১৮২২ সনে ছয় সংখ্যা একত্র করিয়া পুস্তকাকারে মুদ্রিত করা হয়।

এগারো বৎসর পরে নব পর্য্যায়ে পশ্বাবলীর পুনরুদ্বোধন ঘটে। ১৮৩৩ সালে হিন্দু কলেজের শিক্ষক রামচন্দ্র মিত্র পশ্বাবলি পুনঃ প্রকাশিত করেন। ইহার প্রথম সংখ্যা 'কুক্কুরের বৃন্তান্ত' দিয়া আরম্ভ হয়। রামচন্দ্র মিত্র সর্ব্বসমেত ১৬ সংখ্যা পশ্বাবলী প্রচার করিয়াছিলেন। ১৮৩৪ সালের ২৩শে অক্টোবর "জ্ঞানান্বেষণ" সংবাদ দিতেছেন:—"পশ্বাবলি—শ্রীযুক্ত রামচন্দ্রবাবু কর্ত্তৃক কৃত পশ্বাবলি নামক গ্রন্থ তাহার দ্বিতীয় খণ্ডের প্রথমাংশ যে আমাদের প্রতি প্রেরণ করিয়াছেন ঐ গ্রন্থ ইংরাজী হইতে সংক্ষেপ করিয়া ইংরেজী অক্ষরে ও বাংলা অক্ষরে অনুবাদ করিয়াছেন এবং তাহাতে পশুদিগের ইতিহাস উত্তম আহ্লাদজনক বিবরণ আরো উক্ত গ্রন্থ পাঠ করিয়া আমরা অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়াছি।" ১

রামচন্দ্রের 'পশ্বাবলী'তে বিবৃত জন্তুটির চিত্রের নিম্নে একটি করিয়া কবিতা দেওয়া থাকিত, সম্ভবতঃ সুকুমারমতি বালকদের স্মৃতিতে সহজে বিধৃত থাকিবে বলিয়া।

১। সংবাদপত্রে সেকালের কথা, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৩৭

রামচন্দ্রের 'The Ass' বা 'গাদা' শীর্ষক প্রসঙ্গের পূর্ব্বে যে কবিতাটি বিন্যস্ত করা হইয়াছে সেটি এই :—

সুশিষ্ট সুধীর গাদা পায় বহু ক্লেশ
বড় বড় বোঝা লয়ে ভ্রমে নানা দেশ ॥
গাদা করে মানবের নানা উপকার
নিষ্ঠুর মানব তারে করয়ে প্রহার ॥

ইহার সহিত সংশ্লিষ্ট কাহিনীর মূল ইংরাজি এবং বাংলা অনুবাদ এই রকম :—

"For a wager of fifteen pounds Mr. D. Wilson clother of Ipswich, in 1826 undertook to drive an ass, his own property, in a light gig to London and back again, a distance of one hundred and forty miles, in two days. The ass went to London at a pace little short of a good gig horse, and fed at different stages well ; on his return, he came in without the aid of a whip at rate of seven miles in an hour, and performed the whole jouney with care. He was two hands and a half high and halfbred English and Spanish."

তৃতীয় উপাখ্যান

"১৮২৬ সালে ইপস্বিচ নগরে ডি, উইলসন সাহেব একজন তন্তুবায় ১৫০ টাকা বাজি রাখিয়াছিলেন যে তিনি আপনার একগর্দ্দভযুক্ত একখানা হল্‌কী গাড়ী চড়িয়া দুই দিবসের মধ্যে লণ্ডননগরে যাইয়া ও তথা হইতে ফিরিয়া আসিবেন। লণ্ডন নগর ঐ নগর হইতে ৭০ ক্রোশ অন্তর। পরে এই গাদা একটা উত্তম ক্ষুদ্র ঘোড়ার ন্যায় প্রত্যেক উত্তরণস্থানে সুস্থ হইয়া লণ্ডন নগরে গিয়াছিল এবং প্রত্যাগমনকালীন কশাঘাতের অপেক্ষা না করিয়া গড়ে ছয় ক্রোশ এক ঘণ্টার মধ্যে সুখে আসিয়া পৌঁছিয়াছিল। এ গাদাটা আড়াই

হাত উচ্চ এবং ইংরাজিও স্পানিশ এই উভয়দেশীয় গর্দ্দভ হইতে উৎপন্ন হইয়াছিল।”

গাধা-সম্পর্কিত অপেক্ষাকৃত সরস কাহিনীও রামচন্দ্র মিত্র বিবৃত করিয়াছেন। সেটি এইরূপ ঃ

একাদশ উপাখ্যান

চাড্রে নগরে একটা গাদা গীত ও বাদ্য শুনিবার জন্য চটোদোর্ণাবীল স্থানে গমন করিত। ঐ স্থানের অধ্যক্ষ এক বিবি তাঁহার গলার অতি সুস্বর ছিল এবং তিনি যখন গান করিতেন তখন ঐ গাদা তাঁহার গবাক্ষ দ্বারের নিকট সর্ব্বদা যাইয়া মনোযোগ পূর্ব্বক ঐ গান শুনিত। এক দিবস নূতন স্বরে এক গান করাতে ঐ গাদা পূর্ব্বমত গান শুনিয়া আহ্লাদিত হইয়াছিল তাহা হইতে অধিক আহ্লাদিত হইয়া স্বস্থান ত্যাগ করিয়া যে কুঠরিতে বিবি বাদ্য করিতে ছিলেন সেই স্থানে অনাহূতগমন করিল এবং ঐ গীতবাদ্যাদির ত্রুটি দেখিয়া তাল পূর্ণ করিবার মানসে স্বীয় শক্ত্যনুসারে চীৎকার করিতে লাগিল।

লসনের পশ্বাবলী হইতে সিংহের কৃতজ্ঞতা পর্য্যায়ের একটি কাহিনী ঃ

“একদা আফ্রিকাদেশীয় কতকগুলি লোক মৃগয়া করিতে অরণ্যে গিয়াছিল। অকস্মাৎ দুইটি সিংহশাবক তাহাদের নিকটে আসিয়া খেলা করিতে লাগিল। ইহা দেখিয়া তাহারা মনে মনে স্থির করিল সিংহ ও সিংহীও অবশ্য এখানে আসিবে; আসিলেই তাহাদিগকে শীকার করিব। এই স্থির করিয়া বন্দুক প্রভৃতি অস্ত্র শস্ত্র প্রস্তুত করিয়া সতর্ক হইয়া থাকিল। আহারের সময়ে তাহারা ভোজন করিতে আরম্ভ করিল ও কিছু খাদ্য দ্রব্য সিংহশাবকদিগকেও দিল। শাবকেরা ভক্ষণ করিতে লাগিল। এই সময়ে সিংহ ও সিংহী হঠাৎ সেই স্থানে উপস্থিত হওয়াতে শীকারি লোকেরা অত্যন্ত ব্যস্ত সমস্ত হইল; কিন্তু ঐ সকল লোক শাবকদিগকে খাইতে দিয়াছে এবং

তাহারাও খাইতেছে দেখিয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হইল। সিংহ তৎক্ষণাৎ একটি মেষ শীকার করিয়া আনিয়া ঐ লোকদিগের চরণের নিকটে রাখিয়া দিল। সিংহ ও সিংহীর এই আশ্চর্য্য স্বভাব দেখিয়া তাহারা উহাদিগের উপর অস্ত্রাঘাত করিল না। পরে ঐ সকল লোকেরা যখন স্বকীয় আলয়ে গমন করিতে লাগিল তখন সিংহ ও সিংহীও শাবক সহিত সঙ্গে সঙ্গে চলিল। পরিশেষে তাহারা গ্রামের নিকট আসিলে সিংহরা বনে প্রত্যাগমন করিল। ঐ সকল শীকারী লোকেরা সিংহ জাতিকে এইরূপ বুদ্ধিজীবী ও কৃতজ্ঞ দেখিয়া প্রতিজ্ঞা করিল, আর আমরা কদাচ এরূপ পশুর প্রাণ বিনাশ করিব না।"

এই গল্পটি পড়িলে আমাদের এ্যাণ্ড্রক্লিস এবং সিংহের বিখ্যাত কাহিনীটি মনে পড়ে। যাহাই হউক এই পশ্বাবলীর এই সব গল্প হইতে এই মূল বক্তব্যই প্রকটিত হয় যে পশুদের মধ্যেও অনেকগুলি আশ্চর্য্য গুণের সমাবেশ রহিয়াছে এবং তাহাদের তুচ্ছ করা বা তাহাদের উপর উৎপীড়ন করা কোন মতেই উচিত নহে। গাধার সর্ব্বজনবিদিত নিবুর্দ্ধিতা যে সত্য নয় যেমন তাহা পূর্ব্বের গল্পে দেখিতে পাইতেছি তেমনি অন্য গল্পে সিংহের মধ্যে মানবিক কৃতজ্ঞতার গুণ প্রকটিত হইয়া উঠিয়াছে। এই গল্পগুলিতে একাধারে শিক্ষা ও আনন্দের সমাবেশ ঘটিয়াছে।

সদ্‌গুণ ও বীর্য্যের ইতিহাস

১৮২৯ সালে 'সদ্‌গুণ ও বীর্য্যের ইতিহাস' (Anecdotes of Vertue & Valour) নামে একখানি অতি উচ্চশ্রেণীর বালকপাঠ্য গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। ইহার প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ একই সঙ্গে মুদ্রিত হইয়াছিল। ইহার কিছু কিছু প্রসঙ্গ 'দিগ্‌দর্শন' হইতে সংকলিত। বহুজনের রচনা লইয়া এবং নিজেও সম্ভবতঃ কিছু লিখিয়া গ্রন্থন করিয়াছিলেন জে-সি মার্শম্যান।

বইখানি ছোট ছোট উপদেশাত্মক গল্পের সমষ্টি। নানা ধরণের

কাহিনী ইহাতে সংকলিত হইয়াছে। 'দিগ্‌দর্শনের' পদ্ধতিতে ইহারও বাঁ দিকে মূল-ইংরাজী, ডান দিকে বঙ্গানুবাদ।

'সদ্‌গুণ ও বীর্য্যের ইতিহাস' বইখানির ঐতিহাসিক গুরুত্ব আছে বলিয়া মনে করি। পরবর্ত্তীকালে যে সমস্ত বালকপাঠ্য গ্রন্থ এই ধারায় রচিত হইয়াছে—তাহাদের অনেকগুলিই এই বই হইতে উপকরণ আহরণ করিয়াছে—কেশবচন্দ্র কর্ম্মকারের 'বালকবোধকেতিহাস' 'বঙ্গীয় পাঠাবলী' প্রভৃতি অনেকেই ইহার নিকট ঋণী। এমন কি, ইহার কিছু কিছু গল্প প্রায় অবিকৃত ভাবেই উত্তরকালীনেরা সংকলিত করিয়াছেন।

নানাদিক হইতেই বইখানি অপূর্ব্ব। বিভিন্ন দেশায় লোক-সাহিত্য, আরব্য উপন্যাস ও ঈশপ হইতে আরম্ভ করিয়া ইতিহাস পর্য্যন্ত ইহার গল্পাবলীর পরিক্রমা। গল্পগুলি সুনির্ব্বাচিত ও মনোজ্ঞ। রবার্ট ব্রুস, ম্যারি অ্যান্তয়নেত, আলেকজাণ্ডার ও তাঁহার পিতা (সেকেন্দারের মাহাত্ম্য), অ্যান্টিগোনাস্, আকবরের সভাসদ 'বীরবর' (বীরবল) প্রভৃতি কেহই ইহাতে বাদ পড়েন নাই। যদিও নামপত্রে বলা হইয়াছে "সকল লোকের হিতার্থে বাঙ্গালা ভাষায় তর্জ্জমা করা গেল", তথাপি রুচি, রীতি ও বক্তব্যে এই অসামান্য বইখানিকে বাংলা শিশু-সাহিত্যের প্রথম পর্ব্বের একটি দীপস্তম্ভ বলিয়া চিহ্নিত করা উচিত।

রচনাগুলিতে তৎকালীন রীতি অনুযায়ী দাঁড়ি ছাড়া অন্য কোন ছেদ্ চিহ্নের ব্যবহার নাই। কিন্তু ভাষা যেমন সরল, তেমনি সুন্দর। 'প্রাতঃস্মরণীয় পঞ্চ-গোরার' অন্যতম জ্যোতিষ্ক মার্শম্যানকে এই বইখানির জন্য আমাদের সাধুবাদ জানানো উচিত। দু একটি ছোট ছোট গল্পের মূল এবং অনুবাদ উদ্ধৃত করিয়া ইহার সাফল্য পরিমাপ করা যাইতে পারে:

37. Changing One's religion

When the king of France solicited one of his

councellors to changehis religion and to enbrace the same faith with his master, promising to give him as a reward a high post in the government, he nobly replied, if I could betray my God for a place in the Government, I may betray my sovereign for a smaller thing, if I become unfaithful to God, how can I remain faithful to you ?"

৩৭ মত পরিবর্ত্তন করণ

যখন ফ্রান্স দেশের একজন রাজা আপনার প্রধান এক মন্ত্রিকে তাহার ধর্ম্ম পরিত্যাগ করণ পূর্ব্বক আপন ধর্ম্মাবলম্বন করিতে রাজ্যের মধ্যের উচ্চ পদের লোভ দর্শাওনেতে প্রবৃত্তি জন্মাইলেন তখন তিনি এই উত্তম প্রত্যুত্তর করিলেন যে যদি আমি রাজ্যের মধ্যে উচ্চ পদ প্রাপনের লোভে স্বীয় ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিতে পারি তবে যৎকিঞ্চিৎ লাভের নিমিত্তে আমি স্বীয় রাজার প্রতি বিশ্বাস-ঘাতকতা করিতে পারিব। ঈশ্বরের প্রতি অবিশ্বাসী যদি হই তবে তোমার প্রতি কিরূপে বিশ্বাসী হইব।

39. Faithfulness of a servant.

By a law of Persia, the king was allowed to go as frequently as he desired into the harem of his subjects, Shah Abbas, one of the kings of Persia, after being intoxicated at the house of one of his friends, attempted to enter the apartment of his ladies, but was stopped by the doorkeeper, who said that no one besides the master should enter there, while he was the porter. The king replied, dost thou not know me ? Yes, answered the porter, I know you are the king of man, but not of the women. Shah Abbas, pleased with the fidelity of the servant, returned to

his own palace. His friend on hearing the circumstance, inmediately repaired to the king and falling at his feet begged pardon for his domestic, whom he said he had already dismissed from his service for his stupidity. I am very glad to hear it, replied the king, for I shall now take him into my service.

পারসী দেশের এক ব্যবস্থাতে ইহা লিখিত আছে যে বাদশাহ ইচ্ছা করিলে প্রজার অন্তঃপুরে যাইতে পারেন। ঐ দেশের শাহ আবাস নামে এক রাজা আপন মিত্রের নিকেতনে মত্ত হইয়া তাহার অন্তঃপুরে যাইতে উদ্যোগ করিলেন কিন্তু দ্বারপাল তাঁহাকে এইরূপ উত্তর করিয়া স্থগিত করিল যে আমি যতকাল এই দ্বার রক্ষা করি ততকাল আমার প্রভু ভিন্ন অন্য কেহ এ অন্তঃপুরের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিবেন না। বাদশাহ কহিলেন সে কি আমাকে চিনিস্ না, ইহাতে দ্বারপাল কহিল যে আপনি নরপতি বটে কিন্তু স্ত্রী পতি নহেন বাদশাহ ভৃত্যের বিশ্বস্ততায় অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া আপন বাটীতে প্রত্যাগমন করিলেন তাঁহার মিত্র এই বিষয় অবগত হইলে তৎক্ষণাৎ বাদশাহের নিকট গিয়া তাঁহার পদতলে পড়িয়া আপন ভৃত্যের অপরাধের বিষয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া কহিলেন যে তাহার নির্বুদ্ধিতা প্রযুক্ত তাহাকে চাকরী হইতে দূর করিয়া দিয়াছি। বাদশাহ উত্তর করিলেন যে ইহা শ্রবণে অতি সন্তুষ্ট হইলাম যেহেতুক আমি তাহাকে এইক্ষণে আপনার চাকরের মধ্যে রাখিব।

জ্ঞানোদয়ঃ পশ্বাবলি প্রকাশের দুই বৎসর পূর্ব্বেই কৃষ্ণধন মিত্র ও রামচন্দ্র মিত্র 'জ্ঞানোদয়' (১৮৩১) নামে আর একটি তরুণপাঠ্য পত্রিকা প্রকাশ করিয়াছিলেন। দেশীয়দিগের দ্বারা প্রকাশিত ইহাই সর্ব্বপ্রথম পত্রিকা। এই পত্রিকা ছিল একান্তভাবেই নীতি শিক্ষা-মূলক এবং স্কুল বুক সোসাইটি পশ্বাবলির ন্যায় এটিকেও কিছু কিছু ক্রয় করিয়া স্কুল সোসাইটির মাধ্যমে বিতরণ করিয়াছিলেন। ইহার

প্রকাশ সম্পর্কে 'সমাচার দর্পণ' ১৮৩১ সালের ৩১শে ডিসেম্বর জানাইতেছেন :

"নূতন গ্রন্থোদয়। আমরা শুনিতেছি যে শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণধন মিত্র মহাশয় জ্ঞানোদয় সংজ্ঞয় এক অভিনব মাসিক গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন ইহাতে অত্যন্তাহ্লাদিত হইলাম।"…১

আবার ১৮৩২ সালের ১০ই মার্চ্চের সংবাদ :

"শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র মিত্র ও শ্রীযুক্ত কৃষ্ণধন মিত্র জ্ঞানোদয় নামক বাঙ্গালি মাগাজিন প্রথম সংখ্যক প্রাপ্ত হওয়া যায় কিন্তু কেবল তাহার নির্ঘণ্ট পাঠ করিতে প্রাপ্তাবকাশ হওয়া গেল। তাহাতে বোধ হয় সে গ্রন্থ অত্যুপকারক বটে এবং ঐ মহাশয়েরদের এ অতি প্রশংসনীয় কর্ম্ম অতএব তাহার অনেক গ্রাহক হইয়াছে তদ্দৃষ্টে অত্যন্তাহ্লাদ"—২

নীতিশিক্ষার দ্বারা অনুপ্রাণিত এই পত্রিকাটি যে জনপ্রিয় হইয়াছিল তাহা উদ্ধৃত সংবাদ হইতেই প্রকাশ। ইহাতে উপদেশাত্মক, ঐতিহাসিক এবং ভৌগোলিক বৃত্তান্ত ও কাহিনী থাকিত।

জ্ঞানোদয়ের মর্ম্মকথা ইহার প্রথম পাঠ হইতেই পাওয়া যাইবে :

"যৌবনাবস্থাতে সত্ বিদ্যোপার্জ্জন করা অত্যুচিত। পরোপকার করিবার চেষ্টা সর্ব্বতোভাবে করা মনুষ্যের অত্যাবশ্যক।

যুবাব্যক্তির প্রধান অলঙ্কার লজ্জা হইয়াছেন।

কোন বিষয় অঙ্গীকার করিবার পূর্ব্বক্ষণেই বিবেচনা করা অতি কর্ত্তব্য।

নিরাকাঙ্ক্ষি মন হয়েন এক অমূল্য মহারত্ন।

অলস দুঃখের ও পাপের ঈ কর্ম্মের মূলাধার।

যাঁহারা সর্ব্বদা অনৃত কহেন তাহারদিগের প্রতি কদাচ বিশ্বাস থাকে না।

১। সংবাদপত্রে সেকালের কথা, ২য় খণ্ড পৃ ১২৭

২। ঐ

জ্ঞানীব্যক্তি পরদোষ দর্শন করিয়া আপন দোষকে শোধিত করেন—ইত্যাদি।”

পত্রিকাটিতে শিক্ষক মনোভাবই প্রাধান্য লাভ করিয়াছে এবং বিষয়বস্তুতে ইহা মোটের উপর দিগদর্শনেরই অনুবর্ত্তী হইয়াছে। তবে ভাষা অত্যন্ত শ্রীহীন—ইংরাজীর পঙ্গু অনুবাদ মনে হয়। “প্রধান অলঙ্কার লজ্জা হইয়াছেন”—ইহা বাংলাই নয়। “নিরকাঙ্ক্ষ মন হয়েন এক অমূল্য মহারত্ন”—মিশনারীদের প্রথম বাংলা বাইবেলের উৎকট ভাষা-ভঙ্গিকেই মনে করাইয়া দেয়।

জ্ঞান চন্দ্রিকা : ১৮৩৮ সালে প্রথম মুদ্রণ, ১৮৪৪ এ দ্বিতীয় এবং ১৮৫২ সালে মার্জ্জিত তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। “বহুবিধ উত্তম উত্তম ইংরাজী ও বাংলা পুস্তক হইতে নানাবিধ নীতি সংগ্রহ” “উত্তম গৌড়ীয় সাধু ভাষায়” সংকলন করিয়াছিলেন গোপাললাল মিত্র।

অনুষ্ঠান-পত্রটি কঠিন-গম্ভীর, রচনা আড়ষ্ট। ‘সদ্‌গুণ ও বীর্য্যের ইতিহাসে’ মিশনারীরা যে পরিচ্ছন্ন বাংলা গদ্য লিখিয়াছেন, বাঙালী গোপাললাল তাহা পারেন নাই। মন্থর ও লালিত্যহীন ভাষা।

‘জ্ঞান চন্দ্রিকা’য় সাধারণ শিক্ষামূলক গল্প, হিতোপদেশ, রামায়ণ, মহাভারত ও নানাবিধ পুরাণ হইতে উপদেশাত্মক কাহিনী সন্নিবিষ্ট করা হইয়াছে। সবগুলি গল্প হইয়াও ওঠে নাই, নীতিপ্রধান বিবরণেই পর্য্যবসিত। যুগরুচি অনুযায়ী নরনারীর ঘনিষ্ঠ সম্পর্কমূলক কিছু কিছু বিষয় আছে—সংস্কৃত-সাহিত্যের প্রভাবই তাহার কারণ।

সুদীর্ঘ গ্রন্থটিতে মোট ৬৩টি প্রসঙ্গ রহিয়াছে। বিদ্যাবিষয়ক, বিদ্বানের প্রশংসা, মেধাযুক্ত মনুষ্যের কথন ইত্যাদি হইতে অভ্যাস বিষয়ক, সাক্ষাৎকরণ, ঐক্য বিষয়ক প্রভৃতির আলোচনায় আত্মশিক্ষা এবং সমাজব্যবহারের উপদেশ দেওয়া হইয়াছে।

জনপ্রিয়তা যে ঘটে নাই, চব্বিশ বৎসরে তিনটি মুদ্রণই তাহার প্রমাণ। রচনারীতির নিদর্শন :

"মূর্খজনের ব্যবস্থার বৈপরীত্য অতএব তাহার বিবেচনায় কর্ম্মাচরণে বিপরীতাচরণ হয়। হরিহর নামে এক সদ্বৈদ্য তিনি এক দিবস এক মূর্খের পুত্রের পীড়োপলক্ষে তদ্‌গৃহে গমন পূর্ব্বক রোগি দর্শন করিয়া ব্যবস্থা করিলেন যে শুঠী গোক্ষুরির পাচন দ্বারা রোগ শান্তি হইবে ইহা বলিয়া গৃহে গমন করিলেন ঐ রোগির পিতা মূর্খতার হেতু গোর খুর ছেদন করিয়া পাচন প্রদান করিলে ঐ বালকের অত্যন্ত রোগ প্রবৃদ্ধ হইলে তৎপিতা সদ্বৈদ্য হরিহর সমীপে নিবেদন করিল যে আমার পুত্রের পীড়া প্রবৃদ্ধ হইয়াছে।"

('মূর্খের বিপরীতাচরণ ইহার উদাহরণ')

জ্ঞানার্ণবঃ, প্রেমচাঁদ রায়—১৮৪২

মিশনারী ও বিদেশীয়দের প্রভাবে একদিকে যেমন শিক্ষামূলক বাল্যপাঠ্য সাহিত্য রচিত হইতেছিল, তেমনি চতুষ্পাঠী প্রভৃতির সংস্কৃত-ভাষাসেবী অধ্যাপকেরাও সম্ভবতঃ এই কাজে অনুপ্রেরণা লাভ করিতেছিলেন। ইংরাজি-প্রভাবিতেরা প্রধানতঃ বিদেশী-সাহিত্য হইতে ঋণ লইতে ছিলেন, পণ্ডিতেরা তাহার পরিবর্ত্তে মুখ্যতঃ সংস্কৃত হইতে উপকরণ আহরণ করিতেছিলেন।

পণ্ডিতী শিশু-সাহিত্যের নমুনা 'জ্ঞানচন্দ্রিকা', ইহারই আর একটি প্রেমচাঁদ রায় কৃত 'জ্ঞানার্ণবঃ'। ইহার অনুষ্ঠানপত্র হইতেই লেখকের মনোভঙ্গির পরিচয় মিলিবে: "বিঘ্নরাজি পরিহার জন্য গুণাতীত আদ্যন্ত রহিত পরম পরাৎপর পরমেশ্বর স্মরণপুরঃসর জ্ঞানাভিলাষি যশোরাশি স্বজন ও সজ্জনসমূহের সন্নিধানে স্তুতিসম্বোধনে অকিঞ্চনের নিবেদন যৎকালে হিন্দু ভূপালেরা এতদ্রাজ্যে সাম্রাজ্য করিতেন তৎকালে তাঁহারা সংস্কৃত ভাষার সম্ভাষ পূর্ব্বক নীতিধর্ম্মাদিবিষয়ক বহুবিধ গ্রন্থ প্রস্তুত করিয়াছিলেন কিন্তু বঙ্গভাষায় ভাষিত উক্তপুস্তকাভাব প্রযুক্ত তদাস্বাদনে বালক বা লোকগণের চিত্ত নিয়তই বিরক্ত ছিল"—

ছেদচিহ্নবিহীন এই উৎকট পাণ্ডিতী গ্রন্থটির রচনাপ্রসঙ্গে

লেখক জানাইয়াছেন যে যবন রাজত্বকালে বাংলা ভাষা হতশ্রী হইয়াছিল, কিন্তু "দেশোপকারক গুণগ্রাহক ইংলণ্ডীয় মহীপাল গৌড়ীয় সাধুভাষার গৌরব জ্ঞানে তদনুশালনে এতদ্দেশীয় বালকগণের প্রতি বহু শ্রম ধন ব্যয় করিতেছেন" বলিয়া নীতিশিক্ষার জন্য এটি তিনি রচনা করিয়াছেন।

ভূমিকা হইতে মনে হয় বইখানি পূর্ব্বে আরো সংস্কৃতবহুল রূপে প্রকাশিত হইয়াছিল, কিন্তু পরে সুকুমারমতিদের সুবিধার্থে লেখক ইহাকে সরল করিয়া 'পুনর্মুদ্রাঙ্কিত' করিয়াছেন।

কিন্তু সরল করিতে গিয়াও ইহাতে চতুষ্পাঠীর বিভীষিকা দূর হয় নাই--উদ্ধৃত ভূমিকা হইতেই তাহার প্রমাণ মিলিবে। ছেদ চিহ্নের ব্যবহার অল্প, কোনো নিয়ম মানিয়া চলা হইয়াছে মনে হয় না, রচনা প্রাণহীন।

'ত্রিবিধ মনুষ্য', 'অবস্থাত্রয়', 'বাল্যাবস্থার নিয়ম', 'মাতৃপিতৃ প্রতি ভক্তি কর্ত্তব্য' হইতে আরম্ভ করিয়া 'নম্রতা', 'দয়া', 'নির্দ্দয়তা', 'দান' ইত্যাদি বিষয়ক মোট ৩৪টি প্রকরণ আছে। প্রতিটি প্রকরণে প্রথমে উপদেশ, পরে কাহিনী। গল্পসহযোগে শিক্ষাদান লেখকের লক্ষ্য ; রামায়ণ, মহাভারত, পঞ্চ-তন্ত্র, লোক-কথা প্রভৃতি হইতে তিনি উদাহরণ লইয়াছেন।

কিন্তু ভাষার দোষে পড়িতে কষ্ট হয়। গল্পগুলিও সর্ব্বত্র গল্প হয় নাই, প্রায়ই বিবৃতিমাত্রে পর্য্যবসিত হইয়াছে। উপমা, উদাহরণ ইত্যাদিতেও সর্ব্বদা শিশু বা বালকের উপযোগিতা রক্ষিত হইয়াছে বলা যায় না। তবু ইহা তৎকালীন বিদ্যালয়ের পাঠ্যতালিকায় স্থান পাইয়াছিল। ইংলণ্ডীয় গুণগ্রাহী মহোদয়দের স্তুতি-বর্ণনা ব্যর্থ হয় নাই। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় হুগলী কলেজে জুনিয়ার ডিভিশনে পড়িবার সময় তাঁহার বাংলা পাঠ্যতালিকায় এই 'জ্ঞানার্ণবঃ' গ্রন্থটি History of Bengal (বঙ্গের ইতিহাস)-এর সঙ্গে ছিল। ১

১। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সাঃ সাঃ চরিতমালা, পৃ. ১০।

সামান্য নমুনা দেওয়া যাইতে পারে :

"ঐ প্রাণেশ্বরের সর্ব্বদা পরের পীড়া প্রদানে ও অনিষ্ট করণে মতি ও অন্যান্য কুকর্ম্মাচরণে রতি জন্মিল তাহাতে তাহাকে সকলে ভর্ৎসনা করিত তথাপি প্রাণেশ্বর নিবৃত্ত না হইয়া অত্যন্ত অনিষ্ট করিতে লাগিল তন্নিমিত্ত তাহার পিতা বিশ্বমান্য হইলেও কেহ কেহ প্রাণেশ্বরকে আঘাত করিতে ত্রুটি করিত না তথাচ ঐ বিপ্রতনয় কুৎসিত বিষয়ে মতিত্যাগ করিতে পারিল না পরে প্রাণেশ্বরের চৌর্য্যাদি দোষ ঘটিয়া কারাগারে বাস করিতে হইল।"

পক্ষির বিবরণ

১৮৪৪ সালে রামচন্দ্র মিত্র "পশ্বাবলীর" প্রেরণায় 'পক্ষির বিবরণ' "Ornithology No 1" বাহির করেন। বিভিন্ন জাতীয় পক্ষী সম্বন্ধে বালক-বালিকাদের জ্ঞানদানই ইহার উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু একটি মাত্র সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াই এটি বন্ধ হইয়া যায়।[১]

শিশুশিক্ষা: ১ম ও ২য় ভাগ ১৮৪৯, ৩য় ভাগ ১৮৫০। মদনমোহন তর্কালঙ্কার। একান্তভাবেই শিক্ষার্থে রচিত হইলেও বই তিন খানিতে মদনমোহনের যে নৈপুণ্য প্রকটিত হইয়াছিল, তাহাতে বিদ্যাসাগরের 'বর্ণপরিচয়ের' পাশাপাশি ইহারা সুদীর্ঘকাল ধরিয়া শিশুদের প্রথম পাঠ্য গ্রন্থের মর্য্যাদা লাভ করিয়াছে। প্রথম ভাগ 'শিশু শিক্ষা'র অমর কবিতা "পাখী সব করে রব রাতি পোহাইল, কাননে কুসুম কলি সকলি ফুটিল"-র জন্যই মদনমোহন শিশু-রাজ্যে অবিস্মরণীয় হইয়া থাকিবেন। ইংরাজীতে "Twinkle, twinkle little star" লিখিয়া যিনি চিরন্তন হইয়াছেন, মদনমোহনের কৃতিত্ব তাঁহারই সমপর্য্যায়ী।

বালকবোধকেতিহাস (Fable For Students)

সংকলক কেশবচন্দ্র কর্ম্মকার (Casub Chandra Kurmocar),

১। বাংলা সাময়িকপত্র—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রথম খণ্ড, ৮৬ পৃষ্ঠা

১৮৫০। 'সংকলক' দেখিয়াই বোঝা যায়—কেশবচন্দ্র ইহার রচয়িতা নহেন,—গ্রন্থনকারী মাত্র। ১৭টি নীতি গল্প ইহাতে স্থান পাইয়াছে এবং ইহার প্রধান উৎসমুখ "সদ্‌গুণ ও বীর্য্যের ইতিহাস"। ভাষা 'সদ্‌গুণ ও বীর্য্যের ইতিহাসে'রই সামান্য অদলবদল মাত্র। প্রতি গল্পের প্রথমে দুই লাইন হিসাবে নীতি-কবিতা—গল্পের মর্ম্মকথা। শেষে ছাপা, 'Finis'।

দুই একটি নীতি শ্লোক-এই রকম :--

(ক) বাল্যকালে বিদ্যাশিক্ষায় আলস্য করিয়া
শেষে চেষ্টা আপনারে অসার ভাবিয়া। (২)

(খ) উদ্যোগী হইয়া কর্ম্মে না হয় ভাবিত।
তুচ্ছ হয়ে অতঃপর হিতে বিপরীত। (৮)

(গ) মিথ্যা কথা সর্ব্বদা যে করে ব্যবহার
সত্য কহিলেও নাহি নিস্তার তাহার। (৯)

কবিতাগুলি সম্ভবতঃ কেশবচন্দ্রের মৌলিক রচনা। ইহার দশম ইতিহাস এই—

"দুষ্কর্ম্ম করিয়া যদি সত্য কথা কহে
শাস্ত্রমতে তার দণ্ড অতিশয় নহে।

কোন এক রাজার মন্ত্রী কএকজন ডাকাইতদিগকে মুক্ত করণের অনুমতি পাইয়া কারাগারে যাইয়া তাহারা যে স্থানে কএদ ছিল সেই স্থানে পৌঁছাইলেন। পরে মন্ত্রিকে দেখিয়া সকলেই দণ্ডায়মান হইয়া আপন ২ মুক্তির প্রার্থনা করিতে লাগিল। তাহাতে মন্ত্রী কএক ব্যক্তিকে তাহারদের অপরাধের বিষয় জিজ্ঞাসা করিবাতে প্রত্যেকজন নানাচ্ছলেতে আপনাকে নির্দ্দোষী করিতে লাগিল। একজন কহিল যে সে অন্যের ঈর্ষ্যাতে বদ্ধ হইয়াছে, অন্য কহিল যে সহর কোটালের ঘুষ খাওয়াতে কএদ হইয়াছে, এইরূপ সকলেই কহিল আমরা অন্যায় অবরুদ্ধ আছি। তাহারদের মধ্যে খর্ব্বাকৃতি কৃষ্ণবর্ণ এক ব্যক্তিকে মন্ত্রী জিজ্ঞাসা মরিলেন (করিলেন ?) যে তুই কি অপরাধে এখানে

আছিস্? সে কাহল যে মহাশয় আমি অতি যথার্থতা পূর্ব্বক কএদ আছি, ইহা আমাকে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবেক। আমার টাকার অভাব প্রযুক্ত এক সওদাগরের বাটিতে টাকাপূর্ণ বেটুয়া পাইয়া আপন প্রাণ রক্ষার্থে আমি চুরি করিয়াছিলাম। রাজার প্রতিনিধি এই কথা শুনিয়া তাহার স্কন্ধের উপর লাঠির দ্বারা দুই তিন আঘাত করিয়া কহিলেন, যে ওরে চোর, এই সকল সত্য নির্দ্দোষী ব্যক্তির মধ্যে তোর কি কর্ম্ম? এইক্ষণে ইহাদের সমাজ ছাড়িয়া যা, ইহা কহিয়া সেই ডাকাইতকে বন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া দিলেন। অন্য সকল ডাকাইতি মিথ্যা কহাতে জাবজ্জীবন কএদ রহিল।”

গল্পগুলিতে বৈচিত্র্য আছে। ‘বালকবোধকেতিহাস’ পাঠ্যগ্রন্থ ছিল।

তৃতীয় অধ্যায়

বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার ও রাজকৃষ্ণ

॥ ১ ॥

বিদ্যাসাগরের জীবনী রচয়িতা চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার গ্রন্থটির একস্থলে রজনীকান্ত গুপ্তের রচনা হইতে উদ্ধৃতি দিয়াছেন :

"বিদ্যাসাগর আর কোনও কার্য্যে হস্তক্ষেপ না করিলেও তাঁহার অমৃতময়ী লেখনী বিনিঃসৃত গ্রন্থাবলীর গুণে তিনি চিরকাল বাংলা সাহিত্য সংসারে স্মরণীয় হইয়া থাকিবেন। তিনি বাংলা সাহিত্যের পিতা না হইলেও স্নেহময়ী মাতার ন্যায় উহার পুষ্টিকর্ত্তা ও সৌন্দর্য্য বিধাতা, তাঁহার যত্নে গদ্য সাহিত্যের উন্নতি, পরিপুষ্টি ও সৌন্দর্য্য সাধিত হয়, দশভুজা দুর্গা প্রতিমার খড়, বাঁশ ও দড়ির উপর সামান্য মাটির কাজ হইয়াছিল, তিনি ঐ মাটি যথাস্থানে বিন্যস্ত করেন এবং মৃত্তিকাময়ী মূর্ত্তি নানা বর্ণে সুরঞ্জিত ও বিচিত্র বেশে সজ্জিত করিয়া দেবমণ্ডপ শ্রীসম্পন্ন করিয়া তুলেন।" ১

বাংলা গদ্যের এবং বাংলা সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধনে বিদ্যাসাগরের যে মহিমোজ্জ্বল ভূমিকা তাহা স্মরণ করিয়া প্রত্যেকেই উদ্ধৃত উক্তিটির সানন্দ অনুমোদন করিবেন। বাঙালীর আধুনিক ইতিহাসের অন্যতম প্রধান প্রাণপুরুষ বিদ্যাসাগর তাঁহার সাহিত্য-সাধনায়, শিক্ষা-বিস্তারে, কর্ম্মসংগ্রামে এবং বিশাল হৃদয়বত্তার গৌরবে সমুদ্রের মতোই বিপুল : "'বিক্ষোরিবাস্যানবধারণীয়ামিদৃক্তয়ারূপমিয়ত্তয়া বা।"

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রতিমাকে তিনি বর্ণে ও বেশে দশভুজা রূপে সাজাইয়া তুলিয়াছেন—ইহা বিদ্যাসাগরের বিস্তৃতির দিক ; আর যেখানে তিনি—"স্নেহময়ী মাতার ন্যায় পুষ্টিকর্ত্তা এবং সৌন্দর্য্য-

২। বিদ্যাসাগর—চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, —১৮৭ পৃঃ

বিধাতা"—সেখানে তাঁহার গভীরতার পরিচয়। মনে হয় করুণার্দ্র বিদ্যাসাগরের মাতৃমমতার অনুভূতি যেমন একদিকে "বিধবা-বিবাহ" প্রবর্ত্তন এবং "বহুবিবাহ নিরোধে" তাঁহাকে অনুপ্রাণিত করিয়াছে, অনুরূপ ভাবে সাহিত্য-সৃষ্টিতেও তাঁহাকে প্রেরণা দিয়াছে। নারীর প্রতি মমতার বশবর্ত্তী হইয়াই তাঁহার শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকীর্ত্তি "শকুন্তলা' এবং "সীতার বনবাস"রচিত হইয়াছে। সংস্কৃত-সাহিত্যে বিষয়ের অভাব ছিল না, কিন্তু তাহার মধ্য হইতে এই দুইটি দুর্ভাগিনী রমণীর বেদনার কাহিনীই তিনি বিশেষ রূপে নির্ব্বাচন করিয়া লইলেন কেন —বিদ্যাসাগরের জীবন-সাধনার ভিতরেই সম্ভবতঃ সেই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাইবে।

এই মাতৃহৃদয় স্বাভাবিক ভাবেই শিশুর প্রতি স্নেহে ও করুণায় উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে। যাহাকে ঠিক শিশু-সাহিত্য বলে, বিদ্যাসাগর তাহা রচনা করেন নাই। কিন্তু বাংলা গদ্য ভাষার মতোই শিশু-সাহিত্যের ভাষা এবং পদ্ধতিরও অশেষ কল্যাণ সাধন তিনি করিয়াছেন। শিশুশিক্ষার দিকে দৃষ্টি রাখিয়াই তিনি গ্রন্থ লিখিয়াছেন, কিন্তু ভুবন নামে যে দুরন্ত বালক মাসীর অন্যায় প্রশ্রয়ে দিনের পর দিন কুপথে অগ্রসর হইয়া পরিশেষে ফাঁসীর পূর্ব্বে মাসীর কান কাটিয়া লইয়াছিল, তাহার বিবরণে উপদেশ প্রসঙ্গ ছাড়াইয়াও সাহিত্যরস উচ্ছলিত হইয়াছে।

বিদ্যাসাগর জ্ঞান-কর্ম্ম-দেশপ্রেম-দয়া এবং নির্ভীক মনুষ্যত্বের অনির্ব্বাণ পঞ্চশিখা-প্রদীপের মতোই জাতির জীবন-মন্দিরে জ্বলিতেছেন। তাঁহার জ্যোতিঃতে শিশু-সাহিত্যের ক্ষুদ্র উপান্তটিও সমুদ্ভাসিত হইয়াছে।

শিক্ষার মুখ চাহিয়াই বিদ্যাসাগর "কলেজ অফ্ ফোর্ট উইলিয়াম নামক বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত মেজর জি, টি মার্শাল মহোদয়ের আদেশে প্রসিদ্ধ হিন্দী পুস্তক অনুসারে" বেতাল পঞ্চবিংশতি (১৮৪৭) রচনা করেন। বইটি যুবাপাঠ্য। কিন্তু তাঁহার শিশুদের জন্য রচনা

আরম্ভ হয় ১৮৫১ সালে প্রকাশিত 'বোধোদয়' হইতে। বিদ্যাসাগর মোটামুটি এই সমস্ত শিশুপাঠ্য গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন :

(১) বোধোদয়—১৮৫১
(২) ঋজু পাঠ—(তিন খণ্ড—১৮৫১-৫২-৫৩)
(৩) বর্ণপরিচয়—দুই খণ্ড—১৮৫৫
(৪) কথামালা—১৮৫৬
(৫) চরিতাবলী—১৮৫৬
(৬) আখ্যানমঞ্জরী—(১৮৬৩)

ইহাদের মধ্যে 'কথামালা' এবং 'আখ্যানমঞ্জরী'ই বিদ্যালয়গত পাঠ্যতার সীমা অতিক্রম করিয়া সাহিত্যর মধ্যে পদক্ষেপ করিয়াছে। কথামালা ঈশপের গল্প হইতে অনুদিত। আধুনিক বাংলা গদ্যের স্রষ্টা বিদ্যা-সাগরের হাতে গল্পগুলি সরস ও সুদৃঢ় বিন্যাসলাভ করিয়া আদর্শ শিশুপাঠ্য ভাষায় রূপান্তরিত হইয়াছে। এই সর্ব্বজনপরিচিত গ্রন্থটির বিস্তৃত পরিচয় অনাবশ্যক। আমরা মাত্র নমুনা হিসাবে সামান্য উদ্ধৃত করি :

রোগী ও চিকিৎসক

কোন চিকিৎসক কিছুদিন এক রোগীর চিকিৎসা করিয়াছিলেন। ঐ চিকিৎসকের হস্তেই সেই রোগীর মৃত্যু হয়। তাহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সময়, চিকিৎসক তাহার আত্মীয়গণের নিকট উপস্থিত হইয়া আক্ষেপ করিয়া বলিলেন, "আহা! যদি এই ব্যক্তি আহারাদির নিয়ম করিয়া চলিতেন, সর্ব্বদা সকল বিষয়ে অত্যাচার না করিতেন, তাহা হইলে ইঁহার অকালে মৃত্যু হইত না।" তখন মৃত ব্যক্তির এক আত্মীয় বলিলেন, "কবিরাজ মহাশয়! আপনি যাহা আজ্ঞা করিতেছেন, তাহা যথার্থ বটে, কিন্তু এক্ষণে আপনার উপদেশের কোনও ফল দেখিতেছি না। যখন এ ব্যক্তি জীবিত ছিল এবং আপনার উপদেশ অনুসারে চলিতে পারিত, তখন ইহাকে এই উপদেশ দেওয়া চলিত।"

সময় বহিয়া গেলে উপদেশ দেওয়া বৃথা।

আখ্যানমঞ্জরী কতগুলি নীতিমূলক অনুবাদ কাহিনীর সমষ্টি ইহা প্রথমে এক খণ্ডে রচিত হইয়াছিল, পরে দুইভাগে বিভক্ত করিয়া দেওয়া হয়। প্রথম খণ্ডটি অপেক্ষাকৃত সরল ও সহজ আখ্যানের সমষ্টি; ইহা অল্পবয়স্কদের জন্য। দ্বিতীয়টিকে অপেক্ষাকৃত প্রাপ্ত-বয়স্কদের জন্য স্বতন্ত্র করিয়া দেওয়া হইয়াছিল।

"কতিপয় ইংরাজী পুস্তক অবলম্বন পূর্ব্বক" রচিত গ্রন্থটির উদ্দেশ্য ছিল "বালকদিগের ভাষাজ্ঞান এবং নীতিজ্ঞান বিষয়ে কিঞ্চিৎ"-শিক্ষা দান করা। ইহার রচনাতে ও বিদ্যাসাগরী রীতির মধুর-গম্ভীর ছন্দঃ-স্পন্দিত ভাষার ঐশ্বর্য্য অব্যাহত রহিয়াছে। "অদ্ভুত আতিথেয়তা" (দ্বিতীয় ভাগ) হইতে কিছু উদাহরণ লওয়া যাইতে পারে :

"আরব সেনাপতি দর্শনমাত্র, সাদর সম্ভাষণ করিয়া মুর সেনাপতিকে অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করাইলেন, এবং কহিলেন, আপনি সত্বর প্রস্থান করুন; এই বিপক্ষ শিবিরমধ্যে আমা অপেক্ষা আপনার ঘোরতর বিপক্ষ আর নাই। গত রজনীতে, যৎকালে, আমরা উভয়ে, একাসনে আসীন হইয়া অশেষবিধ কথোপকথন করিতেছিলাম, আপনি, স্বীয় ও স্বীয় পূর্ব্বপুরুষদিগের বৃত্তান্ত বর্ণন করিতে করিতে আমার পিতার প্রাণহন্তার নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। আমি শ্রবণমাত্র, বৈরসাধন বাসনার বশবর্ত্তী হইয়া, বারংবার এই শপথ ও প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, সূর্য্যোদয় হইলেই প্রাণপণে পিতৃহন্তার প্রাণবধসাধনে প্রবৃত্ত হইব। এখন পর্য্যন্ত সূর্য্যের উদয় হয় নাই; কিন্তু উদয়েরও অধিক বিলম্ব নাই; আপনি সত্বর প্রস্থান করুন। আমাদের জাতীয় ধর্ম্ম এই প্রাণান্ত ও সর্ব্বস্বান্ত হইলেও, অতিথির অনিষ্ট চিন্তা করি না; কিন্তু, আমার পটমণ্ডপ হইতে বহির্গত হইলেই, আপনকার অতিথিভাব অপগত হইবেক; এবং সেই মুহূর্ত্ত অবধি, আপনি স্থির জানিবেন, আমি আপনকার প্রাণসংহারের নিমিত্ত প্রাণপণে যত্ন ও অশেষ প্রকারে চেষ্টা পাইব। এই যে অপর অশ্ব সজ্জিত হইয়া দণ্ডায়মান আছে দেখিতেছেন, সূর্য্যোদয় হইবামাত্র, আমি উহাতে আরোহণ

করিয়া, বিপক্ষভাবে আপনকার অনুসরণে প্রবৃত্ত হইব। কিন্তু, আমি আপনাকে যে অশ্ব দিয়াছি, উহা আমার অশ্ব অপেক্ষা কোন অংশেই হীন নহে; যদি উহা দ্রুতবেগে গমন করিতে পারে, তাহা হইলে আমাদের উভয়ের প্রাণরক্ষার সম্ভাবনা।"

'চরিতাবলী'তে "সংক্ষেপে ও সরলভাষায় কতকগুলি মহানুভবের বৃত্তান্ত" সংকলন করিয়াছিলেন বিদ্যাসাগর। কিন্তু ইহারা নীরস বিবরণমাত্র নহে।

"যে সকল অংশ পাঠ করিলে বালকদিগের লেখাপড়ার অনুরাগ জন্মিতে ও উৎসাহবৃদ্ধি হইতে পারে এই পুস্তকে সেই সেই অংশমাত্র সঙ্কলিত হইয়াছে।"

'চরিতাবলী'ও বিদ্যাসাগরের স্বভাবসিদ্ধ দীপ্তিতে উজ্জ্বল। 'ডাক্তার এডামে'র জীবন কাহিনী এইভাবে বর্ণিত হইয়াছে:

"স্কট্‌লণ্ডে শীতের অতিশয় প্রাদুর্ভাব; সুতরাং রাত্রিতে পাথরিয়া কয়লার আগুন জ্বালিয়া সেই উত্তাপে শীত নিবারণ করিতে হয়। এডামের কয়লা কিনিবার সঙ্গতি ছিল না। অত্যন্ত শীতবোধ হইলে, তিনি কিয়ৎক্ষণ বেগে দৌড়িয়া বেড়াইতেন। তাহাতে শরীর গরম হইয়া আপাততঃ শীত নিবারণ হইত। এত কষ্ট পাইয়াও তিনি ক্ষণকালের নিমিত্ত লেখাপড়ায় যত্ন করিতে ক্রুটি করেন নাই; এবং সেই যত্নের গুণে, নানা বিদ্যায় পারদর্শী ও পরিশেষে এডিনবরার প্রধান বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ হইয়াছিলেন।" (পৃঃ ১১৪)

বিদ্যাসাগর শিশু এবং তরুণদের জন্য লিখিয়াছিলেন, কিন্তু শিশু-সাহিত্যরূপে বিশেষভাবে কিছু লিখিয়া যান নাই। সেকালে সে প্রশ্ন উঠিতেও পারে না। কিন্তু বিদ্যাসাগরের আশ্চর্য্য রচনার গুণে এবং তাঁহার মমতাস্নিগ্ধ হৃদয়ের স্পর্শে এই নীতিমূলক আখ্যানগুলিও সুখপাঠ্যতায় শিশু-সাহিত্যের পথ সুগম করিয়াছে। যুগাধিনায়ক বিদ্যাসাগরের সর্ব্বব্যাপী প্রতিভার একটি রশ্মি এক্ষেত্রেও আমরা উজ্জ্বল দেখিতে পাই।

॥ ২ ॥

অক্ষয়কুমার দত্ত

বাংলা সাহিত্যে অন্যতম অবিস্মরণীয় ব্যক্তিত্ব অক্ষয়কুমার দত্ত বিদ্যাসাগরের সহিত একই বৎসরে জন্মগ্রহণ করেন এবং বিদ্যাসাগরের পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে লোকান্তরিত হন। বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক অক্ষয়কুমার স্বাভাবিকভাবেই গম্ভীরবেদী লেখক ছিলেন। তাঁহার জ্ঞানগর্ভ গ্রন্থাবলীর মধ্যে একমাত্র তিনখণ্ড "চারুপাঠ"ই (১৮৫৩, ১৮৫৪ ও ১৮৫৯) বালক-বালিকাদের উপযোগী করিয়া শিক্ষার্থে রচিত হইয়াছিল। "চারুপাঠ" শিক্ষাদানের প্রয়োজনে লিখিত হইলেও ইহাতে সাহিত্যের স্পর্শ আছে এবং তরুণমনের কৌতূহল উদ্দীপনকারী বিচিত্র বিষয়াবলী তাঁহার গ্রন্থমধ্যে পরিবেষিত হইয়াছে। তাঁহার তিন খণ্ড "চারুপাঠ"কে অল্পবয়স্কদের উপযোগী Popular Science এর সুন্দর সংকলন বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে।

উদাহরণস্বরূপ 'চারুপাঠ' দ্বিতীয় ভাগ হইতে একটি প্রসঙ্গ উদ্ধৃত করা যাক :

বর্ষণবৃক্ষ

চারুপাঠের প্রথম ভাগে পান্থপাদপের প্রসঙ্গ পাঠ করিয়া পুলকিত হইয়াছ, তাহার সন্দেহ নাই। এখন তদপেক্ষা একটি অদ্ভুততর বৃক্ষের বিষয় বলিতেছি শ্রবণ কর। দক্ষিণ আমেরিকার মধ্যে পেরু দেশের অন্তর্গত ময়োবম্বা নগরের নিকট একরূপ বৃহৎ বৃক্ষ জন্মে; তাহার নাম বর্ষণবৃক্ষ বা বর্ষণ-তরু। সেই বৃক্ষ চতুর্দিকস্থ বায়ু হইতে জলীয় বাষ্পাদি গ্রহণ করিয়া, আত্মসাৎ করে এবং সেই সমুদায় প্রকৃত জলে পরিণত করিয়া সময়ানুসারে বর্ষণ করিতে থাকে। বিশেষতঃ যে সময়ে গ্রীষ্ম-প্রভাবে নদীর জল শুষ্ক ও

অত্যন্ত হ্রাস প্রাপ্ত হয়, সেই সময়েই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে বর্ষণ করিতে থাকে। এত প্রচুর বারি বর্ষণ হয় যে, সেই বৃক্ষের নিকটস্থ ভূমিখণ্ড জলসিক্ত হইয়া, জল-ভূমি সদৃশ হইয়া পড়ে। বৃক্ষটির আকারও সামান্য নয়। উহা ৫০ ফুট এবং নিম্নদিকে উহার স্কন্ধের ব্যাস প্রায় ৩ তিন ফুট উচ্চ এবং পরিধি অর্থাৎ বেড় ন্যূনাধিক ৯ নয় ফুট। যে সকল প্রদেশে জলকষ্ট হইয়া কৃষিকার্য্যের ব্যতিক্রম ঘটে, তথায় এই বৃক্ষ রোপণ করিলে, যথেষ্ট উপকার দর্শে, তাহার সন্দেহ নাই।"

অক্ষয়কুমারের লেখায় বিদ্যাসাগরের কথাশিল্পিসুলভ মাধুর্য্য পাওয়া যায় না; কিন্তু ভাষার বলিষ্ঠতা অক্ষয়কুমারের রচনার বিশেষ সম্পদ। সাহিত্যের ছাত্র বিদ্যাসাগর এবং বিজ্ঞানজিজ্ঞাসু অক্ষয়কুমারের রচনারীতির এই পার্থক্য তাঁহাদের মনোভঙ্গি অনুসারেই আসিয়াছে। শুধু রম্য গল্প-কবিতাই শিশু-সাহিত্যের শেষ কথা নয়—বিভিন্ন বিষয়ক জ্ঞান-বিজ্ঞানও সহজ কৌতূহলজনকভাবে উপস্থাপিত করিয়া শিশুর মানসোন্মেষের সহায়তা করা প্রয়োজন। "চারুপাঠে"র বিদ্যালয়গত উদ্দেশ্যকে অতিক্রম করিয়া অক্ষয়কুমার এইভাবে ভাবী শিশু-সাহিত্যের একটি "Book of Knowledge"-এর সূত্রপাত করিয়া গিয়াছেন—এ কথা বলা যাইতে পারে। উত্তরকালে বৈজ্ঞানিক লেখক জগদানন্দ রায় অক্ষয়কুমারের সাধনাকে সিদ্ধির মধ্যে উত্তীর্ণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

॥ ৩ ॥

রাজকৃষ্ণ :

বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমারের সঙ্গে সঙ্গে আর একটি নামও স্মরণযোগ্য। ইনি রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়। পূর্ব্বোক্ত লব্ধকীর্ত্তিদের সহিত তাঁহার প্রতিভার অবশ্যই কোনো তুলনা করা চলে না, কিন্তু বিদ্যাসাগরের প্রভাবে এবং তাঁহার স্নেহধারায় ধন্য হইয়া রাজকৃষ্ণ অন্ততঃ দুইখানি চমৎকার শিশুযোগ্য গ্রন্থ রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার আরো গৌরব এই যে, বিদ্যাসাগরের সহিত একযোগে একখানি গ্রন্থ রচনা করিবার সুদুর্লভ সৌভাগ্যও তিনি লাভ করিয়াছিলেন।

রাজকৃষ্ণের খ্যাতনামা এবং বহুল-প্রচারিত এই গ্রন্থ দুইখানি হইতেছে যথাক্রমে 'নীতিবোধ' (১৮৫১) এবং 'টেলিমেকস্' (১৮৫৯)। দুইখানি বই-ই মূল্যবান বলিয়া ইহাদের কিছু পরিচয় দিতেছি :

নীতিবোধ : ১২৫৮ (১৮৫১)

Nitibodha or Moral Class Book—এই ইংরাজী নামও দেওয়া ছিল। স্কুলপাঠ্য হিসাবে সমাদৃত হইয়াছিল গ্রন্থটি। ভাষা আদ্যোপান্ত বিদ্যাসাগর দ্বারা সংশোধিত। "রবর্ট ও বিলিয়ম চেম্বার্স বালকদিগের নীতিজ্ঞানার্থে ইংরেজি ভাষায় মরাল ক্লাশ বুক নামে যে পুস্তক প্রচারিত করিয়াছেন, এই নীতিবোধ তাহার সারাংশ সংগ্রহ করিয়া সংকলিত হইল।" তবে "ঐ পুস্তকের অবিকল অনুবাদ নহে।"

বইখানির একটু বৈশিষ্ট্য আছে। বলিতে গেলে ইহা রাজকৃষ্ণ ও বিদ্যাসাগরের যৌথ-রচনা। ভূমিকা হইতে জানা যায় বিদ্যাসাগর-ই ইহা প্রথম লিখিতে আরম্ভ করেন, কয়েকটি প্রসঙ্গ রচনার পর সময়াভাবে রাজকৃষ্ণের উপর ভারার্পণ করেন। একটি করিয়া

উপদেশাত্মক প্রসঙ্গ এবং সেইটি স্পষ্ট করিবার জন্য উদাহরণরূপে এক একটি ঐতিহাসিক কাহিনী—ইহাই গ্রন্থটির পরিকল্পনা। 'জ্ঞানার্ণব' 'জ্ঞানসুধাকর' প্রভৃতিতেও আমরা অনুরূপ বিন্যাস দেখিয়াছি।

বিদ্যাসাগরের রচনার নিদর্শন :

"নিউটন অতি শান্ত প্রকৃতি ছিলেন। কেহ কখন তাঁহাকে ক্রোধাদির বশীভূত হইতে দেখে নাই। তাঁহার একটি ছোট কুকুর ছিল ; তিনি উহাকে ডায়মণ্ড বলিয়া ডাকিতেন। এক দিবস তিনি কোন কর্ম্মানুরোধে পাঠগৃহ হইতে বহির্গত হইয়াছেন ; দৈবাৎ সেই সময় ডায়মণ্ড টেবিলের উপরে উঠিয়া জ্বলন্ত বাতি ফেলিয়া দেয়। তাহাতে কয়েক মুহূর্ত্তের মধ্যেই তাঁহার সমুদয় কাগজপত্র ভস্মাবশেষ হয়। এইরূপে তাঁহার বহু বৎসরের পরিশ্রম বিফল হইয়া যায়। কিন্তু নিউটন পাঠগৃহে প্রবেশ পূর্ব্বক এই ব্যাপার নয়নগোচর করিয়াও কুকুরকে প্রহার করিলেন না ; কেবলমাত্র এই কহিলেন, ডায়মণ্ড ! তুমি যে আমার কি ক্ষতি ও অপকার করিয়াছ তাহার কিছুই জান না।" (বিনয়)

রাজকৃষ্ণের রচনা :

"অনন্তর মুর······আপন পুত্রঘাতককে গৃহ হইতে বাহির করিয়া তাহাকে কহিলেন, তুমি যাহার প্রাণবধ করিয়াছ সে আমার পুত্র। তোমার এই পাপের ফল ভোগ করা আবশ্যক ও উচিত বটে, কিন্তু আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছি তোমার প্রাণরক্ষা করিব ; প্রাণান্তেও প্রতিজ্ঞাভঙ্গ করিব না, তোমার কোন ভয় নাই। এক্ষণে এক অতি দ্রুতগামী অশ্ব দিতেছি, তাহাতে আরোহণ করিয়া সারারাত্রি অবিশ্রান্ত পলায়ন কর, কল্য প্রত্যূষে একেবারে নিঃশঙ্ক ও নিরাপদ স্থানে উত্তীর্ণ হইবে। তুমি আমার পুত্রহত্যা করিয়াছ তথাপি তোমার প্রাণদণ্ড করিতে যে আমার প্রবৃত্তি হইল না এবং আমার যে প্রতিজ্ঞা প্রতিপালন হইল, ইহাতে আমি জগদীশ্বরকে ধন্যবাদ দিলাম।"

(প্রতিজ্ঞা-পালন)

রাজকৃষ্ণ বিদ্যাসাগরের প্রভাবে সুন্দর বাংলা লিখিতেন—যৌথ-ভাবে রচিত গ্রন্থটিতে তাঁহার কৃতিত্ব ম্লান হয় নাই।

টেলিমেকস্ঃ

প্রথম তিন সর্গের প্রকাশ জ্যৈষ্ঠ, ১৯১৫ সংবৎ। দ্বিতীয় সংস্করণও হয় ১৮৫৯ সালে। শেষ তিন সর্গ ১৮৬০ সালে দ্বিতীয় খণ্ডরূপে আত্মপ্রকাশ করে।

রাজকৃষ্ণ জানাইয়াছেন, এখানিও "শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর পরিশ্রম স্বীকার করিয়া আদ্যোপান্ত সংশোধন করিয়া দিয়াছেন।"

ফ্রান্সের সম্রাট্ চতুর্দ্দশ লুইয়ের উচ্ছৃঙ্খল ও বিদ্যাবিমুখ পুত্রকে শিক্ষাদানের জন্য তৎকালীন পরম পণ্ডিত "ফেনেলন উপন্যাসচ্ছলে তাঁহাকে নীতিশিক্ষা করাইবার নিমিত্ত টেলিমেকস্ রচনা করেন। এই গ্রন্থ এত উত্তম যে, ফরাসী ভাষায় এক অত্যুৎকৃষ্ট মহাকাব্য বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে এবং ইউরোপীয় যাবতীয় ভাষায় অনুবাদিত হইয়াছে" (বিজ্ঞাপন)। রাজকৃষ্ণ এই সুপরিচিত দীর্ঘ গ্রন্থটিকে মোটামুটি সরল ভাষায় রূপান্তরিত করিয়াছেন। ভারতীয় পণ্ডিত বিষ্ণু শর্ম্মার অনুরূপ প্রেরণায় রচিত এই কাহিনীর ভাষান্তর তৎকালীন বাংলা শিশু-সাহিত্যে একটি মূল্যবান সংযোজন।

গ্রন্থটিকে একদিক হইতে 'ওডিসি'র পরিশিষ্ট বলা যাইতে পারে। গ্রীসের কুশলী রণনীতিজ্ঞ ইউলিসিসের পুত্র টেলিমেকসের অভিযান বৃত্তান্তই ইহার বিষয়বস্তু। কাহিনী অত্যন্ত আকর্ষণীয়. উপদেশ-মুখ্য হইলেও গল্পের রসাস্বাদনে বাধা হয় না। বইখানির অনেকগুলি সংস্করণ হইয়াছিল।

রচনার নিদর্শন এইরূপ:

"তদনন্তর রথযুদ্ধ আরম্ভ হইল। প্রতিদ্বন্দ্বিগণ স্ব স্ব ইচ্ছানুসারে রথ মনোনীত করিয়া লইতে পারিল না, যাহার ভাগ্যে যাহা পড়িল তাহাকে তাহাই লইতে হইল। ঘটনাক্রমে অতি উৎকৃষ্ট রথই আমার

ভাগ্যে পড়িল। আমরা কয়েকজন আরূঢ় হইয়া আপন আপন রথ চালাইতে লাগিলাম। সকলেই রথ অত্যন্ত বেগে ধাবমান হইল, কিন্তু আমি তাদৃশ বেগ না দিয়া তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলাম। কিয়ৎদূর গমন করিয়া সকলেরই অশ্ব নিতান্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িল। এই সময়ে আমি আপন অশ্বদিগকে সম্পূর্ণ বেগে চালাইতে লাগিলাম এবং সর্ব্বাগ্রে নির্ণীত স্থানে উপস্থিত হইলাম। ইহা দেখিয়া সমুদায় দ্রষ্টৃবর্গ পুনর্ব্বার এই বলিয়া উচ্চৈধ্বর্নি করিয়া উঠিল, ইউলিসিস্ তনয়ের জয়। এই ব্যক্তিকেই দেবতারা আমাদের রাজ্যেশ্বর স্থির করিয়া প্রেরণ করিয়াছেন।" (পঞ্চম সর্গ—পৃঃ ৫৪)

চতুর্থ অধ্যায়

রাজেন্দ্রলাল, বঙ্গভাষানুবাদক সমাজ ঃ প্রাণবন্যা

॥ ১ ॥

বিদ্যাসাগর এবং অক্ষয়কুমার যখন পরোক্ষ ভাবে শিশু-সাহিত্যের ভিত্তিকে আরো দৃঢ়ভাবে গঠন করিতেছেন, তখন বাংলা সাহিত্যে একটি সাময়িক পত্রের আবির্ভাব হইল। বলিতে গেলে ঐতিহাসিক ভাবে ইহাই শিশু, কিশোর, বালক এবং সর্ব্বসাধারণের জন্য প্রথম সুপরিকল্পিত এবং সুসম্পাদিত আদর্শ পত্রিকা। ইহার সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলিতেছেন ঃ 'রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয় "বিবিধার্থ সংগ্রহ" বলিয়া একটি ছবিওয়ালা মাসিকপত্র বাহির করিতেন। তাহারই বাঁধানো একভাগ সেজদাদার আলমারির মধ্যে ছিল। সেটি আমি সংগ্রহ করিয়াছিলাম। বারবার করিয়া সেই বইখানা পড়িবার খুশি আজও আমার মনে পড়ে। সেই বড়ো চৌকা বইটাকে বুকে লইয়া আমাদের শোবার ঘরের তক্তাপোশের উপর চিত হইয়া পড়িয়া নর্হাল তিমি মৎস্যের বিবরণ, কাজির বিচারের কৌতুকজনক গল্প, কৃষ্ণকুমারীর উপন্যাস পড়িতে কত ছুটির দিনের মধ্যাহ্ন কাটিয়াছে।

এই ধরণের কাগজ একখানিও এখন নাই কেন ?···সর্ব্বসাধারণের দিব্য আরামে পড়িবার একটি মাঝারি শ্রেণীর কাগজ দেখিতে পাই না।······এই মোটা ভাত মোটা কাপড়ই বেশির ভাগ লোকের বেশি মাত্রায় কাজে লাগে।' ১

রবীন্দ্রনাথের এই আক্ষেপের নিরসন এখনো সম্পূর্ণ ঘটিয়াছে কিনা বলা যায় না ; কারণ, ঠিক 'বিবিধার্থ সংগ্রহ' বা তাহার উত্তরসাধক

১। জীবন স্মৃতি—ঘরের পড়া

'রহস্য সন্দর্ভে'র মত পত্রিকা আজ পর্য্যন্ত আর প্রকাশিত হয় নাই। শিশু হইতে বৃদ্ধ পর্য্যন্ত সকলের জন্য জ্ঞান এবং আনন্দের অন্নসত্র খুলিয়া দিয়া 'বিবিধার্থ সংগ্রহ' এক ঐতিহাসিক ভূমিকায় অভিনয় করিয়া গিয়াছে।

১৮৫১ সালে কলিকাতায় ভার্নাকিউলার লিটারেচার কমিটি বা বঙ্গভাষানুবাদক সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রাধাকান্ত দেব, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, ই-বি-কাউয়েল, হজ্‌সন প্র্যাট, সীটনকার, রেভারেণ্ড লং ও জন রবিনসন প্রমুখ ইহার সহিত যুক্ত ছিলেন। ইহার উদ্দেশ্য ছিল ঃ

"To publish translations of such works which are not included in the design of the Tract of Christian Knowledge Societies on the one hand, or of the School Book and Asiatic Societies on the other and likewise to provide a sound and useful Vernacular Domestic Literature for Bengal". ১

বিবিধার্থ সংগ্রহ

এই কমিটির উদ্যোগেই রাজেন্দ্রলাল মিত্রের সম্পাদনায়, ১৮৫১ সালের শেষাংশে (কার্ত্তিক ১২৫৮) বিলাতী পেনি ম্যাগাজিনের আদর্শে 'বিবিধার্থ সংগ্রহ' নামে একখানি সচিত্র মাসিক পত্রের আবির্ভাব ঘটিল। 'পশ্বাবলী' প্রভৃতিতে চিত্র থাকিলেও বাস্তবপক্ষে বাংলা ভাষায় ইহাই প্রথম সচিত্র মাসিক পত্রিকা। রাজেন্দ্রলাল এই কাগজখানি বাহির করিবার জন্য বঙ্গভাষানুবাদক সমাজের নিকট হইতে মাসিক ৮০ (আশী) টাকা করিয়া সাহায্য পাইতেন। দীর্ঘায়তন এই পত্রিকাটির পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিল মোট ষোলো, বার্ষিক মূল্য

১। Long's Returns—1859 (P livliv), বাংলা সাময়িক পত্র, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১২৩,

ছল দেড় টাকা। ইহার শীর্ষলিপি ছিল: "পুরাবৃত্তেতিহাস-প্রাণিবিদ্যা-শিল্প-সাহিত্যাদি-দ্যোতক মাসিক পত্র।"

"আবাল বৃদ্ধ বণিতা সকলের পাঠযোগ্যকরণার্থে" এই পত্রিকাটি যে নিষ্ঠার সঙ্গে অবতীর্ণ হইয়াছিল, তাহার কোনো তুলনা হয় না। ইহার প্রথম খণ্ড প্রথম সংখ্যাতে যে সূচনাপর্ব্ব আছে, তাহাতে রাজেন্দ্রলাল বলিতেছেন: "জগদীশ্বরের কি অনুপম মহিমা। তাঁহার ইচ্ছায় এই ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে কি আশ্চর্য্য অনির্ব্বচনীয় ব্যাপার সকল নিষ্পন্ন হইতেছে!"

'বিপুলা চ পৃথ্বীর' এই বহুমুখী বৈচিত্র্যের সহিত জনচিত্তকে পরিচিত করাইয়া দিবার জন্যই ষোলো পাতার একটি অপরূপ পত্রিকায় রাজেন্দ্রলাল যেন ভূরি-ভোজের আয়োজন করিয়াছিলেন।

সেই যুগটিই ছিল জ্ঞান-তৃষ্ণার কাল। অতীতের জড়তার আবরণ ভেদ করিয়া নূতন সভ্যতা ও সংস্কৃতির আলোক-বন্যা আসিয়াছে পশ্চিমের দিগন্ত হইতে—পিঞ্জর-বন্দী বিহঙ্গমের মতো দেশের হৃদয় সেই কিরণ-ধারার দিকে চাহিয়া যেন পক্ষ-বিধূনন করিতেছে। রাজেন্দ্রলালের পত্রিকায় বিদ্যাসাগরের সাহিত্যিক স্বাদুতা এবং অক্ষয়কুমারের জ্ঞানান্বেষণের যেন সমন্বয় ঘটিয়াছিল। বৈজ্ঞানিক এবং পরম পণ্ডিত রাজেন্দ্রলাল "দিগ্‌দর্শনের" সংকেতকে আশ্রয় করিয়া একটি Encyclopaedic সত্তার রচনার যে প্রয়াস পাইয়াছিলেন, প্রথম সংখ্যা বিবিধার্থ সংগ্রহের মুখবন্ধেই তাহা প্রকাশ: "অশ্বের বেগ এবং মনুষ্যোপকারিতা, হস্তির বুদ্ধি এবং ধীরতা, কুকুরের কৃতজ্ঞতা, উষ্ট্রের সহিষ্ণুতা, সিংহের গাম্ভীর্য্য, ব্যাঘ্রের বীর্য্য, এই সকলেতেই সর্ব্বনিয়ন্তার মহিমা বিস্তৃত হইতেছে; ইহাদের বিচার পরম জ্ঞান ও আনন্দের প্রধান উপায়; ইহা বালক ও বৃদ্ধ ও বণিতা সকলেরই মনোরঞ্জক এবং সকলেই ইহাদের বৃত্তান্ত শুনিতে ইচ্ছা করেন। অতএব সময়ে ২ এতদ্বিষয়ে যথার্থ বর্ণনা প্রকাশ করা আমাদের অভিপ্রায় এবং তদভিপ্রায়ে এই পত্র স্থাপিত হইল। পরন্তু

আমরা যে কেবল জ্যোতির্বিদ্যায় এবং জীবসংস্থার বর্ণনায় নিযুক্ত থাকিব এমত নহে। পদার্থবিদ্যা, ভূগোলবিদ্যা, পুরাতত্ত্ব, ইতিহাস, সাহিত্যালঙ্কারাদি সকল শাস্ত্রের মর্ম্ম আমাদিগের সমরূপে উদ্দেশ্য।
······যে কেহ দুই আনা পয়সা দিয়া বিবিধার্থ সংগ্রহকে সমাদর করিবেন তাঁহার ও তাঁহার পুত্রপৌত্রাদিক্রমে অনেকের নিকট ঐ পত্র পরিষদের ন্যায় বহুকালাবধি থাকিয়া শুদ্ধ জ্ঞান এবং প্রমোদ-জনক সদালাপে তাঁহাদের তুষ্টি জন্মাইবে।"

এই দাবির মধ্যে রাজেন্দ্রলাল অতিশয়োক্তি করেন নাই। বস্তুতঃ বিচিত্রমুখী বিষয়ের সরস, স্বচ্ছন্দ ও জ্ঞানগর্ভ আয়োজনে 'বিবিধার্থ সংগ্রহ' অতি মূল্যবান Handbook-এর গৌরব লাভ করিয়াছিল। সর্ব্বসাধারণের বুদ্ধিতে জ্ঞানের সহজ অনুপ্রবেশ সাধন করাইবার জন্য রাজেন্দ্রলাল একটি Standard—আদর্শ ভাষা গঠনেরও প্রয়াস পাইয়াছিলেন। ইহা সর্ব্বজনবোধ্য এবং "অতি কোমল।" বিবিধার্থ সংগ্রহের "উপক্রম"-পত্রে আরো বলা হইতেছে :

"আমাদের লিখিবার প্রণালী বিষয়ে পণ্ডিত মহাশয়দিগের অসন্তুষ্ট হইবার সম্ভাবনা আছে, কিন্তু ভরসা করি তদ্বিষয়ে তাঁহারা এতৎপত্রের লক্ষ্য স্মরণ করিয়া আমাদিগকে ক্ষমা করিবেন। যাহাতে সাধারণ জনগণ অনায়াসে বিদ্যালাভ করে; যাহাতে বণিক্ ও মোদক আপন ২ কর্ম্ম হইতে অবকাশমতে জগতের বৃত্তান্ত জানিতে পারে, যাহাতে বালক ও বালিকাগণ ক্রীড়াছলে এই পত্র পাঠ করিয়া আপন ২ জ্ঞানের বিস্তার করে···এমত উপায় প্রদান করা এই পত্রের লক্ষ্য এবং ঐ মানসসিদ্ধার্থে যাহাতে এই পত্র সকলে অনায়াসে পাঠ করিতে পারেন, ইহা আমাদের অবশ্য কর্ত্তব্য। পণ্ডিত মহাশয়েরা অপভ্রংশ ও অপর ভাষা অনায়াসে বুঝিতে পারেন, কিন্তু সুকঠিন সাধুভাষা উপদেশবিরহে অজ্ঞ ব্যক্তির কদাপি বোধগম্যা হইতে পারে না; অতএব অপভ্রংশ মিশ্রিত প্রচলিত ভাষা ভদ্রসমাজের কথোপকথনে সর্ব্বদা ব্যবহৃত হইয়া থাকে তাহাই এই পত্রের উপযুক্ত পরিচ্ছদ।"

এইগুলি হইতে রাজেন্দ্রলালের সদিচ্ছার একটি সম্যক্ পরিমাপ করা যায়।

বিবিধার্থ সংগ্রহের প্রথম সংখ্যাতেই সচিত্র "হোমা পক্ষির বিবরণ" আছে, "জিব্রাশ্রেণীস্থ পশুর বিবরণ" ও "ড্ৰ্উ মৃগয়া"র ছবি আছে; সে-কালে স্বাদেশিকতা ও জাতীয় গৌরবের যে নবীন প্রেরণা জাতির অন্তরে ধীরে ধীরে সঞ্চারিত হইতেছিল, তাহারই প্রকাশরূপে —"সচিত্র শিখ ইতিহাস" রহিয়াছে। ইহা ছাড়াও বিদ্যা ও জ্ঞানবিস্তারের প্রয়োজনীয়তা বুঝাইতে "গ্রাম্য গ্রন্থালয়" নামে একটি অত্যন্ত মূল্যবান প্রসঙ্গও তিনি সন্নিবেশিত করিয়াছেন ভোজের পর অম্ল পরিবেষণের মত "কৌতুককণা"ও বাদ পড়ে নাই। গ্রাম্য গ্রন্থালয় প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে :

"এতদ্রূপ ভদ্র ধনাঢ্য পল্লীগ্রাম অনেক আছে, যে তাহাতে প্রতি বৎসর মিথ্যা কর্ম্মোপলক্ষে অনেক ব্যক্তি শত২ টাকার বারুদ পোড়াইয়া ক্ষণিক আমোদ করেন; মিথ্যা সং নির্ম্মাণ করিয়া কত শত মুদ্রা ব্যয় করেন। এমত সকল গ্রামে এক দুইটি উত্তম গ্রন্থালয় না থাকা তত্তদ্ গ্রামস্থ কি পর্য্যন্ত নিন্দাকর তাহা তাঁহারাই বিবেচনা করিয়া দেখুন।

অনেক সামান্য গ্রামেও সহস্রাধিক গৃহস্থের বসতি আছে। তন্মধ্যে চারিশত ঘর একত্র হইয়া যদ্যপি দুই আনা করিয়া প্রদান করেন তাহা হইলে সহজেই ৫০ টাকা প্রতিমাসে সংগ্রহ হয় এবং সেই অর্থে এক গ্রন্থালয়ের কাজ অনায়াসে চলিতে পারে। অপর গ্রামস্থ জমিদার মহাশয়দিগের পক্ষে এক বিঘা ভূমি ও তদুপরি এক গ্রন্থালয় হইলে গ্রামস্থ সকলে ঐস্থলে একত্র হইয়া সংবাদপত্র পাঠদ্বারা জগতের বৃত্তান্ত জানিতে পারেন ও মনোহর কবিতা পাঠ করত মনকে প্রফুল্ল করণে সক্ষম হয়েন, ইতিহাস ও পদার্থবিদ্যা পাঠদ্বারা জ্ঞানজ্যোতিতে ভাসমান হইতে পারেন, স্বগ্রামের মঙ্গলোন্নতির উপায় স্থির করেন এবং এতদ্দেশের রীতি-নীতির পরিশোধন চেষ্টা করেন।"

ভারতের ঐতিহাসিক পরিচয় দিতে গিয়া রাজেন্দ্রলাল বিবিধার্থ সংগ্রহের বিভিন্ন সংখ্যায় মধ্যে মধ্যে চমৎকার ভৌগোলিক মানচিত্রও দিয়াছেন। "সরলেব উপাখ্যান" ইত্যাদি নীতিমূলক আখ্যানেরও অভাব নাই। "ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী", "ঢাকাই বস্ত্র", "নীল প্রস্তুত করণের প্রথা" হইতে আরম্ভ করিয়া "সম্পত্তি শাস্ত্র", "মানুষের প্রাকৃতিক ইতিবৃত্ত"—কিছুই তাঁহার আলোচনার বহির্ভাগে পড়ে নাই। "ইটালী দেশের দস্যুদের" সম্পর্কে এইভাবে কৌতূহলোদ্দীপক বিবরণ দেওয়া হইয়াছে ঃ "তাহাদিগের স্ত্রী কন্যারাই প্রায় চরের কর্ম্ম সম্পাদনার্থে নিযুক্ত হয়। কখন২ অন্য স্ত্রীরাও স্ব২ ধর্ম্মের প্রতি জলাঞ্জলি দিয়া দস্যুদের ধর্ম্মাচরণে প্রবৃত্ত হওত তাহাদিগের অভীষ্ট সিদ্ধি করে। এই যাস্যুরা হস্তে টাকু লইয়া পাট কাটিতে২ ও মৃদু স্বরে গান করিতে২— সময়২ স্বীয় কি পরকীয় অপোগণ্ড একটি শিশুকে ক্রোড়ে লইয়া— রাজপথে ভ্রমণ করে। পথিকদিগের সহিত সাক্ষাৎ হইলে নানা ছলে তাহাদিগের সহিত আলাপ কৌশল করিতে করিতে যে স্থানে আপনাদের সহধর্ম্মিরা লুক্কাইত থাকে তথায় উপনীত করাইয়া ছলক্রমে সত্বরে দস্যুদিগের নিকট গিয়া ইঙ্গিতাদি দ্বারা পথিকদিগকে দেখাইয়া দেয়, এবং দস্যুরা তৎক্ষণাৎ বন্দুক দ্বারা ইষ্টকর্ম্ম সমাধা করে কখন বা কেবল বন্দুক দর্শা দিয়াই কার্য্য সমাধা করে।"

এ সমস্ত ছাড়াও পশুপক্ষিগণের অজস্র সচিত্র বিবরণ বিবিধার্থ সংগ্রহে আছে। অপরিসীম পাণ্ডিত্যকে রাজেন্দ্রলাল অসামান্য নৈপুণ্যের সহিত লোকশিক্ষার খাতে প্রবাহিত করিয়া দিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। মধ্যে মধ্যে পরিবেষিত সরস কৌতুককণা এবং শিক্ষা-মূলক 'কণিকা 'সমুচ্চয়'ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। একটি 'কৌতুককণা' এইরূপ ঃ

তবে আমি ঘুমুচ্ছি

কেহ আপন সখাকে প্রাতঃকালে নিদ্রিত দেখিয়া কহিলেন; "বন্ধো, তুমি কি নিদ্রিত আছ"? শয্যাস্থ ব্যক্তি কহিলেক, "কেন?" সখা প্রার্থনা করিলেন; "আমার একটা টাকার প্রয়োজন হইয়াছে, যদি

তুমি জাগ্রৎ থাক তবে উঠিয়া আমায় কর্জ্জ দিলে ভাল হয়।" সে কহিল; "তবে আমি ঘুমুচ্ছি"।

'কণিকা সমুচ্চয়ে'র একটি :

উত্তমের ধর্ম্ম

খণ্ডং খণ্ডং ত্যজতি ন পুনঃ স্বাদুতামিক্ষুদণ্ডং
দগ্ধং দগ্ধং ত্যজতি ন পুনঃ কাঞ্চন কান্তবর্ণং।
ঘৃষ্টং ঘৃষ্টং ত্যজতি ন পুনশ্চন্দনচারুগন্ধং
প্রাণান্তেঽপি প্রকৃতি বিকৃতির্জায়তে নোত্তমানাং॥

যথা ইক্ষুদণ্ডকে খণ্ড খণ্ড করিলেও তাহার স্বাদুতা নষ্ট হয় না এবং পুনঃ২ দগ্ধ করিলেও স্বর্ণের বর্ণের ব্যতিক্রম হয় না, আর চন্দনকে সতত ঘৃষ্ট করিলেও তাহার সদ্‌গন্ধ লোপ হয় না, তথা প্রাণান্তেও উত্তমদের স্বভাবের অন্যথা হয় না।"

'বিবিধার্থ সংগ্রহ' উদ্দেশ্যগতভাবে সর্ব্বজনের শিক্ষা ও আনন্দের উপকরণ হইলেও ইহাকেই প্রথম আদর্শ শিশু-পত্রিকার গৌরব দেওয়া উচিত। শিশুপাঠ্য পত্রের যথার্থ আবেদন মাত্র অপরিণত মনের প্রয়োজন মিটাইয়াই কর্ত্তব্য শেষ করে না, বয়স্কেরাও তাহা হইতে জ্ঞান ও আনন্দ লাভ করেন। 'বিবিধার্থ সংগ্রহ' সেই যৌথকর্ম্ম অতি সুচারুভাবেই সম্পন্ন করিয়াছে। রাজেন্দ্রলালের বিপুল মনীষা এই পত্রিকাখানিতেও নিজের চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছে।

দেশের দুর্ভাগ্য, 'বিবিধার্থ সংগ্রহ' দীর্ঘায়ু লাভ করিতে পারে নাই। রাজেন্দ্রলাল অনিয়মিতভাবে প্রথম ছয় পর্ব্ব সম্পাদন করিবার পর কালীপ্রসন্ন সিংহ সপ্তম পর্ব্ব হইতে ইহার সম্পাদনার ভার লইয়াছিলেন। কিন্তু কালীপ্রসন্ন 'নীলদর্পণ' নাটক সম্পর্কিত ব্যাপারে অংশভাগী হইয়া নীলকরদের বিষয়ে তীব্র সমালোচনা করেন এবং ফলে রাজরোষে ১৮৬১ সালের শেষাশেষি 'বিবিধার্থ সংগ্রহের' প্রচার রদ হইয়া যায়। স্বমহিমায় পত্রিকাটীর জন্ম হইয়াছিল, সেই মহিমা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াই ইহা গৌরবময় মৃত্যু বরণ করিয়াছে।

॥ ২ ॥

বঙ্গভাষানুবাদক সমাজ ঃ মধুসূদন মুখোপাধ্যায় ও রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন ঃ

১৮৫১ সালে বঙ্গভাষানুবাদক সমাজ স্কুলবুক সোসাইটির পরিপূরকরূপে কল্পিত হয়। স্কুলবুক সোসাইটি যেমন বিদ্যালয়গত শিক্ষার দায়িত্ব লইয়াছিল, তেমনি অনুবাদক সমাজের গার্হস্থ্য গ্রন্থাবলী (Bengali Family Library) জনশিক্ষার সর্ব্বাঙ্গীণ সাধনায় অগ্রসর হইয়াছিল। এই অনুবাদক সমাজের কথা আজ বিস্মৃতপ্রায়—কোনো গবেষণা বা আলোচনা গ্রন্থ ইহার উপর বিশেষ গুরুত্ব দেয় না—ইহার প্রাণপুরুষ অদ্ভুতকর্ম্মা মধুসূদন মুখোপাধ্যায়ের জীবনের ইতিহাসটুকু পর্য্যন্ত জানিবার উপায় নাই। অথচ এ কথা আজ জোর করিয়া বলিবার সময় আসিয়াছে যে, বিদ্যাসাগর জনশিক্ষার যে মহাব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই ব্রত উদ্‌যাপনে বঙ্গভাষানুবাদক সমাজ অতি গৌরবময় স্থান অধিকার করিয়াছিল।

সাহিত্যের ইতিহাস পড়িতে পড়িতে মনে প্রশ্ন জাগে ঃ 'কামিনী-কুমার', 'চন্দ্রকান্তে'র যুগ উনিশ শতকের নূতন প্রাণ-বন্যায় ভাসিয়া গেল ; ইংরাজি শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রভাবে—দেশব্যাপী জাগরণের চেতনার মধ্যে—লোকের রুচি অনিবার্য্যভাবেই পরিবর্ত্তিত হইল ; নগ্ন আদিরসের উৎসব—ফার্সি কেচ্ছায় অনুপ্রাণিত ভারতচন্দ্রীয় পদ্ধতির সাহিত্যের প্রতি নিঃসন্দেহেই আর আত্যন্তিক অনুরাগ রহিল না ; ১৮৬৫ সালে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম উপন্যাস বাহির হইয়া রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'জাতির হৃৎপদ্ম প্রথম বিকশিত' হইল ; কিন্তু ইহার মধ্যবর্ত্তী সময়ে দেশের মানুষের সাহিত্যের ক্ষুধা মিটাইত কে? বঙ্কিমচন্দ্রের

আবির্ভাবের কোনো পটভূমিই কি রচিত হয় নাই ? কেবল ভূদেবের 'ঐাতহাসিক উপন্যাস' (রোমান্স অফ হিস্ট্রি দ্বারা অনুপ্রাণিত) এবং 'আলালের ঘরের দুলাল'ই কি বঙ্কিমচন্দ্রের পূর্ব্বগামী ছিল ? রবীন্দ্রনাথ, 'বঙ্কিমচন্দ্র' প্রবন্ধে সেই কথাই বলিয়াছেন। ১

বিপিনচন্দ্র পাল তাচ্ছল্যভরে 'চক্‌মকির বাক্স' এবং 'চীনদেশীয় রাজকন্যা'র একবার উল্লেখ করিয়াছেন মাত্র। ২ বলিতেই হইবে বঙ্গভাষানুবাদক সমাজের দান এই সমস্ত সমালোচকদের দ্বারা উপেক্ষিত হইয়াছে। ১৩-১৪ বৎসর ধরিয়া এই প্রতিষ্ঠান বাঙালীর ঘরে ঘরে সৎসাহিত্য পৌঁছাইয়া দিয়াছে—শিক্ষার সঙ্গে আনন্দের পশরা বহিয়া আনিয়াছে। মাত্র বিদ্যাসাগরই আধুনিক বাংলা গদ্যের সরলীকরণ করেন নাই—অনুবাদক সমাজও তাঁহার কাজে প্রচুর সহায়তা করিয়াছে।

বিদেশী কথা-সাহিত্যের বহু মূল্যবান গ্রন্থ, জ্ঞানগর্ভ রচনা শিশু-সাহিত্য—সব কিছুর অকৃপণ উপচার এই সমাজ সাজাইয়া আনিয়াছিল। নামেই প্রকাশ—কেবল অনুবাদ গ্রন্থই সমাজের পক্ষ হইতে প্রকাশের আয়োজন করা হইয়াছিল। কিন্তু প্রচারিত গ্রন্থগুলিকে মাত্র অনুবাদ বলিলে ভুল করা হইবে। এই অনুবাদ কেবল যান্ত্রিক ভাষান্তরই ছিল না—দেশের মানুষের উপযোগী করিয়া, স্বচ্ছন্দভাবে এগুলি রচনা করা হইত। অধিকাংশ গ্রন্থই ছিল সুনির্ব্বাচিত—পরিচালকমণ্ডলী বিশেষ দেখিয়া শুনিয়া তবেই বই মুদ্রিত করিতেন—প্রচারও ছিল ব্যাপক। কল্পনাতীত সুলভমূল্যে পরিপাটি ছাপা এবং মনোরম বাঁধাই করা বইগুলি বাঙালীর ঘরে ঘরে সৎসাহিত্যের বিস্তার সাধন করিত ; শিশু-বৃদ্ধ-নরনারী সকলেই ইহা হইতে সুশিক্ষা ও পরিতৃপ্তি লাভ করিতেন।

এই সমাজের পক্ষ হইতেই 'বিবিধার্থ সংগ্রহ' প্রকাশিত হইয়াছিল

১। বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, আধুনিক সাহিত্য।

২। বাংলা সাহিত্য, বিপিনচন্দ্র পাল।

সে আলোচনা পূর্ব্বেই আমরা করিয়াছি। পত্রিকা প্রকাশিত হইলেও গ্রন্থ মুদ্রণের কাজ আরম্ভ হইতে বেশ কিছু বিলম্ব ঘটিয়াছিল। 'বিবিধার্থ সংগ্রহে'র বিংশ খণ্ড (১৭৭৫ শকাব্দ—১৮৫৩) হইতে এই সমাজের মাসিক কার্য্যের বিবরণ এইভাবে পাওয়া যাইতেছে:

"গত ১২ই আগস্ট শুক্রবার দিবসে শ্রীযুক্ত ওয়াইলি সাহেবের বাড়ীতে প্রস্তাবিত সমাজের মাসিক সভা হইয়াছিল, তাহাতে শ্রীযুক্ত সিটন-কার, শ্রীযুক্ত ওয়াইলি, শ্রীযুক্ত উড্রো, শ্রীযুক্ত প্রাট, শ্রীযুক্ত লং, শ্রীযুক্ত রাজা রাধাকান্ত দেব, শ্রীযুক্ত বাবু জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় এবং শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর উপস্থিত থাকিয়া নিম্নলিখিত প্রস্তাবসকল গ্রাহ্য করিয়াছেন"—

এই সকল প্রস্তাব হইতে জানা যায়, এখন পর্য্যন্ত ইহার কার্য্য সংহতিবদ্ধরূপে আরম্ভ হয় নাই। গ্রন্থগুলিকে জনপ্রিয় ও বহুল প্রচারিত করার চেষ্টা এবং ভবিষ্যতে কি কি ধরণের গ্রন্থ প্রকাশ করা হইবে, তাহারও পরিকল্পনা চলিতেছে। উৎকৃষ্ট ইংরাজি এবং সংস্কৃত গ্রন্থাদির অনুবাদ প্রচারই ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল।

এই সমাজের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন প্রথমে আর-বি চ্যাপম্যান, পরে প্রখ্যাত পণ্ডিত ই-বি কাউয়েল। সহকারী ছিলেন মধুসূদন মুখোপাধ্যায়। বলিতে গেলে মধুসূদনই ছিলেন ইহার প্রাণশক্তি। রেভারেণ্ড লং এবং হজসন প্র্যাট যে ইহাতে উৎসাহিত সক্রিয় সহযোগিতা করিয়াছিলেন, তাহারও নিদর্শন রহিয়াছে।

বঙ্গ ভাষানুবাদক সমাজ হইতে 'Bengali Family Library বা গার্হস্থ্য বাংলা পুস্তক' নামে চিহ্নিত করিয়া গ্রন্থ প্রকাশ আরম্ভ হয় সম্ভবতঃ ১৮৫৬ সালে। ইহার প্রথম গ্রন্থ ডানিয়েল ডি-ফোর মূল ইংরাজী অবলম্বনে **রাবিনসন ক্রুশোর ভ্রমণ বৃত্তান্ত** নামে আত্ম-প্রকাশ করে। ৩৬৬ পৃষ্ঠার বই, বারোখানি চিত্রযুক্ত—দাম ।৵০ আনা। বাংলা সাহিত্যে এই বইখানিই সর্ব্বপ্রথম সচিত্র বালকপাঠ্য গ্রন্থ।

বইখানি অনুবাদ করিয়াছিলেন রেভারেণ্ড জন রবিনসন (জান

রাবিনসন)। ইংরেজ মিশনারীর হাতে এ অনুবাদ নিন্দনীয় হয় নাই। ইহার আরো বিশেষত্ব ছিল। যাহাতে গ্রন্থটিকে একান্ত বিদেশী বলিয়া মনে না হয় –যাহাতে দেশের লোক বইখানিকে আপন বলিয়া গ্রহণ করিতে পারে—সেজন্য গল্পটিকে যথাসম্ভব বাঙালীর সন্নিহিত করা হইয়াছিল। সমাজের দ্বিতীয় গ্রন্থ 'পাল ও বর্জিনিয়া'র (Paul and Virginia) মুখবন্ধরূপে হজসন প্র্যাট যাহা বলিয়াছেন তাহা উল্লেখযোগ্য :

When the Vernacular Literature Committee was first set on foot, there was much discussion as to whether the works selected for translation into Bengali should undergo any adaptation, or should be translated as literally as possible and without any paraphrasing or alteration of the original whatever.

The following extract from a letter which I published at that time still expresses my own view on the matter.

"Mere translation would not meet the great objects which this Society intends to keep in view. There is not only a difference of language between the people of India and of England. We must recognise the far greater difficulty of a difference of ideas, associations and literature. The instruction communicated to the masses requires somewhat more than the mere employment of the vehicle of native language ;—the form in which it is conveyed must appeal to ideas and feelings already existing. Every possible use must be made of what we already find in

their literature and associations—consistently with our object of communicating truth. All literature, even of the simplest kind, abounds with allusions which it is as necessary to understand as the words themselves, ; and if there is a complete ignorance of the subject-matter of those allusions, the words can only convey half of what it is intended to communicate. With this view, therefore, all works issued by the Committee will be carefully adapted with reference to the actual condition of the native mind,— its character and association."

In accordance with this view two of our members undertook to adapt the text of Robinson Crusoe which was the first of our series of translations.

On the ground that the paramount object was to bring the story home to the understanding of a Bengali Public, we did not hesitate to change the scene, to make Robinson Crusoe the son of an Armenian merchant in Calcutta, and to wreck him in one of the islands of Eastern Archipelago.

প্র্যাট পরে দুঃখ করিয়া বলিয়াছিলেন, রবিনসন ক্রুশোর ভাষান্তরের সঙ্গে এই গোত্রান্তর কমিটীর অন্য সদস্যেরা মানিয়া লন নাই। সুতরাং পরে বইখানিকে আবার মূল ইংরাজির কাছাকাছি লইয়া আসা হইয়াছিল। এ কাজ করিয়াছিলেন হরিশচন্দ্র শর্ম্মা —চতুর্থবার মুদ্রণের সময় (১৮৭০)। হরিশ্চন্দ্র ভূমিকায় জানাইয়াছেন: "ইহা তিন বার মুদ্রিত হইয়া নিঃশেষিত হইয়াছে। School Book Societyর অধ্যক্ষ মহাশয়েরা ইহার ভাষা সংশোধন প্রয়োজন

বিবেচনা করিয়া সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ এবং উক্ত সোসাইটির অন্যতম সদস্য বাবু প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারীর উপর ভার অর্পণ করেন। তিনি অনুগ্রহ করিয়া আমাকে সেই কর্ম্মের ভার দেন। আমি তাঁহার অনুমত্যনুসারে এই গ্রন্থের ভাষা সংশোধনে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছি এক্ষণে কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছি বলিতে পারি না।"

চতুর্থ মুদ্রণ হইতেই বোঝা যায়, জন রবিনসনের অনুবাদও প্রচুর জনপ্রিয় হইয়াছিল। হরিশচন্দ্র শর্ম্মা গ্রন্থে ভাষা সংশোধনে কিছু খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। রামরাম বসুর "রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত"ও তাঁহার হস্তক্ষেপে নবকলেবর গ্রহণ করিয়াছিল এবং অনুবাদক সমাজ কর্তৃক পুনর্মুদ্রিত হইয়াছিল। বইখানির নাম হইয়াছিল 'রাজা প্রতাপাদিত্যের চরিত'।

সমাজের দ্বিতীয় গ্রন্থঃ **পাল ও বর্জ্জিনিয়ার জীবন বৃত্তান্ত** ১৮৫৬। বিখ্যাত ফরাসী গ্রন্থটির অনুবাদ করিয়াছেন পণ্ডিত রাম-নারায়ণ বিদ্যারত্ন। বইটি একটি স্নিগ্ধ করুণ প্রেম কাহিনী—অবশ্যই শিশুদের জন্য নয়। তথাপি ইহার একটি সার্ব্বজনীনতা আছে। এই গ্রন্থেরই কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্যকৃত অন্যতর অনুবাদ "পৌল বর্জ্জিনি" 'অবোধবন্ধু' পত্রিকায় পড়িয়া বালক রবীন্দ্রনাথ পরম প্রীতিলাভ করিয়াছিলেন।

রামনারায়ণ বইখানি সুন্দরভাবে অনুবাদ করিয়াছেন কিন্তু অনুবাদক সমাজ তাঁহাদের কাজে কত সতর্কতা অবলম্বন করিতেন প্র্যাটের উক্ত ভূমিকা হইতে তাহাও জানা যায়। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের অধ্যাপক রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন খ্যাতনামা অনুবাদক—কিন্তু তাঁহার কাজে প্র্যাট খুশি হন নাই। "I had not read two pages before I found half a dozen sentences which I was perfectly certain no one could understand and which I ascertained the translator did not."

সুতরাং সমিতির প্রধান কর্ম্মদায়িত্ব তখন প্র্যাটের উপর ন্যস্ত ছিল

বলিয়া তিনি বইখানির উপর কলম চালাইতে বাধ্য হইয়াছেন :—
"I have taken the liberty of freely paraphrasing every passage in the text where I thought I could make the *sense clearer and I have omitted all allusions and* illustrations which would be stumbling-blocks to the Bengali readers."[1]

অনুবাদক সমাজের সতর্কতাবোধ এবং দায়িত্বজ্ঞান ইহা হইতেই অনুমান করা যায়।

সর্ব্ববয়সের নরনারীর জন্য অনুবাদক সমাজ বহুগ্রন্থ প্রচার করিয়াছিলেন। এই অনুবাদের প্রধান দায়িত্ব ছিল মধুসূদন মুখোপাধ্যায়ের উপরেই ন্যস্ত। তিনিই ইহার প্রধানাংশ গ্রন্থের ভাষান্তর করিয়াছিলেন। অনুবাদক সমাজের প্রকাশিত কিছু গ্রন্থের নাম উল্লেখ করা হইল :

১। রবিনসন ক্রুশোর ভ্রমণ বৃত্তান্ত—অনুবাদক জান রবিনসন (পরে সংশোধক—হরিশচন্দ্র শর্ম্মা)

২। পাল এবং বর্জ্জিনিয়ার জীবন বৃত্তান্ত—রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন।

৩। সেক্সপিয়র কৃত গল্প—ডক্টর বেয়ার।

৪। মনোরম্য পাঠ—নাম নাই।

৫। রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত—মূল : রামরাম বসু, সংশোধক হরিশচন্দ্র শর্ম্মা।

৬। বৃহৎকথা (১ম ও ২য় ভাগ) কথা সরিৎ-সাগর হইতে সরল সংক্ষিপ্ত ও শিষ্ট রূপান্তর—আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ।

৭। হংসরূপি রাজপুত্রদিগের বিবরণ বিষয়—মধুসূদন মুখোঃ

৮। পুত্র শোকাতুরা দুঃখিনী মাতা ও নায়ক-শোকাতুরা দুঃখিনী নায়িকা— ঐ

৯। ছোট কৈলাস ও বড় কৈলাস— ঐ

১০। চকমকির বাক্স, অপূর্ব্ব কারা বস্ত্র— ঐ

১১। মারমেত বা মৎস্য নারীর উপাখ্যান— ঐ

১২। চীনদেশীয় বুলবুল পাক্ষর বিবরণ— ঐ

১৩। অহল্যা হড্ডিকার জীবন-বৃত্তান্ত ঐ

১৪। নুরজাঁহান রাজ্ঞীর জীবন-বৃত্তান্ত ঐ

১৫। বায়ু চতুষ্টয়ের আখ্যায়িকা ঐ

১৬। কুৎসিত হংসশাবক ও খর্ব্বকায়াব বিবরণ— ঐ

১৬। সুশীলার উপাখ্যান (তিনখণ্ড)– ঐ

১৮। ক্রিলফের নীতিগল্প— ঐ

১৯। স্যাণ্ডফোর্ড ও মর্টন ঃ কথা তরঙ্গ— ঐ

২০। অবোধ— ঐ

২১। বিচার - ঐ

২২। জেপান— ঐ

২৩। জীব রহস্য— ঐ

২৪। মহাজিদ শা— ঐ

২৫। শিবাজীর চরিত্র— ঐ

২৬। এলিজিবেথ— রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন

২৭। নানকের জীবন চরিত— ঐ

২৮। হিতকথাবলী— ঐ

২৯। অদ্ভুত ইতিহাস— ঐ

গার্হস্থ্য গ্রন্থমালার পূর্ণ তালিকা ইহা নয়; আরো বহু গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছিল। তাহাদের অনেকগুলিই আজ বিস্মৃতির অন্ধকারে অবলুপ্ত। কবে এই সমাজের কাজ বন্ধ হইয়া যায় তাহাও জানিবার কোনো উপায় নাই। কিন্তু ইহা হইতেই অনুবাদক সমাজের কর্ম্ম-চেষ্টার ব্যাপকতা এবং মধুসূদনের অক্লান্ত সাধনার কিছু ইঙ্গিত মিলিবে। অথচ, মধুসূদনের কোনো পরিচয় পর্য্যন্ত পাওয়া যায় না। স্ত্রীশিক্ষা-বিস্তারের সহায়তায় তিনখণ্ড "সুশীলার উপাখ্যান" লিখিয়া

(ইহাই সম্ভবতঃ তাঁহার একমাত্র মৌলিক রচনা) তিনি তিনশো টাকা পুরস্কার পাইয়াছিলেন—এইটুকুই তাঁহার সাহিত্যিক কৃতিত্বের খাতায় জমা হইয়া আছে। তাঁহার নীরব সাধনার অন্যদিকটা চিরকালের মতো হারাইয়া গিয়াছে মনে হয়—বহু চেষ্টা করিয়াও তাঁহার কোনো জীবনী আমরা সংগ্রহ করিতে পারি নাই।

মধুসূদন মুখোপাধ্যায়

উপমা দিয়া বলা যায়—মধুসূদন তাহাদেরই একজন, যাহারা দীপান্বিতার প্রদীপ রচনা করিয়া চলে, অথচ আলোকোৎসবের সময় যাহাদের দানের কথা কেহ স্মরণেও রাখে না। অনুবাদ পড়িয়া এবং "সুশীলার উপাখ্যান" দেখিয়া মনে হয় না যে মধুসূদন নিতান্ত শক্তিহীন ছিলেন ; কিন্তু দেশের কল্যাণ-সাধনায় তিনি নিঃশব্দে আত্মলুপ্তি ঘটাইয়াছেন। বিপিনচন্দ্র পাল যে ভাবে 'চকমকির বাক্স'কে উড়াইয়া দিয়াছেন--তাহাকে সুবিচার বলা যায় না। একথা আজ জোর করিয়া বলা উচিত যে অনুবাদের মাধ্যমে হইলেও বাংলা শিশু সাহিত্যের প্রথম যুগে মধুসূদনই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব। বয়স্কদের জন্য অনূদিত গ্রন্থগুলির কথা বাদ দিয়াও এই কৃতিত্বেই তিনি উজ্জ্বল হইয়া থাকিবেন। তাঁহার চকমকির বাক্স, চীন দেশীয় বুলবুল পক্ষির বিবরণ, কুৎসিত হংস শাবক, খর্ব্বকায়ার বিবরণ, হংসরূপি রাজপুত্রের বিবরণ বিষয়, ছোট কৈলাস ও বড় কৈলাস ও বিচার প্রভৃতি তৎকালে বালক-বালিকাদের প্রধান পাঠ্যবস্তু ছিল বলিয়া মনে হয়। অসামান্য প্রতিভার স্বাক্ষর এগুলিতে পড়ে নাই—স্টাইলের বিশেষত্বও লক্ষণীয় নয়—কিন্তু অনুবাদকের অকুণ্ঠ নিষ্ঠা এবং অক্লান্ত শ্রম ইহাদের মধ্যে জাজ্জ্বল্যমান।

লং-প্র্যাট্ প্রভৃতির সহায়তায় মধুসূদন তৎকালীন আধুনিকতম ইয়োরোপীয় সুসাহিত্যের সহিত পরিচিত ছিলেন। তাঁহার অনুবাদের পরিধি বিস্ময়কর ডেনমার্কের হ্যান্স অ্যাণ্ডারসন হইতে আরম্ভ করিয়া

রাশিয়ার ক্রিলফ এবং ইংলণ্ডের টমাস ডে পর্য্যন্ত কেহই তাঁহার তালিকায় বাদ পড়েন নাই—এমন কি জাপানের দ্বারোম্মোচনকারী বিখ্যাত কমোডোর পেরীর চাঞ্চল্যকর জার্নাল হইতে তিনি "জেপান" রচনা করিয়াছেন। "Latest book habit"—মধুসূদনের ছিল। তাঁহার দৃষ্টি সদা-জাগ্রত থাকিত।

সর্ব্বপ্রথম তিনি 'হংসরূপি' রাজপুত্রদিগের 'বিবরণ' এবং 'মনোরমা' লইয়া যাত্রা আরম্ভ করেন—তাহার পর তাঁহার কাজ পূর্ণবেগে অগ্রসর হইতে থাকে। তাঁহার রচনার কিছু কিছু নমুনা উদ্ধৃত হইল।

"খর্ব্বকায়ার বিবরণে"র (১৮৫৮) কিয়দংশ এইরূপ :

"দৈবক্রমে সেইখান দিয়া এক গোবরিয়া পোকা যায়। খর্ব্ব-কায়ার সুকোমল মূর্ত্তি দেখিবা মাত্র সে নখর দ্বারা তাহাকে ছোঁ মারিয়া এক বৃক্ষে উড়িয়া বসিল। সবুজ পাতাটি স্রোতঃ মধ্যে ভাসিতে ভাসিতে বহু দূর গেল। পতঙ্গ প্রজাপতি তাহাতে দৃঢ়রূপে বাঁধা, সে অনেক চেষ্টা করিয়াও কোন প্রকারে খুলিতে পারিল না। সুতরাং পদ্মপত্রের সহিত তাহাকে ভাসিয়া যাইতে হইল।

গোবরিয়া পোকা খর্ব্বকায়াকে লইয়া বৃক্ষে বসাইতে সে যে ভয় পাইয়াছিল তাহা কি বলিব ; বিশেষতঃ পত্রে বদ্ধ শ্বেতবর্ণ প্রজাপতিটি বন্ধন খুলিতে না পারিলে ক্ষুধায় প্রাণ ত্যাগ করিবে ইহা ভাবিয়া সে আরও দুঃখিতা হইল। কিন্তু গোবরিয়া পোকার কোন চিন্তা নাই, সে ঐ বৃক্ষের এক বড় পাতার উপর খর্ব্বকায়ার এক পার্শ্বে বসিয়া পুষ্প হইতে মধু সঞ্চয় পূর্ব্বক তাহাকে খাইতে দিল এবং স্বজাতির বিপরীত স্বভাব হইলেও তাহাকে প্রশংসা করিয়া কহিল, তুমি দেখিতে বড় সুন্দর। কিয়ৎকাল পরে বৃক্ষবাসী তাবৎ গোবরিয়া পোকা তাহাদিগকে দেখিবার নিমিত্ত আইল। খর্ব্বকায়াকে নিরীক্ষণ করত তজ্জাতীয় স্ত্রীলোকসকল ঘৃণাতে আপনাপন দাড়া ফিরাইয়া বলিতে লাগিল কি দুঃখ ইহার দুইটি বই পা নাই। কেহ বা বলিল, ছি ছি, এর দাড়া নাই। অন্যে হাস্য করিয়া কহিল, ফুঃ এটার কোমর কি

সরু, এটা মানুষ নাকি? এরূপে খর্ব্বকায়া পরমা সুন্দরী হইলেও স্ত্রী গোবরিয়া পোকা সকলেই তাহাকে কুৎসিৎ বলিয়া নিন্দা করিলে সে পতঙ্গটি অগ্রে তাহার সৌন্দর্য্যে বিমুগ্ধ হইয়া তাহাকে লইয়া আসিয়াছিল, এক্ষণে সে আর তাহাকে গ্রহণে ইচ্ছুক হইল না।"

"চকমকির বাক্সের" (১৮৬৭) কাহিনীটি বিচিত্র—আরব্য রজনীর গল্পের কথা মনে পড়িয়া যায়। তাহার কিছু অংশ এইরূপ ঃ "পুনর্ব্বার ধন পাইয়া সিপাহীর বড়ই ধুমধাম হইল, এবং মনে মনে সর্ব্বদাই চিন্তা করিতে লাগিল, কি চমৎকার! রাজকন্যাকে কেহই কোন প্রকারে দেখিতে পায় নাই? লোকে বলে তিনি পরমা সুন্দরী, ভাল, গড়খাইয়ে চারিদিক বদ্ধ, তামার গড়ে যদি তাহাকে যাবজ্জীবন থাকিতে হইল তবে তাহার সৌন্দর্য্যের ফল কি? আমি কি কোন না কোন প্রকারে উহাকে দেখিতে পারি না? ভাল, আমার চকমকির বাক্সটা কোথায়? এই বলিয়া তাহাতে একটা ঠোকর মারিয়া দেখে যে পূর্ব্বোক্ত কঠোরার মত বড় বড় দুই চক্ষু বিশিষ্ট কুকুরটা আসিয়া উপস্থিত।

সিপাহী হৃষ্টচিত্তে কুকুরকে বলিল, যদিও এখন রাত্রি দুই প্রহর ঘোর অন্ধকার, অথাপি মুহূর্ত্তেকের নিমিত্তেও একবার রাজকন্যাকে দেখিতে আমার বড়ই বাসনা হয়।

কুকুর পবন বেগে দৌড়িয়া গিয়া এক নিমেষের মধ্যে কাথ্যাশুদ্ধ রাজকন্যাকে আনিয়া উপস্থিত করিল। তখনও সিপাহী চক্ষু পালটে নাই। কুকুরের পৃষ্ঠে নিদ্রাভিভূতা পরমা রূপসী রাজকন্যাকে দেখিয়া কাহার না বোধ হইবে তিনি যথার্থ রাজনন্দিনীই বটেন!

সিপাহী তাহার সৌন্দর্য্য অবলোকনে হতজ্ঞান হইয়া কতক্ষণ পর্য্যন্ত তাহার রূপ দেখিতে লাগিল। অনন্তর কুকুর দ্রুততর বেগে রাজকন্যাকে লইয়া পুনর্ব্বার সেই তামার গড়ের ভিতর স্থাপন করত স্বস্থানে প্রস্থান করিল।"

মধুসূদনের কোন কোন বইতে সুন্দর সুন্দর ছবিও ছিল। তাহাতে বইগুলির আকর্ষণ নিঃসন্দেহে বাড়িয়া গিয়াছিল।

"চীন দেশীয় বুলবুল পক্ষির বিবরণ" (১৮৫৭)-টিও অতি সুন্দর কাহিনী। বনের মধ্যে প্রকৃতির কোলে যে পাখিটি গান গাহিত—তাহাকে রাজসভায় লইয়া আসায় তাহার কণ্ঠ-মাধুর্য্য নষ্ট হহয়া গেল—সে আর গাহিতে পারিল না—ইহার অভ্যন্তরস্থ রূপকটি শিশুদের সীমা অতিক্রম করিয়া বয়স্কদের মর্ম্মস্পর্শ করে। "ক্রিলফের নীতি গল্প" বিখ্যাত রুশ লেখকের কয়েকটি গল্পের স্বচ্ছ অনুবাদ। রুশোর 'এমিল' (Emile) দ্বারা প্রভাবিত হইয়া টমাস ডে যে দীর্ঘ শিশুপাঠ্য কাহিনীমালা "Sandford and Marten" নামে রচনা করেন, মধুসূদন তাহারও কিছু অংশ "কথাতরঙ্গ" নামে প্রকাশ করিয়াছিলেন।

নিয়মিত অনুবাদের ফলে মধুসূদনের ভাষা যেমন সুন্দর ও হৃদয়-গ্রাহী হ য়া উঠিয়াছিল—পূর্ব্বে উদ্ধৃত অংশ দুইটি হইতেই তাহা বোঝা যায়। "কথাতরঙ্গে"র (১৮৬৭) একটি গল্পের ভাষা হইতেও তাহা সপ্রমাণ হইবে:

"একদা এক কৃষকের উদ্যানের এক পার্শ্বে কতকগুলি পিপীলিকার বাসা ছিল। বসন্ত কালের নির্ম্মল বায়ুতে তাহারা সমস্ত দিন পরিশ্রম করিয়া শস্য সকল বহন করত আপনাদিগের গর্ত্তে সঞ্চয় করিত। ঐ গর্ত্তের সন্নিকটে মল্লিকা, যুঁই, গোলাপ প্রভৃতি বিবিধ মনোহর ফুলের গাছ ছিল, বহুসংখ্যক মক্ষিকা তথায় নিয়ত যাইয়া গুণগুণ শব্দে ক্রীড়া করিত, এক পুষ্প হইতে পুষ্পান্তরে উড়িয়া বসিবার সময় তাহাদের অতিশয় আমোদ হইত। উদ্যানস্বামী কৃষকের একটি অল্প বয়স্ক পুত্র সর্ব্বদা উদ্যানে আসিয়া এই ক্ষুদ্র জীবদের ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্ম মন দিয়া দেখিত; একে বালক তাহাতে মূর্খ, বোধাধিকার হয় নাই বলিয়া একদিন সে কহিল, পিপীলিকাদের মত অজ্ঞান জন্তু আর কি আছে? বসন্ত ঋতু এমন সুখের কাল, এ কালে তাহারা মক্ষিকাদের

মত কোথায় আমোদ আহ্লাদ করিয়া সুখ সম্ভোগ করিবে, না সমস্ত দিন পরিশ্রম করিয়া কর্ম্ম করিতেছে; পৃথিবীতে যত ক্ষুদ্র জীব আছে, আমার বিবেচনায় মক্ষিকার তুল্য সুখী আর কোন জন্তু নাই।"

(পিপীলিকা ও মক্ষিকাগণ)

১৮৫৮ সালে গার্হস্থ্য গ্রন্থাবলীতে প্রকাশিত "বিচার" বইটিও মধুসূদনের বিশিষ্ট কীর্ত্তি। বইটি আয়তনে ছোট হইলেও ইহার অন্যবিধ গুরুত্ব আছে। ইংরাজী কোনো "Schoolboy story" হইতে এটি ভাবানুবাদ করা হইয়াছে। প্লটের বৈচিত্র্য লক্ষ্য করিবার মতো। দরিদ্র বিধবা হীরামণির মিঠাইয়ের দোকানে একটি ভাঙা লাটিম ছুড়িয়া ফেলিয়া দিয়া কেহ তাহার অনিষ্ট সাধন করে। স্কুলের ছাত্রদের মধ্যে কে এই অন্যায় কাজ করিয়াছে তাহা নির্দ্ধারণ করিবার জন্য স্কুলের অধ্যক্ষের নেতৃত্বে বিচার সভা বসে। নিরপরাধ অক্ষয় প্রথম অভিযুক্ত হয়—পরে প্রকৃত অপরাধী রাজকুমার ধরা পড়ে।

গল্পটি নীতিমূলক। তরুণ ছাত্রদের মধ্যে বুদ্ধির অভিনবত্ব—সদিচ্ছা, সাধুতা ইত্যাদি ইহাতে প্রদর্শিত হইয়াছে। কিন্তু এ সব সত্ত্বেও লেখাটির কাহিনীগত চমৎকার আকর্ষণ আছে, আগাগোড়া কৌতূহল সজাগ হইয়া থাকে। লেখার ভঙ্গিটি সরল, সরস এবং হৃদয়গ্রাহী। তাঁহার "অবোধ" (১৮৬০)-ও বালকদের পড়িবার পক্ষে একটি উৎকৃষ্ট বই।

মধুসূদনের রচনা যে কত জনপ্রিয় হইয়াছিল, তাহা তাঁহার "মনোরমা" এবং "হংসরূপি রাজকুমারের" দ্বিতীয় মুদ্রণের ভূমিকা হইতে জানা যায়: "যে মাসে ইহা প্রচারিত হয়, সেই মাসেই প্রায় শত পুস্তক বিক্রী হইয়া যায়। গ্রাহকবর্গের এইরূপ আগ্রহ দেখিয়া সম্পাদক মহাশয় সন্তুষ্টচিত্তে ঐ রূপ আরও কয়েক খানি গ্রন্থ অনুবাদ করিতে আমাকে অনুমতি করেন। তদনুসারে আমি……কয়েক

খানি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রন্থ ক্রমে ক্রমে অনুবাদ করিয়াছি। সমুদয় পুস্তকই দুই দুই সহস্র করিয়া মুদ্রিত হয়—"

ইহা হইতে মধুসূদনের তথা গার্হস্থ্য গ্রন্থমালার লোকপ্রিয়তার পরিমাপ করা যাইবে। সম্ভবতঃ অত্যন্ত অল্পমূল্য ছিল বলিয়াই এই জনাদর সম্ভব হইয়াছে, কিন্তু মধুসূদনের ব্যক্তিগত নৈপুণ্যের কথাও অস্বীকার করিলে চলিবে না।

অনুবাদকর্ম্মে মধুসূদন কী আদর্শ লইয়াছিলেন তাহাও তাঁহার লেখা হইতে জানা যায়ঃ "বস্তুতঃ কোন বিজাতীয় ভাষা হইতে অবিকল ভাষান্তর করিলে তাহার প্রণালী অবিকল সুসঙ্গত হওয়ার সম্ভাবনা নাই, উহা প্রধান প্রধান পণ্ডিতগণেরাও স্বীকার করিয়া থাকেন।" সেইজন্য প্রথম অনুবাদগুলির আড়ষ্টতা দেখিয়া পরে মধুসূদন নিজস্ব রীতির কতখানি উৎকর্ষ ঘটাইয়া ছিলেন, তাঁহার রচনার উদ্ধৃতির মধ্যেই তাহার প্রমাণ রহিয়াছে।

মধুসূদনের প্রচুর গ্রন্থ হইতে আর আলোচনা করিয়া লাভ নাই। বস্তুতঃ তাঁহার কৃতিত্বের নিরূপণ করিতে হইলে একখানি সম্পূর্ণ বই লিখিয়াই তাহা করা উচিত।

পুনর্ব্বার বলা যায় মধুসূদন মুখোপাধ্যায় মাত্র গার্হস্থ্য গ্রন্থাবলীরই প্রাণপুরুষ ছিলেন না; প্রথম যুগের শিশু-সাহিত্যে তিনিই প্রধানতম ব্যক্তিত্ব—তাঁহার পরিচয় আজ বিস্মৃতিতে বিলীন হইলেও ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে তাঁহার মহিমা আচ্ছন্ন হইয়া থাকিবে না।

রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন

মধুসূদনের পরই ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিত রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন স্মরণীয়। অনুবাদের কার্য্যে তিনিও যে বিশেষ কৃতিত্ব অর্জ্জন করিয়াছিলেন, 'পাল ও বর্জ্জিনিয়ায়' প্র্যাটের মুখবন্ধ হইতে তাহা জানিতে পারিঃ

"The translation of the work was ensigned to a

wellknown scholar (Pandit Ramnarayan Vidyaratna) who had been frequently entrusted with work of this kind before."

"Frequently entrusted" হইতেই বোঝা যায় অনুবাদক হিসাবে পূর্ব্ব হইতেই রামনারায়ণের খ্যাতি ও জনপ্রিয়তা বিদ্যমান ছিল।

অনুবাদক সমাজের কাজে হস্তক্ষেপ করার আগেই রামনারায়ণ যে ইংরাজী হইতে গ্রন্থাদি বাংলায় অনুবাদ করিতে ছিলেন, তাহার প্রমাণ **সত্যচন্দ্রোদয় (১৮৫৪)**। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সাহেবেরাই এই কাজে তাঁহাকে প্রেরণা দিয়াছিলেন। 'সত্যচন্দ্রোদয়ে'র নামপত্রে আছে: "মনোরঞ্জন নীতিগর্ভ উপন্যাস—ইংরাজি হইতে—শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্ন কর্ত্তৃক বঙ্গভাষায় সঙ্কলিত—শ্রীযুক্ত ডবলিউ এন লীজ মহোদয়—কর্ত্তৃক প্রচারিত।"

৮৯ পৃষ্ঠার এই বইখানির ঐতিহাসিক গৌরব আছে বলিয়া মনে করি। ইহাই বাংলা সাহিত্যে—ভাবানুবাদের মাধ্যমে হইলেও প্রথম শিশুপাঠ্য উপন্যাস।

বিজ্ঞাপনে 'গ্রন্থ রচনার' উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বলা হইয়াছে:

"সন্তান সত্যবাদী হওয়া পিতামাতার মুখ উজ্জ্বল ও লোকসমাজে সাতিশয় অনুরাগ হইবার বিষয়। কিন্তু মিথ্যাবাদী হইলে, তাহাদের লজ্জায় মুখতোলা ভার ও যাহার পর নাই লোকে বিরাগ ভাজন হইয়া উঠে। এতদ্ব্যতীত সন্তান মানবজাতির কলঙ্ক ও অসম্ভ্রমের প্রধান কারণ হয়। সত্য, যেমন লোকের হিতার্থে বক্তব্য তেম্‌নি ঈশ্বরাজ্ঞাবোধেও তৎপালন করা কর্ত্তব্য। সেই অবশ্যকর্ত্তব্য পরমধর্ম্মরূপ সত্যের বীজ, শিশুগণের হৃদয়ক্ষেত্রে বপন করিবার উদ্দেশ্যেই এই ক্ষুদ্র গ্রন্থটি প্রস্তুত হইল।"

কিন্তু আক্ষরিক অনুবাদ নয়। "ইহা অবিকল সর্ব্বাংশেই না হউক, কিন্তু স্থূল স্থূল গল্পগুলি, এক ইংরাজি উপন্যাস হইতে সঙ্কলিত হইয়াছে

এবং বঙ্গদেশীয় শিশু পাঠকবর্গের চিত্তরঞ্জক ও বোধগম্য করিবার জন্য, কিঞ্চিন্মাত্রও প্রযত্নের ক্রুটি করা হয় নাই। যে সমুদায় ঘটনা এই উপন্যাসের অন্তর্গত, বর্দ্ধমান নগরকেই তত্তাবতের স্থান বলিয়া কল্পনা করা গিয়াছে। আর ইহাতে যে২ ব্যক্তি উল্লিখিত আছে সে সকলকেই ভারতীয় বলিয়া ব্যক্ত করা হইয়াছে—"

গল্পটি কিছু জটিল। সংক্ষেপে এইভাবে মোটামুটি বর্ণনা করা যাইতে পারে:

অনাথপ্রিয় নামে কাশ্মীরদেশীয় জনৈক শিল্পী বর্দ্ধমান-নৃপতি প্রতাপচন্দ্রের নিকট আসিয়া নিজগুণে রাজার নিকট প্রতিষ্ঠালাভ করেন এবং একটি সুরম্য গৃহ ও উদ্যান বাসের জন্য পান। অনাথপ্রিয় এবং তাঁহার স্ত্রী করুণাময়ীর কোন সন্তান-সন্ততি ছিল না। তাঁহারা তিনটি অনাথ বালক বালিকাকে স্বগৃহে আনিয়া অপত্যস্নেহে লালিতপালিত করিতে থাকেন। ইহারা হইল বিশ্ববল্লভ, সুশীলা ও দুর্বিনীত। এই তিনজনের মধ্যে যমজ ভ্রাতা-ভগ্নী বিশ্ববল্লভ ও সুশীলা ছিল সম্পর্কে অনাথপ্রিয়ের কুটুম্ব, বালক দুর্বিনীত সম্পর্কের দিক হইতে কেহ নয়। তিন জনেই মাতাপিতৃহীন।

দুর্বিনীতের কোনো শিক্ষা-দীক্ষা হয় নাই—তাহার চরিত্রও ছিল মন্দ। তাই নিজে একটি গুরুতর অন্যায় করিয়া সে তাহা বিশ্ববল্লভের স্কন্ধে চাপাইয়া দেয় এবং অবস্থাক্রমে বিশ্ববল্লভকেই অপরাধী সাব্যস্ত হইয়া দণ্ডিত হইতে হয়। কিন্তু জনৈক তিনকড়ি ব্যাপারটি জানিত, সুযোগ পাইয়া সে দুর্বিনীতকে 'ব্ল্যাকমেল' করিতে আরম্ভ করে। এক মিথ্যাকে ঢাকিবার জন্য দুর্বিনীতকে ক্রমেই অধঃপতনের মধ্যে নামিয়া যাইতে হয়, পয়সা দিয়া তিনকড়ির মুখবন্ধ করিবার জন্য সে চুরি করিতে বাধ্য হয়।

অবশ্য পরে যথাসময়ে সত্য প্রকাশ পায়। অনাথপ্রিয় দুর্বিনীতকে কঠিন শাস্তি দিবার উপক্রম করিলে, বিশ্ববল্লভ চিত্তমহত্ত্ব দেখাইয়া দুর্বিনীতের জন্য ক্ষমা অর্জ্জন করে।

গল্পটির একটি উপক্রমণিকা আছে। পাটনার রাজা বিশ্বপতির দত্তকপুত্র সুবিনয়ের ক্রীড়াপ্রীতি ও কুক্রিয়াসক্ত মতির পরিবর্তন ঘটাইবার জন্যই কাশীবাসী আচার্য্য ধীমান গল্পটি বর্ণনা করিয়াছিলেন।

অল্প আয়তনের মধ্যে অধিক জটিলতা আসিয়া পড়ায় উপন্যাসের আকর্ষণ কমিয়া গিয়াছে। তথাপি পড়িতে ভালোই লাগে। ভাষা মোটের উপর সাবলীল :

"ভাগীরথী তীরে পাটনা নামে এক নগরী আছে, তথায় বিশ্বপতি নামা এক ধর্ম্মপরায়ণ ভূপতি ছিলেন। তিনি অতিশয় দয়ালু এবং গুণবান ছিলেন। কিন্তু নিঃসন্তান ছিলেন। অনন্তর তিনি একটি জাতমাত্রপুত্র কুটুম্বের নিকট হইতে দত্তক গ্রহণ করেন। রাজা তাহার নাম রাখেন সুবিনয়। সুবিনয় পাঠে মন দিত না। শুধু কুসংসর্গে ক্রীড়ায় সময় অতিবাহিত করিত। নীতিশাস্ত্রে কথিত আছে 'যেমন সংসর্গ তদনুরূপ দোষগুণ অবশ্যই হইয়া থাকে।' যাহা হউক তাদৃশ কুসংসর্গ প্রভাবে সুবিনয়ের ক্রমে ক্রমে সত্যে অনাস্থা ও মিথ্যায় আসক্তি প্রকাশ পাইতে লাগিল। তাহা দেখিয়া ভূপতি এককালে বিষাদ সমুদ্রে মগ্ন হইতে লাগিলেন।"

রামনারায়ণের অনুরূপ দ্বিতীয় উপন্যাস **"গোপাল-কামিনী"** (১৮৫৬)। এখানিও ইংরাজি হইতে সঙ্কলিত। "মনোরঞ্জন নীতিগর্ভ উপন্যাস—উইলিয়ম নস্‌সা, লীজ মহোদয়ের সহায়তায় প্রচারিত।" উদ্দেশ্য "মনোহরভাবে" বালকদিগকে শিক্ষা দেওয়া : "ভারতীয় যুবকহিতৈষি মহাশয়দিগেরও কর্ত্তব্য যে, বালকগণের পাঠোপযোগি বাঙ্গলা পুস্তক সকলের মধ্যে কোন পুস্তক সামান্যরূপ হইয়াও যদি মনোহর করিবার অভিপ্রায়ে প্রস্তুত করা হয়, তবে তাহাতে তাঁহারা সন্তোষের সহিত সমাদর প্রকাশ করেন।"

এই অভিপ্রায়েই রামনারায়ণ বইখানি রচনা করিয়াছেন। ইংরাজির ভিত্তি থাকিলেও রামনারায়ণ ইহাকে প্রায় মৌলিক বলিয়াই দাবি করিয়াছেন : "ইহার গল্পটি কোন পুস্তক হইতে সংগৃহীত এ

কথা না বলিলেও বলা যায়। কারণ ইহাতে কিঞ্চিন্মাত্র আভাস বই আর কিছুই উদ্ধৃত করা যায় নাই। গল্পটি মনোহর করিবার জন্য যথাসাধ্য যত্ন করা গিয়াছে এবং উত্তম২ নীতি প্রবেশিত করিতে ক্রুটি করা যায় নাই।"

"গোপাল-কামিনী"র রচনা "সত্যচন্দ্রোদয়" হইতে আরো কিছু উন্নত—গল্পটিও সুনির্ব্বাচিত। ইহারও একটি মুখবন্ধ আছে। কৃষ্ণনগরের ধনপতি নামক বণিক তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীদত্তকে উৎসাহ দিবার জন্য "গোপাল-কামিনী"র উপাখ্যান শুনাইয়াছিলেন।

গল্পটি কৃষ্ণনগরেরই। নিত্যানন্দ ঘোষ নামে জনৈক দরিদ্র গোপকে উপযুক্ত পুত্রেরা ছাড়িয়া চলিয়া গেল, কন্যারা গেল শ্বশুরালয়ে। রহিল বৃদ্ধ মাতা, সস্ত্রীক নিতাই ঘোষ এবং তাহার দুই যমজ সন্তান গোপাল নামে পুত্র ও কামিনী নামে কন্যা। রামনারায়ণের যমজ-ভ্রাতাভগ্নীর সম্পর্কে কিছু মোহ ছিল—'সত্যচন্দ্রোদয়ে'ও তাহা দেখিতে পাই।

যাহা হউক বারো বৎসর বয়সে দুইটি ভাইবোনের মনে হইল, দরিদ্র সংসারের অভাব দূর করিবার জন্য তাহাদের কিছু আয় করা আবশ্যক। তাহারা বিদেশে অর্থাগমের জন্য যাইতে চাহিলে বাপ-মা কান্নাকাটি আরম্ভ করিলেন। কিন্তু ঠাকুরমা আশীর্ব্বাদ করিয়া উপদেশ দিলেন: "তোমরা অতি সাবধানে থাকিবে। আপনাদের মনকে ধৈর্য্যযুক্ত সাহসে দৃঢ় করিবে। পরমেশ্বরে আস্থা করিবে। ধর্ম্মপথের পথিক হইবে। বিপদে পড়িলে তাঁহাকে ভুলিবে না। কেবল সত্য বাক্য কহিবে" ইত্যাদি।

এই উপদেশ লইয়া গোপাল ও কামিনী বাহির হইল এবং নানা বিপদ আপদ পার হইয়া কলিকাতায় পৌঁছিয়া এক ধনীগৃহে আশ্রয় পাইল। সেখানে গোপাল মালীর কাজ করিত। দৈবক্রমে একখানি একশো টাকার নোটের ব্যাপারে নিরীহ সত্যসন্ধ গোপাল মিথ্যা চুরির দায়ে অভিযুক্ত হয় ও পুলিশী নির্য্যাতন ভোগ করে। কামিনীর চেষ্টায় ও সততায় তাহার দোষমুক্তি ঘটে। ধনী ব্যক্তিটি তাহাদের সাধুতায়

সন্তুষ্ট হন, প্রচুর অর্থ ও সু-বাসস্থান দেন এবং ভালো বিবাহের ব্যবস্থাও করেন। গোপাল ও কামিনীর মাতা-পিতা-পিতামহী তাহাদের অর্থ-সাহায্য পাইয়া জীবনের অবশিষ্ট কাল সুখে যাপন করে।

রচনা-ভঙ্গিতে 'গোপাল কামিনী' 'সত্যচন্দ্রোদয়' অপেক্ষা উৎকৃষ্ট, ভাষা আরও সুন্দর ও গতিশীল হইয়াছে। নীতির প্রাধান্য থাকিলেও সরল গল্পটি আকর্ষণীয়। পুলিশী উৎপীড়নের বেশ বাস্তবধর্ম্মী চিত্র আছে :

"জমাদার ও বরকন্দাজেরা দারোগার আজ্ঞা পাইয়া গোপালকে কিয়দ্দূর অন্তরে লইয়া গিয়া নানাপ্রকার কটু ভাষায় গালি দিয়া দেখিল যে, সে চুরির কথা কোন রূপেই মানিল না। তখন জমাদার একজন বরকন্দাজকে কহিল, 'যা ত, ঐ ঘরের পেছন থেকে বিচুটি ও আলকুশী লইয়া আয়, এবং একটা ঘুরঘুরা পোকা ধরিয়া দে।

বেটাকে হাতে পায়ে বাঁধিয়া গায়ে বিচুটী মাখাইয়া দি এবং নাভিতে ঘুরঘুরা রাখিয়া মালা চাপা দিয়া বাঁধিয়া রাখি। দেখি ইহার কতদূর পর্য্যন্ত দৌড়।"

এগুলি ছাড়াও রামনারায়ণ গার্হস্থ্য গ্রন্থালীরও অন্যতম লেখক ছিলেন। ১৮৫৮ সালে তাঁহার 'এলিজিবেথ' প্রকাশিত হয় Exiles of Siberia অবলম্বনে। 'পাল ও বর্জিনিয়ার' উল্লেখ পূর্ব্বেই করিয়াছি। ১৮৬১ সালে বিষ্ণুশর্ম্মাকৃত পঞ্চ-তন্ত্রের শেষ তিন তন্ত্রকে **হিতকথাবলী** নামে তিনি অনুবাদ করেন। ইহার বিজ্ঞাপনে বঙ্গানুবাদ সমাজাধ্যক্ষ ই, বি কাউয়েল জানাইয়াছেন—ইয়োরোপেও বহু সমাদৃত 'পঞ্চতন্ত্রের শেষ তিন তন্ত্র' অশ্লীলাংশ পরিত্যাগ করিয়া সংক্ষেপে অনুবাদ করানো হইয়াছে।

অনুবাদ ভালোই। 'কাক-পেচক-সংবাদ' হইতে কিছু উদ্ধৃত করা হইল :

"সচিবেরা কহিলেন, 'মহারাজ, আপনকার এ সময়ে এ প্রকার প্রশ্ন করা অতি উপযুক্ত হইয়াছে। আমরা আপনার বহু কালের মন্ত্রী।

উপস্থিত বিষয়ে যাহা সুমন্ত্রণা হইবেক তাহা প্রমাণ করিতে কদাচই ক্রুটি করিব না। আপনি প্রশ্ন করিতেছেন, আমরা যথামতি সৎপরামর্শ দিতে অবশ্যই যত্ন করিব, সন্দেহ নাই। রাজা কোন বিষয় জিজ্ঞাসা না করিলেও মন্ত্রীদিগের কর্ত্তব্য যে তাঁহারা কার্য্যের সময়ে তাঁহাকে সৎপরামর্শ প্রদান করেন। সম্প্রতি আপনি গাত্রোত্থান করুন এবং চলুন, কোন নির্জ্জন স্থানে গিয়া এ বিষয়ের একটা সুমন্ত্রণা করা যাউক।”

রামনারায়ণের **‘নানকের জীবন-চরিত’** গার্হস্থ্য গ্রন্থমালার অন্তর্ভুক্ত হইয়া ১৮৬৫ সালে প্রকাশিত হয়। বইটি আয়তনে ক্ষুদ্র—পত্রসংখ্যা মাত্র ২৮। কিন্তু সুরচিত।

মূল লেখক আর, এন, কষ্ট্ বহুকাল পাঞ্জাবের বিচারপতি ছিলেন। তিনি নানক সম্বন্ধে কৌতূহলী হইয়া বহু পরিশ্রমে এই বইখানির উপকরণ সংগ্রহ করেন। বইখানির বিশেষ কৃতিত্ব এই যে এই খানিই নানকের প্রথম জীবন-চরিত।

‘মান্যবর শ্রীযুক্ত লিটনকার মহোদয়ের’ প্রস্তাব অনুযায়ী রামনারায়ণ বইখানির অনুবাদ করিয়াছেন। অনুবাদ মনোহর—রামনারায়ণের কৃতিত্ব বেশ প্রকাশ পাইয়াছে। কেবল জীবন কাহিনীই এটি নয়—কয়েকটি সুন্দর সুন্দর ঘটনাও আছে—যদিও তাহাদের দুই একটি অলৌকিক।

নানক সর্বধর্ম্ম-সমন্বয়ের প্রবক্তা ছিলেন। তাঁহাকে পরীক্ষার নিমিত্ত নবাব আদেশ করেন, তুমি আমার সঙ্গে মসজিদে গিয়া নমাজ পড়িবে। নানক বিনা প্রতিবাদে তৎক্ষণাৎ সম্মত হইলেন।

“উপাসনার সময় সকলেই ভূমিতে নতজানু হইয়া উপাসনা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। নানক কেবল একাকী দণ্ডায়মান থাকিলেন। ইহাতে নবাব প্রতিবাদী হইলে তিনি তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ‘নবাব সাহিব, আপনি ত উপাসনা করিতেছিলেন না, আপনি কেবল কান্দাহারে অশ্ব ক্রয় ব্যাপারের চিন্তায় মগ্ন ছিলেন।’

নবাব অতি সরল ও সত্যপ্রিয় ব্যক্তি ছিলেন। সেই বাক্য শ্রবণে স্পষ্টই স্বীকার করিলেন যে তাঁহার অন্তঃকরণ তৎকালে যথার্থই ভ্রমণ করিতেছিল। অনন্তর কাজী, নানককে তাঁহার সহিত উপাসনা না করিবার কারণ জিজ্ঞাসা করায় তিনি তদুত্তরে কহিলেন, 'কাজী সাহিব, তুমি ত উপাসনায় রত ছিলে না, তুমি কেবল আপন কন্যার পীড়া এবং কূপমধ্যে পতিত একটি জলপাত্রের বিষয়ে ভাবিতেছিলে।' এইকথা শুনিবামাত্র কাজী সাহেবের মুখ শুষ্ক হইয়া উঠিল, কাজে কাজেই তাঁহাকে স্বীকার করিতে হইল যে গুরু নানক তাঁহার মনোগত ভাব যথার্থই বুঝিতে পারিয়াছেন।"

ছোট হইলেও বইখানি ভালো। ছেলেমেয়েদের হাতে যেমন তুলিয়া দেওয়া যায়, তেমনি বড়রাও পড়িলে খুশী হইবেন।

অদ্ভুত ইতিহাস—এই সাধারণ নামে রামনারায়ণ আরো দুইখানি বইয়ের অনুবাদ করিয়াছিলেন—"তৈমুরলঙ্গ বৃত্তান্ত' (১৮৫৬) এবং 'সিকন্দর সাহের দিগ্বিজয়' (১৮৬০)। এই দুখানি অনুবাদও সুন্দর—ইতিহাস থাকিলেও গল্পই ইহাদের প্রধান আকর্ষণ।

রামনারায়ণ 'বিবিধার্থ সংগ্রহের'ও লেখক ছিলেন। রা-না-বি নামে চিহ্নিত তাঁহার কয়েকটী রচনাই উহাতে পাওয়া যায়। Gulliver's Travels-এর যে ধারাবাহিক অনুবাদ **'গালিবরের ভ্রমণ বৃত্তান্ত'** নামে নিয়মিত প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহার তলায় রা-না-বি দেখিয়া বোঝা যায় উহাও রামনারায়ণেরই কৃত। তবে বইখানি গ্রন্থাকারে মুদ্রিত হইয়াছিল কিনা জানা যায় না।

॥ ৩ ॥

অন্যান্য—

গার্হস্থ্য গ্রন্থমালায় প্রকাশিত **"মনোরম্য পাঠ"** একখানি উল্লেখ-যোগ্য গ্রন্থ। ১৮৫৭ সালে "পার্সি এনেকডোটস্‌" নামক ইংরাজি গ্রন্থের সার সংগ্রহ পূর্ব্বক বাঙ্গালা ভাষায় ইহার প্রথম ভাগ অনূদিত হয়। দুইভাগে গ্রন্থটি প্রকাশিত হইয়াছিল। অনুবাদকের নাম নাই। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 'সাহিত্য-সাধকচরিতমালায়' ইহাকে রামচন্দ্র মিত্রের বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন।

ইহাও উপদেশপূর্ণ এবং কাহিনীগুলি সুনির্ব্বাচিত। বইখানি পাঠ্যগ্রন্থ রূপেই কল্পিত হইয়াছিল মনে হয়। ভূমিকাতে বলা হইতেছেঃ 'অনেকে বিদ্যালয় মধ্যে অবাস্তবিক অদ্ভুত গল্প পাঠনাই মনোনীত করিয়া থাকেন; কিন্তু স্বরূপ বিবেচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্টই প্রতীতি হইবে, যে করুণাময় বিশ্বনিয়ন্তার বিশ্বকাণ্ড সম্বন্ধীয় প্রকৃত বিষয়ের পাঠনাই তদপেক্ষা বিশেষ শুভদায়িনী, তাহার কোন সন্দেহ নাই।" এই 'প্রকৃত পাঠনা'র নিদর্শন স্বরূপ একটি উদ্ধৃত হইল:

'অদ্ভুত চোর ধরা

ইংলণ্ড দেশীয় একজন ভদ্রলোক ফ্রান্সের সেণ্ট জর্ণস্‌ নগরে স্বীয় প্রিয় কুকুরের সহিত এক উদ্যান দর্শন করিতে গমন করিলেন কিন্তু উদ্যান রক্ষকেরা ঐ কুকুরকে তন্মধ্যে লইয়া যাইতে নিষেধ করিলে তিনি কুকুরকে প্রহারিদিগের নিকট দ্বারে রাখিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন। কিয়ৎকাল পরে প্রত্যাবর্তন পূর্ব্বক ঐ রক্ষকদিগকে কহিলেন যে আমার ঘটিকাযন্ত্র অপহৃত হইয়াছে; অতএব কুকুরকে উদ্যানমধ্যে প্রবেশ করিতে দিলে, তস্কর ধৃত হইতে পারিবে। প্রধান

রক্ষক সে বিষয় স্বীকার করাতে, তিনি কুকুরকে অপহৃত বস্তুর বিষয় ইঙ্গিত দ্বারা বুঝাইলেন, তাহাতে যে তৎক্ষণাৎ উদ্যানে প্রবেশপূর্ব্বক সকলের মধ্যে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিল। অবশেষে সে এক ব্যক্তিকে ধৃত করাতে তাহার প্রভু বলিলেন, সে ইহার নিকটেই আমার ঘড়ী আছে। পরে অনুসন্ধান করাতে ঐ ব্যক্তির জেব হইতে ঐ ঘড়ী এবং আর ছয়টি ঘড়ী বাহির হইল। ইহাতে আরো আশ্চর্য্যের বিষয় এই ঐ কুকুরের এমত বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা ছিল যে সে আপন প্রভুর ঘড়ী অন্যান্য ছয়টা হইতে বাছিয়া তাহার নিকট লইয়া গেল।"

আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ তৎকালে খ্যাতনামা পণ্ডিত ছিলেন— বহু সংস্কৃত-গ্রন্থের সম্পাদনায় তিনি কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার পুত্র জ্ঞানচন্দ্র ভট্টাচার্য্য বালককালে রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাগুরু ছিলেন।

সংস্কৃত গল্প-সাহিত্যের "কথা সরিৎ সাগর" হইতে সংক্ষিপ্ত, শিষ্ট ও পরিমার্জ্জিত করিয়া তিনি দুই খণ্ডে একখানি সুন্দর বই রচনা করেন—**'বৃহৎকথা' (১৮৫৬)**। গার্হস্থ্য গ্রন্থমালার এই বইখানি নিজগুণে অসাধারণ জনপ্রিয় হইয়াছিল। 'দ্বিতীয় বারের বিজ্ঞাপনে' (১৮৫৭) মধুসূদন মুখোপাধ্যায় সানন্দে লিখিতেছেন: "প্রথম বার ইহা সহস্র খণ্ড মুদ্রিত হয়। এক বৎসরকাল পরিপূর্ণ না হইতেই সেই সহস্র খণ্ড প্রায় সমুদায় বিক্রীত হইয়াছে দেখিয়া অনুবাদক সমাজের অধ্যক্ষেরা গ্রাহকগণের আগ্রহাতিশয়ে আহ্লাদপূর্ব্বক পুনর্ব্বার এক সহস্র খণ্ড পুস্তক মুদ্রিত করিতে আদেশ করেন।"

আনন্দচন্দ্র তাঁহার প্রথম সংস্করণের 'বিজ্ঞাপনে' জানাইয়াছেন: "অশ্লীল ও অলৌকিক ভাগ পরিত্যাগ করিয়া কেবল নীতিবিষয়ক মনোহর গল্প সকল গ্রহণ করা হইয়াছে।"

আনন্দচন্দ্রের রচনা উচ্চশ্রেণীর—বিদ্যাসাগরের মতো ভাষায় ছন্দের সুষমা এবং গম্ভীর-মাধুর্য্য আছে। নমুনাস্বরূপ "শিবি রাজার উপাখ্যান" হইতে কিছু উদ্ধৃত হইল:

"পূর্ব্বকালে মহাতপস্বী, করুণাপরায়ণ, দাতা, শিবি নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহাকে প্রবঞ্চনা করিবার নিমিত্তে একদা ইন্দ্র স্বয়ং শ্যেন পক্ষী রূপ ধরিয়া মায়া-কপোতরূপ-ধারী ধর্ম্মকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইলে ঐ কপোত অতিশয় ভীত হইয়া শিবিরাজার ক্রোড়ে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহাতে শ্যেন মনুষ্য ভাষায় রাজাকে সম্বোধন করিয়া কহিল, মহারাজা, আমি ক্ষুধায় কাতর হইয়াছি; অতএব আমার ভক্ষ্য ঐ কপোতকে পরিত্যাগ কর, নতুবা আমি ক্ষুধায় এখনই প্রাণত্যাগ করিব, তাহাতে তোমার অত্যন্ত অধর্ম্ম হইবে। ইহাতে শিবি কহিলেন, এ আমার শরণাগত, অতএব ইহাকে পরিত্যাগ করিতে পারিব না। বরং তোমাকে এই কপোত পরিমাণ অন্য মাংস প্রদান করি। ইহা শুনিয়া শ্যেন উত্তর করিল, মহারাজ, অন্য মাংসে আমার তৃপ্তি হইবে না, তবে যদি এই কপোত পরিমাণ তোমার গাত্র মাংস প্রদান কর, তাহা হইলে স্বীকার করিতে পারি।"

উৎকৃষ্ট শিশুপাঠ্য হিসাবে বইখানি স্মরণযোগ্য।

"রহস্য সন্দর্ভ" পত্রিকা—

ভার্ণাক্যুলার লিটারেচার কমিটির মুখপত্র "বিবিধার্থ সংগ্রহ" বন্ধ হইয়া গেলে তাহার শূন্যস্থান পূরণ করিবার জন্য "রহস্য সন্দর্ভ" পত্রিকার আবির্ভাব হয় কিছুকাল পরে। ইহার প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয় মাঘ, সম্বৎ ১৯১৯—অর্থাৎ ১৮৬৩ সালে। ইহাও রাজেন্দ্রলাল মিত্রের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়, পরে প্রাণধন দত্ত সম্পাদনার দায়িত্ব লন। সপ্তম পর্ব্বের পর নব পর্ব্বাবলী বারো খণ্ড বাহির হইয়া ১২৮০ সালের চৈত্রে (মার্চ, ১৮৭৬) ইহা বন্ধ হইয়া যায়।

'রহস্য সন্দর্ভ'ও 'বিবিধার্থ সংগ্রহের' পদ্ধতিতেই পরিকল্পিত। আকারে, রচনাবিষয়ে, চিত্রবাহুল্যে, বৈজ্ঞানিক মননশীলতায় এবং শিশু-বৃদ্ধ-নরনারী সকলের মনোরঞ্জনের দিক হইতে ইহা বহুলাংশে তরুণ পাঠ্যতার স্থান গ্রহণ করিয়াছিল। ইহার প্রথম পর্ব্বের সূচীপত্র

(মাঘ ১৯১৯ সং—পৌষ ১৯২০সং) দেখিলেই ইহার বৈশিষ্ট্য অনুভূত হইবে। কয়েকটি বিষয় উদ্ধৃত হইল ঃ

অদ্ভুত অলঙ্কার, অপূর্ব্ব ভূতের গল্প, অরণ্য কাহিনী (একটি ধারাবাহিক উপন্যাস), অষ্ট্রেলীয় মনুষ্য, উৎকল বর্ণন, কুলদীপ সিংহ (দেশাচার ও শৌর্য্যমূলক চমৎকার সত্য গল্প), গ্রীণলণ্ডের বৃত্তান্ত, চীনের ভোজবাজী, নৈষধচরিত, বার্মিয়ান নগরের বুদ্ধমূর্ত্তি, বিলাতি ঠক, মস্তিষ্ক, শ্লোথপশু, সুবিখ্যাত সিসিস্ত্রিস্ রাজা, হিন্দু মহিলাদিগের হীন অবস্থা—ইত্যাদি।

বাংলাদেশের কোন মাসিক পত্রে ধারাবাহিক মৌলিক উপন্যাস সম্ভবতঃ সর্ব্বপ্রথম 'রহস্য সন্দর্ভে'ই প্রকাশিত হয়। 'অরণ্য কাহিনী'ই এই উপন্যাস। ইহা ছাড়া 'বিবিধার্থ সংগ্রহে' পুস্তক সমালোচনার যে রীতি প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, ইহাতে তাহা পূর্ণতা লাভ করিয়াছে।

রঙ্গলালের 'কর্ম্মদেবী', দীনবন্ধুর 'নবীন তপস্বিনী নাটক' প্রভৃতি নানা প্রসিদ্ধ গ্রন্থের মূল্যবান সমালোচনা ইহাতে লভ্য। ইহার রচনা-পদ্ধতি 'বিবিধার্থ সংগ্রহ' অপেক্ষা কিছু বয়স্ক। কিন্তু ব্যাপক শিক্ষা বিস্তারের যে মহান সংকল্প লইয়া স্কুলবুক সোসাইটি ও ভার্ণাকুলার লিটারেচার কমিটি অগ্রসর হইয়াছিলেন, তাহারই অঙ্গস্বরূপ ইহাতে চমৎকার সর্ব্বাঙ্গীণতা রহিয়াছে। শিক্ষা ও আনন্দলাভের দিক হইতে এই পত্রিকাখানিরও মূল্য অসামান্য। "পারস্য দেশীয় স্ত্রীদিগের রীতি ও নীতি" প্রমুখ দুই একটি রচনা ছাড়া অধিকাংশই বালকদের পড়িতে দেওয়া যায়।

মধ্যে মধ্যে কবিতাও আছে। কাউপারের "A Comparison" কবিতাটিকে এই ভাবে অনুবাদ করা হইয়াছে ঃ

নদী ও কালের সমতা

নদী আর কালগতি একই প্রমাণ।
অস্থির প্রবাহে করে উভয়ে প্রয়াণ॥
ধীরে ধীরে নীরব গমনে গত হয়।
কিবা ধনে কি স্তবনে ক্ষণেব না রয়॥
উভয়েই গত হল্যে আর নাহি ফেরে।
দুস্তর সাগর শেষে গ্রাসে উভয়েরে॥
সর্ব্ব অংশে একরূপ যদিও উভয়।
চিন্তারত চিত্তে এক ভেদজ্ঞান হয়॥
বিফলে না বহে নদী ; যথা নদী ভরা।
নানা শস্য শিরোরত্নে হাস্যময়ী ধরা॥
কিন্তু কাল সদাত্মা ক্ষেত্রের শোভাকর।
উপেক্ষায় রেখ্যে যায় মরু ঘোরতর॥ (৯ম খণ্ড, পৃ১৪০)

অষ্ট্রেলীয়দের বিবাহ-পদ্ধতির কিছু অংশের বর্ণনা এইরূপ ঃ

"যে দল হইতে কন্যা অপহৃত হয় তাহার লোকেরা মহাসমারোহে বৈর-নির্য্যাতনে উদ্যত হয়, এবং উভয় দলে তুমুল যুদ্ধের আয়োজন হয়, কিন্তু বিপক্ষদল সম্মুখ-সংগ্রামে উপস্থিত হইলে, বর আপন দল হইতে নিঃসৃত হওত নিজকৃত অপরাধের দণ্ড লইতে স্বীকার করে। তখন কন্যার দলের প্রধান প্রধান দুই চারি ব্যক্তি আসিয়া ঐ বরের প্রতি বল্‌হম নিক্ষেপ করিতে থাকে ও বর ঐ বল্‌হম কাষ্ঠ ঢালে অবরুদ্ধ করে। এই প্রকার যুদ্ধ হইতে বর উদ্ধার পাইলে পরে ক্রমশঃ দুই তিন ব্যক্তি যষ্টি লইয়া বরের সহিত যুদ্ধ করে, তাহাতেও বর জয়ী হইলে সমবেত উভয় দলে তাহার জয়ধ্বনি করিয়া পরে নৃত্যগীতাদি আনন্দ-উৎসবে সকলে নিমগ্ন হয়।" (১২ খণ্ড; ১৮২—৮৩ পৃঃ)

প্রবন্ধের শেষে সরস মন্তব্য ঃ "বঙ্গদেশে এ প্রকার নিয়ম থাকিলে

বালকদিগের বিবাহের কথা দূরে থাকুক পূর্ণ বয়স্কদের বিবাহ হইত কিনা, ইহা আমাদিগের অত্যন্ত সন্দেহাস্পদ। আতবতণ্ডুলাহারী নস্যপ্রিয় শাস্ত্রালাপী পণ্ডিতেরা প্রস্তাবিত অষ্ট্রেলীয়দিগের আচার অবলম্বন করিলে চিরকাল অনূঢ়াবস্থায় যাপন করিতেন সন্দেহ নাই।"

"অবৈধ নিষ্ঠা" প্রসঙ্গে ইয়োরোপীয়দের ভৌতিক বিশ্বাসের উপর সকৌতুক কটাক্ষ রাজেন্দ্রলালের মুক্তবুদ্ধি বৈজ্ঞানিক মনোভাবের পরিচয় বহন করে ঃ

"কাথোলিক খ্রীষ্টিয়ানদিগের ধর্ম্মমতে বসন্ত কালের এক রবিবারে গির্জ্জায় খর্জ্জুর পত্র প্রদান করিতে হয়, এবং পাদরীরা সেই খর্জ্জুর পত্রে শান্তিজল নিক্ষেপ করে। ঐ প্রযুক্ত কথিত রবিবারের নাম 'খর্জ্জুর রবিবার' বলা যায়। কথিত আছে যে ঐ রবিবার বামন ভূতদিগকে আপন ২ সম্পত্তি মাঠে ফেলিয়া রাখিতে হয়, কিন্তু তদ্রূপ করিলে সকলেই তাহাদের সুবর্ণ অপহরণ করিবেক, এই ভয়ে শঠতা-পূর্ব্বক তাহারা ঐ সুবর্ণকে পত্র-লোষ্ট্রাদিরূপে পরিবর্ত্তিত করিয়া ফেলিয়া রাখে। কোন সুচতুর ঐ সময়ে খর্জ্জুর পত্রের শান্তি জল ঐ পত্ররূপি সুবর্ণের উপর নিক্ষেপ করিলে তৎক্ষণাৎ সুবর্ণ আপন প্রকৃত রূপ ধারণ করে এবং তখন যাহার ইচ্ছা সে তাহা তুলিয়া লইতে পারে। পূর্ব্বোক্ত তিউস্ আর পুলে নামক ভূতের ন্যায় এই বামন ভূতেরা বিদেশে গমন করে না, নতুবা আমাদিগের বিশেষ উপকার হইত, কারণ কলিকাতায় আসিলে আমরা অবশ্য কোনমতে না কোনমতে খর্জ্জুর রবিবারের সাহায্যে রহস্য-সন্দর্ভ লিখিয়া যৎকিঞ্চিৎ লাভের আয়াস পরিত্যাগ করিতে পারিতাম। আমাদের পাঠকেরাও অনেকে তদুপায়ে উপকৃত হইতেন, সন্দেহ নাই।"

মিশরীয় দেবতাদের বর্ণনায় এবং তাহাদের পূজা-ব্যবস্থা সম্পর্কে, ব্যঙ্গাত্মক কবিতা রচনা করা হইয়াছে ঃ

"ইজিপ্ত দেশেতে যত ধর্ম্মমূঢ় নর।
ভক্তি ভাবে ভজে সবে জঘন্য অমর॥

যে কেহ শুনেছে উক্ত রাজ্যের সংবাদ।
জানিয়াছে ধর্ম্মের ঐ বিষম প্রমাদ॥
কেহ বা কুম্ভীর পূজে কেহ বা বিহঙ্গ।
রাশি রাশি আছে যার জঠরে ভুজঙ্গ॥
...কুকুর ঠাকুররূপে পাদ্য অর্ঘ্য পায়।
দিয়ান্না প্রধানা দেবী বঞ্চিত পূজায়॥
পণ্ডিতে পলাণ্ড পূজে কি সব ভণ্ডতা।
ভাঙ্গিলে ভক্ষিলে হয় ঘোর পাষণ্ডতা॥
ধন্য ইজিপ্তের লোক অপার মহিমা।
উদ্যানেও দেবদেবী জন্মে নাহি সীমা॥"

(৫ম খণ্ড—পৃঃ ৭৬)

প্রবন্ধের সহিত এই কবিতাগুলিও নিশ্চয়ই তৎকালীন পাঠকদের চিত্তরঞ্জন করিত।

পঞ্চম অধ্যায়

শিক্ষামূলক শিশু-সাহিত্যের পরিব্যাপ্তি, বিবিধ গ্রন্থ ও গ্রন্থকার:

ভার্ণাকুলার লিটারেচার কমিটির পক্ষ হইতে বঙ্গভাষানুবাদক সমাজ যেমন ব্যাপকভাবে সাহিত্য প্রচার করিতেছিলেন, তেমনি স্কুল বুক সোসাইটিও একান্তভাবে পাঠ্যগ্রন্থ প্রচারে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান, অভিধান, চাণক্যশ্লোক—কিছুই তাঁহাদের আওতার বাহিরে পড়ে নাই। অনেকগুলি বাংলা-পাঠ্য গ্রন্থও তাহাদের মধ্যে ছিল। কিন্তু অনুবাদক সমাজের কল্যাণে শিশু-সাহিত্য ক্রমেই স্বতন্ত্র ও স্বাধীন রূপ লইতেছিল—সুতরাং স্কুল বুক সোসাইটির এই বইগুলিকে আর শিশু-সাহিত্যের পর্য্যায়ভুক্ত করা চলে না। তবু ইহাদের কোন কোন বই একান্তভাবে পাঠ্য হইয়াও আংশিক ভাবে শিশু-সাহিত্যের দাবী মিটাইত বলিয়া মনে হয়। স্কুল বুক সোসাইটি ছাড়া বিচ্ছিন্ন ভাবেও কিছু উৎকৃষ্ট পাঠ্যগ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছিল।

বর্ণমালা ঃ সম্ভবতঃ ১৮৫৯-৫০ এ প্রথম এবং ১৮৫৪ সালে দ্বিতীয় ভাগ স্কুল বুক সোসাইটি কর্ত্তৃক প্রকাশিত। প্রথম ভাগে বর্ণমালা শিক্ষা হইতে ষত্ববিধি পর্য্যন্ত বিশুদ্ধ পাঠ্য—৩৬ পৃষ্ঠায় শেষ হইয়াছে। কিন্তু দ্বিতীয় ভাগের কিছু অংশে সুন্দর সুন্দর গল্পের দ্বারা শিক্ষার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

উদাহরণ স্বরূপ ৩ প্রকরণ (দ্বিতীয় ভাগ) হইতে একটি গল্পের কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল ঃ

গুণের পুরস্কার

কোন সময় এক রাজা আপন ভৃত্যকে ডাকিয়া উত্তর না পাওয়াতে তাহার গৃহদ্বার খুলিয়া দেখেন, সেই দিনে তাঁহার সেবা করিতে যে

সদ্বংশজাত বালকের পালা ছিল সে নিদ্রিত আছে। পশ্চাৎ তাহাকে জাগাইবার মনস্থে নিকটে গিয়া দেখেন যে ঐ বালকের কোমরের কাপড় হইতে একখানি লিখনের খানিক বাহির হইয়া রহিয়াছে। তাহাতে কি লেখা আছে, ইহা জানিবার ইচ্ছাতে রাজা তাহাকে লইয়া পড়িতে লাগিলেন, কিন্তু সেই পত্র বালকের মাতা পুত্রের নিকট পাঠাইয়াছিলেন, তাহার আশয় এই, হে আমার প্রিয় পুত্র, তুমি আমার দুঃখ নিবারণের নিমিত্ত ক্লেশ স্বীকার করিয়াং আপন উপায়ের কিছু পাঠাইয়াছ, ইহাতে আমার প্রতি যে শ্রদ্ধাভক্তি প্রকাশ করিলা সেই সুকৃতির ফল পরমেশ্বর তোমাকে অবশ্য দিবেন। রাজা এই লিখন পড়িয়া পুনর্ব্বার গৃহপ্রবেশ করিয়া কতকগুলি মোহর ঐ পত্রে মুড়িয়া বালকের কটিবন্ধনের মধ্যে রাখিলেন।—”

সারাবলি ঃ—“সারাবলি অথবা ভারতীয় ইতিহাস সার সংগ্রহ। এতদ্দেশীয় বিদ্যালয়ের ব্যবহারার্থে রাজাবলী, বিক্রমাদিত্য কাব্য, কেটলিজ ইণ্ডিয়া ও মার্সমন্স হিষ্টরি অব ইণ্ডিয়া, ইণ্ডিয়ান ইউথস্ মেগেজিন্, ষ্টুয়ার্ট অব বেঙ্গাল ইত্যাদি গ্রন্থ হইতে নবীনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক সংগৃহীত” হইয়া ১৮৫১ সালে প্রকাশিত হইয়াছিল।

ভাষা ভালো নয়। অত্যন্ত সংস্কৃতঘেঁষা এবং দীর্ঘবিলম্বিত ঃ “যুধিষ্ঠির ধর্ম্মময় মহাবৃক্ষ, অর্জ্জুন তাহার স্কন্ধ, ভীমসেন শাখা, মাদ্রীসুত নকুল সহদেব পুষ্প ও ফল, কৃষ্ণ বেদ ও ব্রাহ্মণগণ তাহার মূল। উক্ত ধর্ম্মপরায়ণ যুধিষ্ঠির দুষ্টমন্ত্রি শকুনির প্রবঞ্চনাতে পাষ্টি ক্রীড়ায় পরাজিত হইয়া পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞা পালনার্থ দ্বাদশবর্ষ বনবাস ও একবর্ষ অজ্ঞাতবাস জন্য অপর ভ্রাতৃগণ এবং দ্রৌপদীসহ সমূহ দুঃখ সম্ভোগ ও মনস্তাপ ও অশেষ যন্ত্রণা ভোগাবসানে পঞ্চভ্রাতা দ্রৌপদী সমভিব্যাহারে অজ্ঞাতবাসরূপ বিষণ পাশ হইতে মুক্ত হইয়া প্রফুল্লিতান্তঃকরণে মৎস্যাধিপতি বিরাট রাজসদনে সম্মত হইলেন।”

(দ্বিতীয় পরিচ্ছেদঃ)

নবনারী : ১৮৫২ সালে আরব্য ও পারস্য উপন্যাসের খ্যাত-নামা অনুবাদক নীলমণি বসাক এই উত্তম বালক-বালিকাপাঠ্য গ্রন্থটি রচনা করেন। প্রাচীন ভারতে বহু গুণবতী ও বিদুষী নারী ছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের কোন প্রণালীবদ্ধ জীবনচরিত না থাকায় "এবং বালিকারা সদ্‌গুণবিশিষ্টা স্ত্রীদিগের উত্তম চরিত্র দর্শন করিলে পবিত্র পথ অবলম্বন করিবেক, এই অভিপ্রায়ে" গ্রন্থকার নানা স্থান হইতে সংকলন করিয়া প্রাচীন ও অপেক্ষাকৃত সাম্প্রতিক নয়টি স্মরণীয়া মহিলার জীবন চরিত "নবনারী" নামে প্রকাশ করেন। ইঁহারা হইলেন : সীতা, সাবিত্রী, শকুন্তলা, দময়ন্তী, দ্রৌপদী, লীলাবতী খনা, অহল্যাবাই ও রাণী ভবানী।

লেখকের বক্তব্য হইতে জানা যায় যে বিদ্যাসাগর পাণ্ডুলিপিটি সংশোধন করিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাতে তাঁহার কৃতিত্ব লাঘব হয় না। অতি সহজ এবং প্রাণদীপ্ত ভাষা। বলিতে গেলে, সমসাময়িক কালে এমন জড়ত্বহীন সুন্দর বাংলা গদ্য অতি অল্প লোকেই লিখিতে পারিয়াছেন। নীলমণি বসাক ভাষার দিক হইতে বিদ্যাসাগরের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছাত্র ছিলেন বলা যাইতে পারে। এই উচ্চাঙ্গের বইখানি বিদ্যালয়ে পাঠ্য হইয়াছিল এবং প্রচুর সমাদর লাভ করিয়াছিল। তাহাই স্বাভাবিক, নতুবা এমন উৎকৃষ্ট সুলিখিত গ্রন্থের উপরে অবিচার করা হইত।

ভাষার নমুনা :

"কথিত আছে এক দিবস রাজা বিক্রমাদিত্য আপন সভা পণ্ডিত-গণকে আজ্ঞা করিলেন আকাশের নক্ষত্র সংখ্যা গণিয়া দিতে হইবে। বরাহ কহিলেন, তিনি গণনা করিয়া দিবেন, কিন্তু তাহা না পারিয়া মহা দুঃখিত হইয়া শয়ন করিয়া রহিলেন। খনা গৃহকর্ম্ম ও রন্ধনাদি করিতে ছিলেন, রন্ধন সমাপন হইলে অন্ন ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিয়া শ্বশুরকে আহারার্থে আহ্বান করিলেন। বরাহ কহিলেন, আমি আহার করিব কি, আমি এই বিপদে পড়িয়াছি, আমি নক্ষত্র সংখ্যা

গণনা না করিতে পারিলে জল গ্রহণ করিব না। এই কথা শুনিয়া খনা তখনই মৃত্তিকাতে কয়েকটি অঙ্ক পাতিয়া শ্বশুরকে বলিলেন আকাশে এত নক্ষত্র আছে। খনার এই কথা শুনিয়া বরাহ মহা আনন্দিত হইলেন এবং সভায় যাইয়া রাজাকে নক্ষত্র-সংখ্যা বলিলেন। রাজা অত্যন্ত তুষ্ট হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন নক্ষত্র গণনা সঙ্কেত কোথায় পাইলে? তখন তাঁহাকে স্বীকার করিতে হইল তাঁহার গুণবতী পুত্রবধূ খনা এই গণনা করিয়া দিয়াছেন।"

(খনা, পৃঃ ২৪২-৪৩)

"পঞ্চপাণ্ডব আসিবামাত্র সকলে তাঁহাদের সমাদর করিলেন। তাহার পর শকুনি পাশা বাহির করিয়া যুধিষ্ঠিরকে তৎক্রীড়াতে আহ্বান করিলেন। যুধিষ্ঠির কহিলেন, পাশাখেলাতে পরাক্রম প্রকাশ হয় না। ক্ষত্রিয়ের ধর্ম যুদ্ধ। শকুনি কহিলেন যুদ্ধে জাতিভেদ থাকে না, নীচ জাতি যবনও ভদ্রকে প্রহার করিতে পারে। পাশা খেলা সমান লোক ব্যতীত হয় না। যুধিষ্ঠির বলিলেন এ খেলা আমার অভিপ্রেত নহে, কিন্তু যখন তুমি আমাকে আহ্বান করিলে তখন ইহাতে পরাঙ্‌মুখ হইব না, কেন না, এতাদৃশ বিষয়ে পরাঙ্‌মুখ হওয়া ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম নহে।"

(দ্রৌপদী, পৃঃ ১৮১-৮২)

বত্রিশ সিংহাসন : ১৮৫৪ সালে নীলমণি বসাকের এই গ্রন্থখানি প্রকাশিত হয়। লেখক হিন্দী হইতে বইখানি অনুবাদ করিয়াছিলেন। 'বিজ্ঞাপনে' জানাইয়াছেন ঃ

"রাজা বিক্রমাদিত্য দেবতুল্য মনুষ্য ছিলেন। এতদ্দেশীয় লোক সকলকে তাঁহার সদ্‌গুণ বৃত্তান্ত শুনিতে সাতিশয় সমুৎসুক দেখা যায়। এই বত্রিশ সিংহাসন পাঠ করিলে, বোধ করি, তাঁহারা বিক্রমাদিত্যের অনেক বৃত্তান্ত অবগত হইতে পারিবেন। বিশেষতঃ বালক বালিকা-দিগের পক্ষে এই পুস্তক অনেক বিষয়ে উপকারজনক হইবে।" এখানিও অতি সুন্দর সুখপাঠ্য গ্রন্থ—সচ্ছন্দ সহজ ভাষায় লেখক

আরো বেশী অধিকার অর্জ্জন করিয়াছেন। একালের পাঠকও বইখানি পড়িয়া আনন্দ পাইবেন। রচনার নমুনা ঃ

"রাজা বিক্রমাদিত্য কয়েক দিবস তথায় থাকিয়া দেখিলেন, ঐ রাজা প্রত্যহ লক্ষ মুদ্রা দান করেন। তিনি মনে মনে ভাবিলেন, এই দানের অভিপ্রায় কি, এবং কোন্ দেবতা তাঁহাকে ধন দান করেন, তাহা জানিতে হইবে। পরে এক দিবস দেখিলেন রাত্রি গাঢ়তর অন্ধকারাচ্ছন্ন হইলে, রাজা বনে গমন করিতেছেন। ইহা দেখিয়া তিনি তাঁহার পশ্চাদ্গামী হইলেন। রাজা নগর পরিত্যাগ করিয়া অরণ্যে প্রবেশ করিলেন। ঐ অরণ্যমধ্যে এক সরোবর ও দেবালয় ছিল, তাহার সম্মুখে এক কটাহে ঘৃত উত্তপ্ত হইতেছিল। রাজা সরোবরে অবগাহন পূর্ব্বক দেবীকে প্রণাম করিয়া, উত্তপ্ত ঘৃত কটাহে পড়িলেন। পড়িবামাত্র তাবদঙ্গ দগ্ধ হইল। পরে চতুঃষষ্টি যোগিনী আসিয়া তাঁহার মাংস আহার করিল। অনন্তর এক কঙ্কালিনী আসিয়া রাজার অস্থিতে অমৃত প্রোক্ষণ করিল, তাহাতে রাজা সজীব হইয়া রাম নাম উচ্চারণ পূর্ব্বক দেবীর সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন। দেবী মন্দির হইতে তাঁহাকে এক লক্ষ মুদ্রা দিলেন। রাজা তাহা লইয়া গৃহে আসিলেন। যোগিনীগণও স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।

এই ব্যাপার দেখিয়া রাজা বিক্রমাদিত্যও ঐ উত্তপ্ত ঘৃত-কটাহে ঝাঁপ দিলেন—"

(পৃঃ—৬১-৬২)

জ্ঞান সুধাকরঃ (প্রথম ভাগ) "জনাঞ্জী বিদ্যালয়াধ্যাপক শ্রীমধুসূদন তর্কালঙ্কার প্রণীত।" সন ১২৬২ (১৮৫৫-৫৬)। 'বাঙ্গাল মিলেটরি আর্ফেন যন্ত্রালয়ে' ছাপা।

সংস্কৃত ভাষার বিভিন্ন শাস্ত্র গ্রন্থ হইতে উপদেশ দেওয়ার জন্য বইখানি লিখিত। ভূমিকায় বলা হইয়াছে, নীতি-শ্লোকগুলি কণ্ঠস্থ করিলে বালকদের মনে সদুপদেশ বদ্ধমূল হয়, সেই সঙ্গে মনোরঞ্জক কাহিনী থাকিলে আরও চিত্তগ্রাহী হয়। তাই পঞ্চ-তন্ত্র, হিতোপদেশের

বিভিন্ন শ্লোকের সহিত কয়েকটি গল্পও পরিবেষিত হইয়াছে। প্রচলিত পদ্ধতিতে ইহারও একটি মুখবন্ধ রহিয়াছে। হেমপ্রভা নগরের রাজা বিজয়দত্তের পুত্র চন্দ্রচূড়কে শিক্ষায় প্রবৃত্ত করাইবার জন্য মন্ত্রী হরি দত্ত নানাবিধ বিদ্যার উপকারিতা এবং বিভিন্ন জ্ঞানমূলক বিষয়ের কয়েকটি গল্প রাজাকে শোনান। রাজা তাহাতে অনুপ্রাণিত হইয়া সমাগত পণ্ডিতদের মধ্য হইতে মাধবাচার্য্যকে নির্ব্বাচন করেন। মাধবাচার্য্য রাজপুত্র চন্দ্রচূড়কে পণ্ডিত বিষ্ণুশর্ম্মার মতো "কথাচ্ছলেন" বিবিধ নীতি-জ্ঞান শিক্ষা দেন।

নীলমণি বসাকের সমকালীন হইয়াও লেখক কদর্য্য বাংলা লিখিয়াছেন। তর্কালঙ্কার উপাধিধারী অধ্যাপকের পক্ষে অমার্জ্জনীয় ব্যাকরণ ও বানান ভুলে গ্রন্থটি আকীর্ণ, তৎসহ অজস্র মুদ্রণ-প্রমাদ। নামমাত্র একটি শুদ্ধিপত্র আছে। যত সদুদ্দেশ্য লইয়াই লেখা হোক, এই বইয়ের দ্বিতীয় খণ্ড কখনও মুদ্রিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না।

বিদ্যাহীন পুত্রের দ্বারা যে কী সর্ব্বনাশ ঘটিতে পারে, তাহার উদাহরণস্বরূপ একটি গল্পের কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল। মানসিংহ নামে জনৈক ব্যক্তি উগ্রসেন নামে একটি নবলব্ধ জ্ঞানী মিত্রকে দুর্য্যোগের দিনে স্বগৃহে লইয়া আসেন। এমন সময় (মানসিংহ বলিতেছেন) ঃ

"আমার মূর্খ পুত্র বীরভদ্র তথায় উপনীত হইল এবং আমার মিত্র উগ্রসেনের প্রতি বিকট কটাক্ষপাৎ করিয়া কহিলেক, 'ওরে উদাসন্ আগত মনুষ্য কোথা বাড়ি কোথা রে, তুই, এই দুর্দ্দিনে আমার ঘরে কেন এলি, তোর কি ঘর্ নাই,' এই অপকৃষ্ট ভীষণ-ভাষণ শ্রবণ করিয়া মিত্র বিস্ময়াপন্ন হইলেন, এবং আমাকে ইঙ্গিতে জিজ্ঞাসা করিলেন, ইনি কে, আমি পুত্রকে দুর্দ্দান্ত ও অধর্ম্মাক্রান্ত জানিয়া লজ্জাবিষ্ট চিত্তে আত্মজ পরিচয় গোপন পূর্ব্বক মিত্রকে কহিলাম, ইনি যে হউন, ইঁহার প্রতি আপনকার কোন কথার প্রয়োজন নাই।

আমার এই কথাটি শ্রবণ মাত্র মিত্র সেই দুর্দ্দান্তকে উন্মাদ বিবেচনা করত আমাকে কহিলেন হে মিত্র! আ, হা, অতি সুদৃশ্য এই পুরুষ্‌টি এরূপ কতদিন ক্ষিপ্ত হইয়াছে, অনুরূপ চিকিৎসা করিলে কি আরাম হইতে পারে না? বন্ধু বদন হইতে এই বাক্য বিনির্গত মাত্রই সেই কুলান্তকারী কালস্বরূপ হইয়া গভীর গর্জ্জন পূর্ব্বক অকথ্য কুৎসিত বাক্য বিন্যাস করত তাঁহার কর্ণমূলে এমন চপেটাঘাৎ করিলেক যে তিনি পর্য্যঙ্ক হইতে অধঃপতন পূর্ব্বক মুহুর্ম্মুহু রুধিরোদ্বমন করত তৎক্ষণাৎ প্রাণত্যাগ করিলেন—"

এই অপরাধে রাজার বিচারে বীরভদ্রের শিরশ্ছেদ—মানসিংহের পত্নীর পুত্রশোকে প্রাণত্যাগ এবং কন্যার মৃত্যুতে মানসিংহের শ্বশুরের মৃত্যু। এক মূর্খ পুত্রের জন্য এতগুলি অঘটন ঘটিয়া প্রমাণ করিল যে বিদ্যার তুল্য রত্ন আর নাই।

শিক্ষা-বিস্তারের সমর্থনে রচিত বইখানির উদ্দেশ্য সাধু। কিন্তু লেখকের অপটুতা এবং বানান-ব্যাকরণের জ্ঞানের অভাবে এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছিল মনে বলিয়া হয় না।

জ্ঞান সৌদামিনী:

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে রক্ষিত বইখানির প্রথম ১৪ পাতা নাই, ১১৮ পৃষ্ঠায় খণ্ডিত। রচনার কাল বা লেখকের পরিচয় জানা যায় না। ভাষা, ছাপা এবং বিষয় দেখিয়া ১৮৫০-৬০ সালের মধ্যবর্ত্তী বলিয়া মনে হয়। বিভিন্ন অধ্যায়ের নাম "চমক"—বিবিধ চমকে বিবিধ প্রকার জ্ঞানদানের চেষ্টা। বর্ণমালাতত্ত্ব হইতে সংখ্যা-বিজ্ঞান, বিবিধ সাংসারিক ও আধ্যাত্মিক উপদেশ, পরিশেষে ভারতের গৌরব প্রকাশ।

বিদ্যালয়ের শিক্ষা অত্যন্ত সীমাবদ্ধ, তাহাতে যথার্থ বিদ্যালাভ হয় না। তাই সম্যক্‌ জ্ঞান-প্রদানের উদ্দেশ্যে গ্রন্থটি রচিত। "প্রতি বিদ্যালয়ে প্রায় বালকদের শুদ্ধ কতকগুলা অক্ষরাবৃত্তি

করা হয় এই মাত্র, বিদ্যার যে কি ফল, বিদ্যাফলের যে কি রস, তাহার আস্বাদন মাত্র করা যায় না। বিদ্যা কাহাকে বলে, তাহার উপলব্ধি করা অত্যন্ত আবশ্যক।"

গুরু-শিষ্য সংবাদের ভঙ্গিতে লেখা। বক্তা গুরু বিজ্ঞানানন্দ, শ্রোতা শিষ্য বিষয়ানন্দ।

"হে বৎস বিষয়ানন্দ! বাল্যকালে অভ্যস্ত বিদ্যা যাদৃশী দৃঢ়া হয় তদ্রূপ প্রথমাবধি অভ্যাসগুণে ধর্ম্মচর্য্যারও দৃঢ়তা হইতে পারে।"

উদ্দেশ্য বালক-শিক্ষাই ছিল। গুরুগিরির ভঙ্গি অত্যন্ত প্রকট, ভাষা কঠোর—লালিত্যহীন, রক্ষণশীল মনোভাব। প্রচুর সংস্কৃত শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। 'মদ্যপান,' 'পরদার গমন' প্রভৃতি সম্বন্ধে যে-সব উপদেশ দেওয়া হইয়াছে তাহা পণ্ডিতী পদ্ধতিতে বালক-শিক্ষার অনুকূল হইতে পারে—এ যুগে অপাঠ্য।

'হিতোপদেশ' ইত্যাদি হইতে গল্প তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে —কিন্তু ভাষা কণ্টকাকীর্ণ অরণ্যের মতো। যেমন, সিংহ ও শশকের গল্পটি:

"শ্রবণমাত্রতঃ মৃগরাজ সম্যক ক্রোধের আহরণ করিয়া ঐ কূপ সন্নিহিত আসিয়া কূপ প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া স্বপ্রতিচ্ছায় দেখিয়া দ্বিতীয় শত্রু বলিয়া উপলব্ধি করিলেন। মহাক্রোধে বিকটাকার মুখ করিয়া সংদন্তোষ্ঠপুট হইলেন, প্রতিচ্ছায়ও তদনুরূপ সংদন্তোষ্ঠ-পুটবৎ হইল। তদ্দৃষ্টে মহাক্রোধে পরীতাত্ম হইয়া ঐ সিংহ প্রতিচ্ছায়াকে প্রহারোদ্যত হইয়া দক্ষিণ হস্তোত্তলন করিল প্রতি-চ্ছায়ও বাম হস্তোত্তলন পূর্ব্বক অবিকল হননোদ্যত হইল। তাহা দেখিয়া অসহ্য কোপাগ্নিদগ্ধ মাতঙ্গশত্রু শত্রুবধার্থে উদ্যোগি হইয়া সমস্ত প্রাণের সহিত মহাবেগে প্রোল্লম্ফন দ্বারা ঐ কূপমধ্যে নিপতিত হইলেন।"

এই ধরণের পণ্ডিতী লেখকেরাই সম্ভবতঃ বিদ্যাসাগরী ভাষার উপর খড়গহস্ত হইয়াছিলেন!

উইলিয়ম জোন্‌স প্রভৃতির সাক্ষ্য-প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া এই গ্রন্থে ভারতের আর্য্য-গৌরবের জন্য যে শ্লাঘা প্রকাশ করা হইয়াছে, পরবর্ত্তীকালে স্বদেশী আন্দোলনে সেই মনোভঙ্গি প্রতিফলিত হইয়াছিল। এদিক হইতে ইহার কিছু ঐতিহাসিক মূল্য আছে ঃ

"কামান, বন্দুক, বারুদ ঔর্ব্ব মুনির সৃষ্ট, পূর্ব্বে সগররাজা ঔর্ব্ব মুনির নিকট অগ্ন্যস্ত্রাদি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।···এতদপেক্ষা তৎকালে অগ্নিবাণ আরও অধিক প্রবলতর ছিল, শতঘ্নী তবক ঔর্ব্বাগ্নি গুড়ক প্রভৃতি মুখ্য যুদ্ধোপকরণ অর্থাৎ কামান বন্দুক বারুদগুলি যে যুদ্ধের উপকরণ ঋষিদিগের সৃষ্ট, তাহাতে সংশয় নাই। আমরা ইহা নূতন সৃষ্টি করিলাম বলিয়া কোন জাতিরাই হিন্দুদিগের প্রতি এ বিষয়ে স্পর্দ্ধা করিতে পারে না, কেননা ইউরোপীয় (মারিষ সাহেব) ইহা স্বকৃত পুস্তকে বিশেষ করিয়া লিখিয়া গিয়াছেন।"

জ্ঞান রত্নাকর ঃ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য বসু কর্ত্তৃক বিরচিত এবং গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় দ্বারা পরিশোধিত। ১৭৮০ শকাব্দ (১৮৫৮)। ইহারও সূচনা পঞ্চ-তন্ত্র, হিতোপদেশের অনুরূপ। রাজপুত্রের শিক্ষাদান প্রসঙ্গ লইয়াই আরম্ভ। উপদেশ-নগরের 'কল্পিত নৃপতি' সুদেব সিদ্ধান্তকে বলিতেছেন ঃ

"মূর্খ সুত সত্ত্বে সুখ না হয় কিঞ্চিৎ।
তারাহীন চক্ষু রাখা কেবল লজ্জিত॥
শত মূর্খ পুত্র যদি থাকে বিদ্যমান।
এক পুত্র পণ্ডিতের না হয় সমান।
এক চন্দ্র তিমির করয়ে বিনাশন।
কেবা গণে গগনে অগণ্য তারাগণ॥"

গদ্যে এবং পদ্যে (পদ্যই প্রধান) ইহাতে সচিত্র খগোল ও ভূগোল বৃত্তান্ত, বর্ণসঙ্কর কাহিনী ও বিভিন্ন জাতির উৎপত্তি বিবরণ, ভারতচন্দ্র হইতে নায়ক-নায়িকার লক্ষণ, হিন্দু দায় ভাগ, সম্পত্তি-বণ্টন-পদ্ধতি (প্রকাণ্ড চার্ট দেওয়া আছে), নানা ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের কথা,

ষট্‌চক্রভেদ, তন্ত্র-সাধনা, সাধ্য-সাধনতত্ত্ব, শৈব হইতে ব্রাহ্ম পর্য্যন্ত সমস্ত সম্প্রদায়ের সাধন-পদ্ধতি—সবই আছে। রচনা যুবকদের জন্যই—আসলে ইহা একটি গার্হস্থ্য সর্ব্ববিদ্যা ও শাস্ত্র-সংগ্রহ। বালকদের পড়িতে দেওয়া হইত না—এ কথাও বলা যায় না।

বিজয়-বসন্ত ঃ—১৮৫৯ সালে কুমারখালি নিবাসী হরিনাথ মজুমদার (স্বনামধন্য কাঙ্গাল হরিনাথ) এই নামে একখানি পূর্ণাঙ্গ শিশু-পাঠ্য উপন্যাস প্রকাশ করেন। প্রচলিত লোক-ক ার উপর নির্ভরশীল হইলেও ইহাই প্রথম শিশু-সাহিত্যে খাঁটি দেশজমৃত্তিকাসম্ভব উপন্যাস। "সত্যচন্দ্রোদয়" বা "গোপাল-কামিনী" এই গৌরব দাবি করিতে পারে না। বইটির ভূমিকায় গ্রন্থকার বলিতেছেন ঃ

"বালকেরা ব্যাকরণ, পদার্থ বিদ্যা, ভূগোলাদি সর্ব্বদা অধ্যয়ন করিয়া নিতান্ত ক্লান্ত হয়। এজন্য Novel অর্থাৎ রূপক ইতিহাস পড়িতে ইচ্ছুক হইয়া থাকে। এক্ষণে কামিনী কুমার, রসিকরঞ্জন, চাহার দরবেশ, বাহার দানেশ প্রভৃতি যে সমুদয় ব্যাপক ইতিহাস প্রচারিত আছে, সে সমুদায়ই অশ্লীল ভাব ও রসে পরিপূর্ণ। তৎপাঠে উপকার না হইয়া বরং সর্ব্বতোভাবে অনর্থের উৎপত্তি হয়। এই সমুদায় অবলোকনে বালকদিগের রূপক পাঠের নিমিত্ত কতিপয় বন্ধুর অনুরোধে আমি 'বিজয়-বসন্ত' নামে এই গ্রন্থ প্রণয়নে প্রবৃত্ত হই। ইহা কোন পুস্তক হইতে অনুবাদিত নহে, সমুদায় বিষয়ই মনঃকল্পিত। ইহার আদ্যন্ত কেবল করুণরসাশ্রিত ও নীতিগর্ভ বিষয়ে পরিপূর্ণ। এতদ্দারা বালকগণের চিত্তরঞ্জন ও নীতিশিক্ষার বিষয়ে যৎকিঞ্চিৎ উপকার হইবার সম্ভাবনা।"

অধ্যাপক ব্রজনাথ বিদ্যালঙ্কার (ফ্রী চার্চ স্কট্‌ল্যাণ্ড্‌স্ ইন্‌স্টিট্যুশনের বাংলা ভাষার অধ্যাপক) ও ব্রাহ্মসমাজের প্রধান উপাচার্য্য আনন্দচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ বইটি সংশোধন করিয়া দিয়াছিলেন। দ্বিতীয় সংস্করণে লেখক ইহার ভাষাগত দুরূহতা অনেক সরল করেন, একটি অধ্যায়ও বাড়াইয়া দেন।

"বিজয় বসন্তের" সারাংশ এই :

একদা পরীক্ষিৎ মৃগয়ায় গিয়া একটি মৃগের উপর শরনিক্ষেপ করিলেন। মৃগটি কিছুমাত্র কাতর না হইয়া দ্রুতবেগে বনের মধ্যে পলাইল—রাজা তাহাকে অনুসরণ করিতে লাগিলেন। তৃষ্ণার্ত্ত রাজা শেষে এক মৌনব্রত ঋষির আশ্রমে প্রবেশ করিয়া পানীয় জল প্রার্থনা করেন। ধ্যানস্থ ঋষি তাহা শুনিতে পান না। ক্রুদ্ধ রাজা শরদ্বারা একটি মৃত সর্প ঋষির গলায় জড়াইয়া দিয়া প্রস্থান করেন। মুনিপুত্র শৃঙ্গী প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া পিতার এই দুর্দ্দশা-দর্শনে রাজাকে অভিসম্পাত দিলে মুনি ক্ষুব্ধচিত্তে পুত্রকে একটি গল্প বলিতে থাকেন। আর সেই গল্পটিই বিজয়-বসন্তের প্রধান কাহিনী।

একদা গন্ধর্ব্বরাজ পত্নী ও ভ্রাতাসহ প্রভাসতীর্থে যাত্রা করিলেন। সেখানে তাঁহারা প্রমোদ কাননে জলকেলি করিতেছিলেন। জনৈক মুনি-পুত্র সরোবরের জল পান করিতে আসিলে তাঁহাদের পদতাড়িত জল মুনি-তনয়ের গায়ে পড়ে। ক্রুদ্ধ হইয়া মুনিকুমার শাপ দেন : এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ তোমাদের মর্ত্ত্যে জন্ম লইয়া বিচ্ছেদ দুঃখ পাইতে হইবে।

জয়পুরের রাজা জয় সেনের স্ত্রী হৈমবতী দুই পুত্র বিজয় ও বসন্তকে রাখিয়া পরলোকে গমন করিলে রাজা পুনর্বিবাহ করেন। নূতনা মহিষী সপত্নীপুত্রদের দেখিয়া ঈর্ষ্যায় দগ্ধ হইলেন এবং কুঁজী জাতীয়া এক দাসীর পরামর্শে তাঁহাদের বনে পাঠাইয়া দিলেন। সেখানে নানা কষ্ট ভোগের পর রাজহস্তী আসিয়া বিজয়কে রাজা করিবার জন্য অন্য দেশে লইয়া গেল। বসন্ত এক সন্ন্যাসীর আশ্রয় পাইলেন। শেষে বিবিধ ঘটনার পর দুই ভাই দুই রাজকন্যাকে বিবাহ করিয়া সুখে কাল যাপন করিতে লাগিলেন। পিতা, মাতা ও ধাত্রীর সহিত তাঁহাদের পুনর্মিলন ঘটিল।

গল্পের প্রথম অংশ "মহাভারত" অবলম্বনে এবং প্রধানাংশ বাংলা

দেশের একটি চলিত রূপকথার উপর নির্ভর করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে। অতএব লেখকের দাবী অনুযায়ী এ খানিকে সম্পূর্ণ মৌলিক বলা যায় না। কিন্তু গল্পটির গ্রন্থনায় ও বিন্যাসে লেখক নিঃসন্দেহই কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন। তৎকালীন ইংরাজি ও সংস্কৃত-প্রভাবিত (কিছু পরিমাণে ফার্সী) যুগে হরিনাথ দেশের জল-মাটির একটি সুমিষ্ট অন্তরঙ্গ সৌরভ বহিয়া আনিয়াছেন। তাই "সত্যচন্দ্রোদয়", "গোপাল কামিনী" নয়—বিজয়-বসন্তকেই বাংলা সাহিত্যে বালক-বালিকাদিগের জন্য পূর্ণাঙ্গ এবং স্বাধীন উপন্যাসের সম্মান দেওয়া উচিত। বইখানি দীর্ঘকাল ধরিয়া গল্পের আকর্ষণে, রুচির নির্ম্মলতায় ও মর্ম্মস্পর্শিতায় শিশু-বালকের চিত্তরঞ্জন করিয়াছে—এমনকি, বাংলা চলচ্চিত্রের প্রথম যুগে এই কাহিনীকে ভিত্তি করিয়া একটি নির্ব্বাক ছায়াছবিও নির্ম্মিত হইয়াছিল।

ভাষায় খুব বৈশিষ্ট্য না থাকিলেও বিদ্যাসাগরের প্রভাবে সহজ পাঠ্য ও সরল।

বঙ্গীয় পাঠাবলী—(স্কুল বুক সোসাইটি) ১৮১৮ হইতে বাহির হইতে থাকে, নতুন ভাবে চার খণ্ডে ১৮৬০-৬৩র মধ্যে আত্মপ্রকাশ করে। ইহার চতুর্থ খণ্ড ১৮৬৩ সালে মুদ্রিত হইয়াছে। বইখানির বহু রচনা 'দিগ্‌দর্শন' হইতে গৃহীত। গল্প, নিবন্ধ, কবিতা—সবই ইহাতে ছিল। ইহার চতুর্থ ভাগের প্রথম সংখ্যায় পাঠক-বালকদের এই ভাবে উপদেশ দেওয়া হইতেছে ঃ

"মুখ লাড়নে অথবা দন্তের পরস্পর ঘর্ষণে তোমার জীবন রক্ষা হয় না। কিন্তু আহার চর্ব্বিত হইয়া উদরে জীর্ণ ও শরীরে সম্মিলিত হইলে জীবন রক্ষা হয়। এইরূপ কেবল ধ্বনি করিলে অথবা বাক্য সকলের প্রভেদ জ্ঞান হইলে তোমার যে উপকার হয় তাহা নয়। কিন্তু যাহা পাঠ কর তাহার তাৎপর্য্য বুঝিলে এবং তদনুসারে আচরণ করিলেই উপকার হয়। এবং জ্ঞানরূপ আহার দ্বারা সর্ব্বতোভাবে তোমার যথার্থ উপকার জন্মিবে।"

নানা ধরণের সুন্দর সুন্দর গল্প ইহাতে থাকিত। আবার 'আমেরিকা দেশের প্রকাশ বৃত্তান্ত', 'আকবরের বিষয়', 'বাণিজ্য'ও বাদ পড়ে নাই। ছবি থাকিত। রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত 'বহুরূপির গল্প' নামে একটি সুন্দর কবিতাও ইহাতে আছে। জাতীয় গৌরবের চেতনা জাগাইবার চেষ্টাও ইহার একটি লক্ষণীয় বিশেষত্ব। 'বঙ্গীয় ভাষা ও হিন্দু জাতির বিদ্যা'—(৪র্থ ভাগ ২৯ সংখ্যা) প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে ঃ

"অপর গ্রীক জাতীয় ব্যক্তিদিগের মধ্যে যিনি খগোল বিদ্যা প্রচার করেন তিনি স্বীকার করিয়াছেন যে তাঁহার ঐ বিদ্যা ভারতবর্ষ হইতে উপার্জ্জিত এবং যৎকালে ভারতবর্ষে গৌতমাদি মুনি ন্যায় প্রভৃতি দর্শন শাস্ত্র করেন, তাঁহার পাঁচশত বৎসর পরে খ্রীষ্টের জন্ম হয়, ইহাও ইউরোপ জাতীয়দিগের গ্রন্থে লিখিত, অতএব এই সকল লৌকিক প্রমাণ দ্বারা বোধ হইতেছে যে সংস্কৃত ভাষা ইদানীন্তন প্রচলিত তাবৎ দেশীয় ভাষা অপেক্ষা প্রাচীন সুতরাং এতদ্দেশীয় লোকসকল অন্য ২ দেশের লোক অপেক্ষা কালোপোযোগি সভ্য এবং বিজ্ঞ ছিলেন"—

ইহার পর মুস্‌লিম আক্রমণ ও বিবিধ কারণ দেখাইয়া ভারতের বর্ত্তমান দুর্গতির যুক্তিসম্মত ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে এবং ভারতীয়েরা যে মাত্র রক্ষণশীলই নন—যুক্তি ও বিজ্ঞান-বুদ্ধির সাহায্যে নূতনকেও গ্রহণ করিতে সক্ষম, তাহাও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

শিশু "উৎকৃষ্ট স্থানের বিষয়" জানিতে চাহিলে মা একটি সুন্দর কবিতায় তাহাকে স্বর্গভূমির কথা শোনাইয়াছেন। বর্ণনা বেশ কবিত্বময়। কবিতাটি ইংরাজি হইতে অনূদিত। কিছু অংশ এই ঃ

"পূর্ব্বতন কোন খণ্ডে এ দেশ কি হয়।
স্বর্ণময় বালুকায় নদীধারা বয়॥
যথা পদ্মরাগ মণি অতি দীপ্ত করে।
হীরক জ্বলয়ে সেথা আকর ভিতরে॥

নদীর তীরস্থ ভূমি পূর্ণ প্রবালেতে।
মুকুতার ছটা শোভে তাহার মধ্যেতে॥
সেই কি উৎকৃষ্ট স্থান বলি গো জননি।
তথায় তথায় নহে ওরে যাদুমণি॥" (১১শ সংখ্যা)

সুনীতি-সংগ্রহঃ ১৮৬০ সালে প্রকাশিত হয়। ইংরাজী হইতে অনুবাদ করেন হরিশ্চন্দ্র পালিত। ইহার "আভাষে" কেদারনাথ দত্ত জানাইয়াছেন যে, নানা বালকপাঠ্য ইংরাজী পুস্তক হইতে গল্পগুলি আহৃত। "গ্রন্থকর্ত্তা তরুণযৌবন, বিদ্যানুশীলন বিষয়ে তাঁহার সুদীর্ঘ প্রযত্ন। নবীন বয়সে দেশহিতৈষিতা পরম প্রশংসাজনক বটে, গ্রন্থখানি যদিও কতিপয় সামান্য গ্রন্থ অনুগত, তথাপি ইহা শৈশব পাঠক শ্রেণীর উপযুক্ত"। কেদারনাথ ইহা সংশোধন করিয়া দিয়াছিলেন। বইখানি বিদ্যালয়ে পাঠ্য হইবার জন্য লিখিত। আয়তনে অত্যন্ত ক্ষুদ্র—গল্পগুলি বহুল-পরিচিত এবং মোটের উপর বৈশিষ্ট্য-বর্জ্জিত। গল্পের সঙ্গে সঙ্গে ইহাতেও নীতি-শ্লোক আছে। যেমন ঃ

নীতি
মহতের আশ্রয় তো, সুখের আশ্রয়
দৈন্যতা বিষম জ্বর, উপশম হয়।

শরৎকুমারী ঃ "জিলা বর্দ্ধমানের অন্তঃপাতি রামেশ্বরপুর নিবাসি শ্রীসর্ব্বানন্দ রায়" সংবৎ ১৯১৮ (১৮৬২) সালে 'শরৎকুমারী' নামে একখানি ছোট নীতিগর্ভ উপন্যাস রচনা করেন। বোঝা যায় লেখক 'বিজয়-বসন্তের' সাফল্যে অনুপ্রাণিত হইয়াছেন—এটি তাঁহার মৌলিক রচনা।

'বিজ্ঞাপনে' বলা হইয়াছে ঃ "অন্যের দৃষ্টান্ত দর্শন করিয়া আমার নীতিগর্ভ একখানি গ্রন্থ রচনায় প্রবৃত্তি ও উৎসাহ জন্মে। কেবল উপদেশ-ছলে নীতিগর্ভ প্রবন্ধ প্রণয়ন করিলে নীরস বলিয়া সুকুমারমতি-দিগের পঠন প্রবৃত্তি না জন্মিবার সম্ভাবনা আছে। এই ভাবিয়া আমি

শরৎকুমারী নামে নীতিগর্ভ একখানি কাব্য রচনা করিলাম।" পণ্ডিত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ গ্রন্থটি সংশোধন করিয়া দিয়াছিলেন।

সংক্ষেপে গল্পটি এই :

চন্দ্রপুরের অপুত্রক রাজা চন্দ্রসেন পুণ্ডরীকাক্ষ মুনির নিকট পুত্র বর প্রার্থনা করিয়া জানিতে পারেন যে পূর্ব্বজন্মে তিনি এক তপস্যারত মুনির গায়ে বাণ নিক্ষেপ করিয়াছিলেন; সেই মুনির অভিশাপেই এ জন্মে তিনি পুত্রমুখ দেখিতে পাইবেন না।

পুণ্ডরীকাক্ষের বরে রাজার অবশ্য একটি কন্যা হইল। শরৎকালে জন্ম বলিয়া কন্যার নাম হইল "শরৎকুমারী"। শরৎকুমারী যেমন রূপবতী তেমনি বিদুষী। উপন্যাসটির মূল কথা শিক্ষা, শরৎকুমারীর বিদ্যার্জ্জন সম্বন্ধে মন্ত্রা বলিতেছেন :

"বিদ্যা অমূল্য ধন। বিদ্যাদ্বারা হিতাহিত বিবেচনা ও ধর্ম্মজ্ঞান হয়, বিদ্যা শিক্ষা করিলে সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বব্যাপী পরাৎপর পরমেশ্বরের অত্যাশ্চর্য্য কীর্ত্তি সকল জানিতে পারা যায়, বিদ্যারূপ চক্ষুদ্বারা অপ্রত্যক্ষ বিষয় সকলও দেখিতে পাওয়া যায়, বিদ্যা সম্পত্তি ও সম্মানের প্রসূতিস্বরূপ, অন্যান্য ধন তস্কর কর্ত্তৃক অপহৃত হইবার সম্ভাবনা আছে, কিন্তু বিদ্যাধন কাহারও অপহরণ করিবার সাধ্য নাই......"

বিদুষী কন্যাটি স্বয়ম্বরা হইয়া রূপবান ও বিদ্বান সূর্য্যকান্তকে বিবাহ করিলেন। উভয়ে চন্দ্রচূড় দর্শনের পর দেশে ফিরিতে থাকেন, পথে সূর্য্যকান্ত এক রাক্ষস বধ করেন ও ব্রাহ্মণদের আশীর্ব্বাদ লাভ করেন। আপন দেশে ফিরিলে মাতাপিতা তাঁহাদের দেখিয়া সুখী হন এবং পৌত্রের মুখ দর্শনে রাজার মনস্কামনা পূর্ণ হয়। সূর্য্যকান্তের পুত্রও পিতার তুল্য কৃতী হইয়াছিলেন।

রচনায় বিশেষ নৈপুণ্য নাই—তবে ঘটনার বৈচিত্র্য থাকায় কৌতূহল নষ্ট হয় না। ১৮৬৪ সালে ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছিল।

পদ্মপুণ্ডরীক—১২৬৯ সাল (১৮৬২) এবং **চারুচরিত্র**—১২৭০ (১৮৬৩)।

"বিজয়-বসন্তের" রচয়িতা হরিনাথ মজুমদার এই দুইখানিও বালকদের জন্য রচনা করিয়াছিলেন। প্রথমটি কতগুলি কবিতার সমষ্টি ; দ্বিতীয়খানি প্রাচীন ভারতীয় দ্বাদশটি মহৎ শিশুর চরিত্রের নানা ছন্দে বর্ণনা। এই শিশুদের মধ্যে ধ্রুব, অভিমন্যু, ভগীরথ, প্রহ্লাদ, কচ ও নিমাই প্রভৃতি রহিয়াছেন। 'পদ্ম পুণ্ডরীক' হইতে একটি কবিতার কিছু পংক্তি এই :

রাজ্য-নাশ হেতু, রাজ অবিচার।
কার্য্য-নাশ হেতু, আলস্য সবার॥
বুদ্ধি-নাশ হেতু, মাদক সেবন।
ঋদ্ধি-নাশ হেতু, জ্ঞাতি বিরোধন॥
স্বাস্থ্য-নাশ হেতু, রাত্রি জাগরণ।
কান্তি-নাশ হেতু, অমূল্য চিন্তন॥
মান-নাশ হেতু, মিথ্যা আচরণ।
প্রাণ-নাশ হেতু, রিপু-পরায়ণ॥

('নাশের হেতু'—সাহিত্য-সাধক চরিত মালা, হরিনাথ মজুমদার)

বোধেন্দুদয় : শ্রীরাধামাধব মিত্র[১] রচিত, ১৮৬৩ সাল। লেখক ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের শিষ্য এবং গুরুর মৃত্যুর পরে "প্রভাকর" পত্রিকার সম্পাদনার সহিত যুক্ত ছিলেন। 'বোধেন্দুদয়' নীতিগর্ভ গ্রন্থ—পদ্যে গদ্যে রচিত। লেখক ভূমিকায় বলিয়াছেন : "এই পুস্তকখানি বালক-বালিকাগণের পাঠোপযোগী হইতে পারিবে এমন প্রত্যাশাও করিতেছি।"

রূপকছলে রচিত বইটির আরম্ভ এইরূপ :

একদিন একা আমি করিয়া শয়ন।
ভাবিতেছিলাম কত মুদিয়া নয়ন॥

১। রাধামাধব "শীল্‌স্ ফ্রী কলেজের" দ্বিতীয় শিক্ষক ছিলেন। ইনি পাঠ্যপুস্তকরূপে পাঁচখণ্ড 'কবিতাবলী'ও প্রণয়ন করিয়াছিলেন।

নানা ভাবে ভরা ছিল, মানস-ভাণ্ডার।
না ফুরাতে একবার পুনঃ আসে আর॥
অপরূপ ভাব শেষে হইল উদয়।
বাড়িতে লাগিল ক্রমে কেবল সংশয়॥
সংসারেতে হিতকর বিদ্যা আর ধন।
কি ছোট, কি বড় কিসে করি নিরূপণ॥

স্বপ্নে তিনি নিবিড় গহনে উপস্থিত হইলেন। তথায় এক দিব্য জ্যোতিঃ দৃষ্ট হইল। এক হর্ম্ম্য দেখিয়া প্রবেশ করিলেন, তাহার দ্বারে দ্বারে নারী রক্ষী দেখিয়া এক দ্বারপালিকাকে হর্ম্ম্যের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে উত্তর পাইলেন ঃ

"কর প্রণিধান, বাছা কর প্রণিধান।
সবে জানে বঙ্গভাষা মম অভিধান॥
এই দ্বারে বাস আমি করি চিরদিন।
এ দ্বারে প্রবেশে যারা আমার অধীন॥
দ্বারে দ্বারে হেরিতেছ যে সব কামিনী।
এক এক ভাষা তাঁরা দ্বারের রক্ষিণী॥
লাঠিন্, গিরিক্, হিব্রু নানা ভাষা আর।
নিয়ত করেন রক্ষা যাঁহার যে দ্বার॥"

শেষে কে বড় কে ছোট ইহা লইয়া লক্ষ্মী-সরস্বতীর বিবাদ এবং সরস্বতীর জয়। লেখকের নিদ্রাভঙ্গ।

"নিদ্রা ভঙ্গ হোলে পরে, করি হায় হায়।
কি সুখে ছিলাম আমি সুখের নিদ্রায়॥
আরো কত শুনিবারে ছিল অভিলাষ।
আহা মরি, একেবারে হলেম হতাশ।"—

রূপকের উদ্দেশ্য সাধু—পয়ার সরল। বৈশিষ্ট্য কিছুই নাই। অক্ষয়কুমার দত্তের সুপরিচিত "স্বপ্নদর্শন" দ্বারা লেখক প্রভাবিত হইয়াছেন।

সুবোধেতিহাস—.

"সুশীল নামক সুবোধ বালকের সচ্চরিত্রতা ও বিদ্যাভাষাদি বিষয়ক প্রস্তাব।" রচয়িতা বিশ্বম্ভর দত্ত, ১২৭০ (১৮৬৪) সাল।

বিদ্যার মর্ম্ম সম্যক্ রূপে জ্ঞাত করাইবার জন্য সুশীল নামক একটি বালকের অভিজ্ঞতা ও শিক্ষার বিষয় ইহাতে বর্ণনা করা হইয়াছে। ইহাকে কবিতায় উপন্যাস বলিতে পারি। লেখাটি সম্পূর্ণ মৌলিক নয়, লেখকের স্বীকারোক্তি ভূমিকায় এইভাবে আছে: "শ্রীনারায়ণ চট্টোরাজ গুণনিধি মহোদয়[১] বিরচিত 'গদ্যনীতিমঞ্জরী' নামক প্রবন্ধ অবলম্বন পূর্ব্বক এই অভিনব পুস্তক পয়ারাদি ছন্দে ছন্দোবন্ধ করিয়া জনসমাজে প্রচার করিতেছি।"

অর্থাৎ নারায়ণ চট্টোরাজকৃত গদ্য গ্রন্থের ইহা পদ্য রূপায়ণ। চট্টোরাজ মহাশয়ের মূল বইটি পাই নাই—ইহা দেখিয়া মনে হয়, সেটিও একখানি শিক্ষামূলক উপন্যাস। বিশ্বম্ভর দত্তের কবিত্ব প্রশংসা করিবার মতো নয়—মিল ও ছন্দের ত্রুটি রহিয়াছে, কিঞ্চিৎ কাব্য-কণ্ডূয়ন ব্যতীত আর বিশেষ কিছুই ইহাকে বলা যায় না। সামান্য নিদর্শন দিতেছি:

"নৃপের এমত বাণী, সুশীল কর্ণেতে শুনি
স্মিতমুখে কহিতে লাগিল।
মহারাজ আপনার সুখ্যাতি খ্যাত সংসার,
অবিদিত নহে কোন স্থল॥
সাধারণ জনগণে তবোক্ত প্রশ্ন শ্রবণে,
কঠিন বলিয়া বটে মানে।
কিন্তু বিজ্ঞ জনগণ, করি প্রশ্ন আকর্ণন,
সদা ভাবে অতি লঘু জ্ঞানে॥

১। নারায়ণ চট্টোরাজ গুণনিধি 'কলি-কুতুহল' এবং 'কলি-কৌতুক' নামে দুইখানি প্রহসন রচনা করিয়া কিছু খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন।

কেন না যাহার জন্য, প্রত্যক্ষ মর্ত্ত্যভুবনে,
সচল সচল জীবগণ।
স্থল জল আদি করি কানন ভূধর গিরি,
সর্ব্বস্রষ্টা করেন সৃজন—"

যিনি "লাগিল"র সঙ্গে "স্থলের" এবং "জন্যে"র সঙ্গে "ভুবনের" মিল দেন, তাঁহার কবিতা রচনা বিড়ম্বনা। ছন্দের খঞ্জগতিও লক্ষণীয়। সুবোধ বালক সুশীলের এই কাব্য-কাহিনী সমাদৃত হইয়াছিল, এরূপ অনুমান করা কঠিন।

পদ্যপাঠ: ১৮৬৪ সালের শেষদিকে (অথবা ১৮৬৫র বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে) হুগলী নর্ম্মাল স্কুলের অধ্যক্ষ ব্রহ্মমোহন মল্লিকের প্রেরণাতে যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায় তাঁহার সুপরিচিত 'পদ্যপাঠ' রচনা করেন। ১৮৬৬ সালে (সংবৎ ১৯২৫) তিনি আর একখণ্ড গ্রন্থ রচনা করেন এবং প্রথম খানিকে দ্বিতীয় ভাগ এবং দ্বিতীয় খানিকে প্রথম ভাগরূপে চিহ্নিত করিয়া দেন। বিদ্যালয়ের ছাত্রদের লক্ষ্য করিয়াই বই দুখানি লেখা, কিন্তু ইহার নেপথ্যে উচ্চতর আর একটি উদ্দেশ্যও ছিল। ১৮৬৬ সালের প্রথম ভাগের ভূমিকায় লেখক জানাইয়াছেন: 'গদ্য হইতে পদ্যের রচনা প্রণালীর বিভিন্নতা এবং যে সমস্ত গুণ থাকিলে কবিতা হৃদয়গ্রাহিণী হয়, তাহা বালকদিগকে হৃদয়ঙ্গম করিয়া দেওয়া উচিত। কেবল মিল, অনুপ্রাস এবং শ্লিষ্ট শব্দের প্রয়োগ থাকিলেই কবিতা হয় এই ভ্রমাত্মক সংস্কার যতদিন এ দেশ হইতে অপনীত না হইবে, ততদিন বাংলা কবিতার হৃদয়গ্রাহিতা ও ওজস্বিতা গুণের অভাব থাকিবে।"

দেখা যাইতেছে, যদুগোপাল কেবল বিদ্যালয়োপযোগী নীতি-গর্ভ কবিতা রচনা করিতেই চান নাই, তিনি বালক-বালিকাদের কাব্যবোধও জাগাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার স্বরচিত বহু উৎকৃষ্ট কবিতা তো আছেই—ঈশ্বর গুপ্ত, মদনমোহন তর্কালঙ্কার দ্বারকানাথ অধিকারী, কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার ও রামসুন্দর ঘটক

প্রভৃতি অনেকের কবিতাই তিনি সংগ্রহ করিয়াছেন। অন্যূন ৭০।৭৫ বৎসর ধরিয়া পদ্যপাঠ বাংলা দেশের ছেলেমেয়েদের কণ্ঠে কণ্ঠে ঘুরিয়াছে, লক্ষ লক্ষ গ্রন্থ প্রচারিত হইয়াছে। কবিতাগুলির মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের "বিদ্যা" (মন দিয়া কর সবে বিদ্যা উপার্জ্জন), দ্বারকানাথ অধিকারীর "ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি" (দয়ার সাগর সর্ব্বগুণাকর যিনি অখিলের স্বামী), কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের "ঈশ্বরই প্রকৃত বন্ধু" (ফুটিয়াছে সরোবরে কমলনিকর) ও মদনমোহন তর্কালঙ্কারের "পাখী সব করে রব রাতি পোহাইল" ইত্যাদি।

বিষয় নির্ব্বাচন অতি সুচিন্তিত। "পলায়িত গাভীর" সাহায্যে ভৌতিক-ভীতির কুসংস্কার নিরসন প্রয়াস; "রেল গাড়ী", "টেমস্ নদীর সুড়ঙ্গ" প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক বিষয়ের সুলিখিত বর্ণনা; স্বর্ণ ও লৌহের বিবাদের মধ্য দিয়া লৌহের উপকারিতা বুঝাইবার চেষ্টা —সব দিক দিয়া পদ্যপাঠ বালক-বালিকাদের আদর্শ কবিতা গ্রন্থ হইয়া উঠিয়াছিল।

ইহার পরিচয় অনাবশ্যক। যদুগোপালের পদ্যপাঠেই বস্তুতঃ শিশু-পাঠ্য কবিতার সার্থক মান সর্ব্বপ্রথম নির্দ্ধারিত হইয়া গিয়াছে। অতি-বিস্তার নিরর্থকবোধে যদুগোপালের একটিমাত্র কবিতা এখানে উদ্ধৃত করিলাম:

সময় অমূল্য

ধন বিনিময়ে লোক যত দ্রব্য পায়,
আছে মহামূল্য যত সামগ্রী ধরায়—
ধন দিলে কি না মিলে হয়ে ধনেশ্বর,
গোলকুণ্ডা প্রদেশের হীরক আকর,
পারস্য সাগরে মুক্তা শুক্তি সমুদয়,
ইচ্ছা হলে টাকা দিয়ে কর তুমি ক্রয়।

সময় হইলে গত কিন্তু একবার,
পারে কি কিনিতে কেহ ক্ষণমাত্র তার ?
রাশি রাশি ধন দাও অমূল্য সময়
একবার গেলে আর আসিবার নয়।
নিতান্ত নির্বোধ যেই শুধু সেই জন,
অমূল্য সময় করে বৃথায় যাপন। (প্রথম ভাগ)

লঘুপাঠ পন্থঃ ১৮৬৪ সালে তিনকড়ি মুখোপাধ্যায় রচনা করেন। এখানিও শিশু-কবিতার সমষ্টি, কিন্তু সম্পূর্ণ মৌলিক নয়। 'বিজ্ঞাপনে' বলা হইয়াছে, 'নড়াইল বঙ্গ বিদ্যালয়ের প্রধান পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অমর নাথ শর্ম্ম মহাশয় আমাকে এই পুস্তকখানি নানা ইংরাজি গ্রন্থ হইতে ভাব সংগ্রহ করিয়া অনুবাদ করিতে বাধ্য করেন।"

কবিতাগুলি উপদেশপূর্ণ, রচনাও নেহাৎ মন্দ নয়। মনে হয়, পাঠ্যরূপে বইখানি প্রচার লাভ করিয়াছিল।

সুখী কে ?

দেছেন ঈশ্বর যায় বহুতর ধন,
করিতে সদ্ব্যয় যার দিয়াছেন মন॥
সেই হয় সর্ব্বপ্রিয়, করে খ্যাতিলাভ,
হৃষ্ট হয়ে দেখে সদা আপনার লাভ॥
যে হেতু থাকিলে ধন ভাবে সেই জন।
পারিছে অশেষ হিত করিতে সাধন॥
অনাথের নাথ হয়ে সেই মহাজন।
কভু যদি অনাথেরে করেন পীড়ন॥
সতত দুঃখের বোঝা করি অন্বেষণ।
সাথে করি সেই ভার কাটান জীবন। ইত্যাদি

(পৃঃ—২১)

চরিতাষ্টক :

১৮৬৭ সালে আটজন কৃতী বাঙালীর জীবন অবলম্বন করিয়া কালীময় ঘটক বইখানি রচনা করেন। ইহার দ্বিতীয় ভাগ 'দ্বিতীয় চরিতাষ্টক' নামক প্রকাশিত হয় কয়েক বৎসর পরে—১৮৮২ সালে ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ দেখিয়াছি। প্রথিতযশা বাঙালী সুসন্তানদের জীবনী রচনার ইহাই সর্ব্বাদি প্রয়াস এব' সেইদিক হইতে বইখানি উল্লেখযোগ্য। ১৮৯৪ সালে প্রকাশিত শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্নের বহুল-প্রচারিত 'চরিতমালা' কালীময়ের অনুপ্রেরণাতেই রচিত হইয়াছিল। রাজা রামমোহন রায়, হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় হইতে আরম্ভ করিয়া দ্বারকানাথ ঠাকুর, রামগোপাল ঘোষ ও রাধাকান্ত দেব প্রভৃতি কালীময়ের গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত।

কালীময়ের দুইটি গ্রন্থই সমাদর এবং অভিনন্দন উভয়ই লাভ করিয়াছিল। ১২৭৪ সালের ২৫শে চৈত্র 'সোমপ্রকাশ' লিখিয়াছিলেন— "আমাদের এমনি এক বিষম রোগ জন্মিয়াছে যে আমরা স্বদেশীয় মহাত্মাগণের প্রতি একবারও দৃষ্টি না করিয়া বিদেশীয়গণের জীবন-চরিতের অনুবাদ করিয়া আপনাদিগকে কৃতার্থ জ্ঞান করি। যদি গ্রন্থকারগণ ইহা না করিয়া স্বদেশীয় ব্যক্তিগণের গুণ প্রকটনে প্রবৃত্ত হন তাহা হইলে তাঁহাদিগের শ্রম সার্থক হয়।"

ভূদেব লিখিয়াছিলেন, "আমার মতে 'চরিতাষ্টক' অতি উৎকৃষ্ট পুস্তক হইয়াছে।" তিনি বইখানিকে শিক্ষা-বিভাগে অনুমোদিত করেন।

রচনা সরল, দেশাত্মবোধে অনুরঞ্জিত, জীবনীগুলি তথ্যপূর্ণ। লেখকের পরিশ্রম ও সদিচ্ছা সর্ব্বত্র সুপ্রকট। রচনার নিদর্শন উদ্ধৃত করিলাম :

"কিছুদিন পূর্ব্ব হইতেই সাহেব ও সুশিক্ষিত বাঙ্গালীদের মধ্যে মনোবাদ চলিয়া আসিতেছিল। সাহেবদের বিবেচনায় তখনকার

সুশিক্ষিতগণ অত্যন্ত অবিনয়ী হইয়া উঠিয়াছিলেন, যে হেতু তাঁহারা প্রাচীন বাঙ্গালীদের ন্যায় সাহেবদের সম্মান করেন না এবং জেতৃগণের সঙ্গে রাজনৈতিক সমান স্বত্ব ভোগ করিতে চান। রামগোপালের সভায় বক্তৃতাদ্বারা সুশিক্ষিতগণের মত সমর্থিত হইত। এই জন্য এই সময়ে ঐ মনোবাদ আরও বৰ্দ্ধিত হইয়াছিল। বিশেষতঃ ঐ সময়ে গবর্ণমেণ্টে একটি ফৌজদারি আইনের পাণ্ডুলিপির বিচার হইতেছিল। তাহাতে সাহেব ও বাঙ্গালিদিগকে একবিধ শাসনের অধীন করা প্রস্তাবিত হইয়াছিল। রামগোপালের সভা উহার পক্ষতা করিয়াছিলেন। সাহেবরা ইহা জানিতে পারিয়া 'তেলে বেগুনে জ্বলিয়া গেলেন'। রামগোপালই 'অসমান ব্যক্তিগণের মধ্যে সমতা স্থাপনের মূল' ইহা স্থির করিয়া তাঁহার উপর বিদ্বেষ প্রকাশ ও তাঁহার দুর্নাম রটনা করিতে লাগিলেন।"

(চরিতাষ্টক—দ্বিতীয়, রামগোপাল ঘোষ,
পৃঃ ১৭৩—৭৪)

নীতি রত্নাকর :

ভাজনঘাট নিবাসী শ্রীশ্রীনাথ গুপ্ত প্রণীত '১২৯০ শক'—অর্থাৎ ১৮৬৮। কালিদাসের রঘুবংশ হইতে বিখ্যাত শ্লোকটি নামপত্রে উদ্ধৃত হইয়াছে :

"মন্দঃ কবিযশঃপ্রার্থী গমিষ্যাম্যুপহাস্যতাং
প্রাংশুলভ্যে ফলে লোভাদুদ্বাহুরিব বামনঃ।"

ইহাও একটি মৌলিক শিশু-উপন্যাস রচনার চেষ্টা। "বিজ্ঞাপনে" লেখক বলিতেছেন : "ভেলায় করিয়া সমুদ্রপার যেমন কোনমতেই হইতে পারে না, এবং তাহাতে যেমন অসমসাহসিকতার মাত্র প্রকাশ হয় মাদৃশ জনের গ্রন্থ লিখিয়া গ্রন্থকার বলিয়া পরিচিত হওয়াও সেইরূপ।...ইহা কোন গ্রন্থের অনুবাদ, কিনা, তাহা সাহস করিয়া প্রকাশ করিতে পারি না। কেহ কোন গ্রন্থের অনুবাদ বলিয়া আদর

করেন, কেহ বা অমুক গ্রন্থের অনুবাদ মাত্র বলিয়া আস্থা প্রদর্শন করেন না। এমন স্থলে তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করাই বিধেয়।...ইহা কোনরূপে বালকদিগের উপকারে আইলেই শ্রম সকল জ্ঞান করিব।"

চার 'সর্গে' বিভক্ত একটি ছোট উপন্যাস। অনুবাদ হইতেই পারে না। গল্প এই:

ভূপাল প্রদেশের ভূতপুর অতি পাপের জায়গা। সেখানে ধনাঢ্য হরকুমারের পুরঞ্জয় নামে দৈত্যকুলে প্রহ্লাদরূপী একটি সুপুত্র জন্মিল। জ্ঞানভিক্ষু পুরঞ্জয়ের মনে বাল্যেই প্রশ্ন জাগিল: "ঝটিকা ও বারিবর্ষণের নিয়ম কি, গ্রীষ্মকালেই বা ঝটিকা ও অধিক পরিমাণে বারিবর্ষণ হয় কেন এবং শীতকালেই বা তাদৃশ না হইবার কারণ কি?" ইত্যাকার জিজ্ঞাসায় বিব্রত পুরঞ্জয় জ্ঞানের সন্ধানে দেশত্যাগী হন—এক মহাত্মার আশ্রয় পান,পরম জ্ঞানী হইয়া দেশে ফেরেন।

মূল গল্প পুরঞ্জয়ের পুত্র প্রিয়কুমারকে লইয়া। আত্মীয়দের চক্রান্তে বালক প্রিয়কুমার সর্ব্বস্বান্ত হইয়া বনে যান। এক মুনি প্রিয়কুমারকে চরণে স্থান দেন। সেখানে প্রিয়কুমার বহু জ্ঞান লাভ করেন, পরে উজ্জয়িনীরাজ হরেন্দ্রকুমারের কন্যাকে বিবাহ করিয়া রাজা হন। গল্প কম—দীর্ঘ দীর্ঘ উপদেশ সর্ব্বত্র পরিকীর্ণ—মধ্যে মধ্যে প্রায় প্রবন্ধের রূপ লইয়াছে। লেখার মধ্যে একটি বাস্তব ঘটনা—সম্ভবতঃ নিজ গ্রামের রক্ষণশীল সমাজের অন্যায়-অবিচারের একটি রূপক নিহিত আছে বলিয়া যেন মনে হয়। অন্ধ প্রাচীন-পন্থার প্রতি ধিক্কার এবং নূতন শিক্ষা-দীক্ষা, যুক্তিবাদ এবং বৈজ্ঞানিক মননের সমর্থন রহিয়াছে।

গল্পে কোনো কৃতিত্ব নাই। উপদেশের আতিশয্যে এবং ভাষার পণ্ডিতী পদ্ধতিতে চিত্তরঞ্জন অপেক্ষা শিশুদের বিরাগ সৃষ্টির সম্ভাবনাই বেশী। রচনার বহু স্থানই সংস্কৃত নীতি-শ্লোকের আক্ষরিক অনুবাদ। ভাষার কিছু নমুনা: "মধ্যে এক অত্যুন্নত শৃঙ্গ আছে, পর্ব্বতের কটিদেশ হইতে শৃঙ্গ পর্য্যন্ত সমুদায় ভাগ তুষারে ধবলাকৃতি হইয়াছে;

প্রতীয়মান হইতেছে যেন ঊর্ধ্ববাহু হর, প্রস্তরাসনে আসীন হইয়া যোগসাধন করিতেছেন। নিতম্বদেশে গৈরিকাদি বিশিষ্ট শৃঙ্গসকল বিরাজ করিতেছে তদুপরি সূর্য্যরশ্মি পতিত ও প্রতিফলিত হইয়া সুমেরুশৃঙ্গশোভাকেও পরাজিত করিয়াছে। ঐ শৃঙ্গমূল হইতে প্রস্তরাভায় কৃষ্ণসলিলা গিরিনদীসকল নির্গত হইয়াছে। তাহাদের অতুলিত শোভা বীর রমণীগণের পৃষ্ঠদেশে লম্বমানা স্বর্ণতৃণবদ্ধা বেণীর শোভাও বিজিত করিয়াছে।" (পৃঃ ১৭)

বনগাঁয়ে শিয়াল রাজা

লণ্ডনের ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরিতে বইখানি আছে।১ পড়িতে অত্যন্ত কৌতূহলোদ্দীপক। মুনশী নামদার (জেলা হুগলী থানা হরিপাল সাং বন্দিপুর, সন ১২৭৫, ১৮৬৮) গদ্যে পদ্যে প্রাচীন ঐতিহ্যের সঙ্গে সম্পর্ক রাখিয়া বইখানি রচনা করিয়াছেন। গ্রন্থটি এদেশে অলভ্য বলিয়া কিছু বিস্তৃতভাবে উদাহরণ দেওয়া যাক:

আরম্ভের গীত : বনগাঁয়ে শিয়াল রাজা তাঁর তিনজন হয় মড়লী। কেহ না কারে দেক্তে পারে ঘরে ঘরে হয় দলাদলি।—ইত্যাদি

ইহার পরে পয়ার :

প্রথমে সে নিরঞ্জনে করিয়া স্মরণ। অপূর্ব রসের কথা করিব রচন। এমন রসের কথা ছিল যে গোপনে। শুনিলে আহ্লাদ বাড়ে রসিকের মনে—॥২ রুম দেশে ছিল এক অরণ্য কানন। শিয়াল পাইল তথা রাজ সিংহাসন॥ রাজত্ব করেন বসে রাজসিংহাসনে।

১। ডক্টর তারাপদ মুখোপাধ্যায়ের সৌজন্যে সংগৃহীত।

২। ডক্টর সুকুমার সেন ইহা ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়ের ছদ্মনাম বলিয়া মনে করেন। আমরা তাঁহার অনুমান মানিতে পারিলাম না। (দ্রঃ বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ, ১৩০)

গলে গজমতি হার রজত আসনে॥ একদিন মনে মনে করে আপনার। দেশেতে মড়ল চাই করিতে বিচার॥ মড়ল বিহনে গ্রামে হয় গণ্ডগোল। ইহা বুঝি তিনজন করেন মড়ল। বানর ও ছুঁচা আর পেঁচা মহাশয়। মড়লী দিবাতে রাজসভাতে ডাকায়॥……

বাঘ প্রজার সহিত খেঁকশেয়ালী ঠকের সাক্ষাৎ :

বাঘ॥ কে হে বাবু খেঁকশিয়ালীর পো বহুদিন সাক্ষাৎ হয় না যে। **খেঁ-ঠক**॥ যে আজ্ঞা আমি আপনার কাছে যাব বলে মনে করে যাচ্ছিলাম। **বাঘ**॥ কেন হে বাবু এত অনুগ্রহ যে। **খেঁ-ঠক**॥ মহাশয় জানেন নাকি? এ গ্রামে বাস করা ভার হয়েছে।

বাঘ॥ সে কি রে সব মঙ্গল তো।……

বাঘের গীত

ভয় লাগে কি তারে দেখে আমার সাধ
করে। যশ কি হবে আমার, মেলে
ছুঁচা পেঁচা বানরে। তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করা
ভেড়ার শিঙ্গে ভাঙ্গে হীরা

আমারে লাঞ্ছনা দিবে আমার জেতে শুনলে পরে।"

খেঁকশিয়ালীর শঠতায় বাঘের সঙ্গে তিন মোড়লের বিবাদই গ্রন্থের আখ্যানাংশ। গদ্যে পদ্যে পাঁচালীর ঢঙে রচিত বইখানি সরস এবং উপভোগ্য। গ্রন্থের শেষে বাঘ, রাজা ও মোড়লদের পরাজিত করিয়া কি ভাবে বনের আধিপত্য লাভ করিল, তাহাই সুরসাল ভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

বইখানি গ্রাম্য-প্রতিভার একটি সুন্দর নিদর্শন। বিশুদ্ধ গল্প-চর্চ্চার জন্য রচিত হইতে পারে, আবার স্থানীয় দলাদলির প্রতি

কিছু কটাক্ষপাতও ইহাতে থাকিতে পারে। মোটের উপর অত্যন্ত উপাদেয়। উপদেশ-গম্ভীর নাগরিক বালক-সাহিত্যের মধ্যে এই বইখানি পল্লীমৃত্তিকার একটি স্নিগ্ধ সৌরভ বহিয়া আনে।

চরিত মঞ্জরী ঃ ১৮৬৮ সালে কালীপ্রসন্ন রায় এই নূতন ধরণের জীবনী-সংগ্রহটি রচনা করেন। ইহার বৈশিষ্ট্য এই যে ইহা "কতিপয় প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ গভর্ণর জেনালে জীবন বৃত্তান্ত সম্বলিত। এতদ্দেশে ইংরাজ অধিকার আরম্ভ অবধি লর্ড ক্যানিঙের আধিপত্য সমাপ্তি পর্য্যন্ত সংক্ষিপ্ত ইতিহাস"। ইংরাজী ও বাংলায় দুইটি ভূমিকা দেওয়া হইয়াছে। "বাঙ্গালা বিদ্যালয় সকলের উপযোগী করিবার নিমিত্ত সাধ্যানুসারে চেষ্টা" করিয়াছিলেন লেখক। ইহারই রূপান্তর 'লঘু চরিত মঞ্জরী' (১৮৮০)।

বিভিন্ন ইংরাজ রাজপুরুষদের এই জাতীয় চরিত-সংকলন আর দেখি নাই। পরবর্ত্তীকালে "England's Work in India" নামে যে বইখানি রাজভক্তি জাগ্রত করাইবার জন্য ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার্থীদের বাধ্যতামূলক ভাবে পড়ানো হইত, ইহাতে তাহারই সূত্রপাত। বিভিন্ন গভর্ণর জেনারেলের শাসন-পর্ব্বের মধ্য দিয়া ইংরেজোত্তর ভারতের একটি সামগ্রিক ইতিহাসও ইহাতে লভ্য।

লেখক পণ্ডিত ব্যক্তি—এবং বিবিধ গ্রন্থ ও পত্রিকা অবলম্বনে বইটি রচনা করিয়াছেন। কিন্তু ইংরাজ-আনুগত্যের ফলে ইহার অধিকাংশ বক্তব্যই এক তরফা—বিশেষ করিয়া "লর্ড ডালহৌসী", "লর্ড ক্যানিঙ ও সিপাহী বিদ্রোহ" প্রসঙ্গে তাহা লক্ষিতব্য। সিপাহী-বিদ্রোহের আর একদিক লইয়া টমসন্ তাঁহার "On the other side of the Medal" লিখিয়াছেন—সেই দিকটি চোখে পড়িবার সম্ভাবনা কালীপ্রসন্ন রায়ের ছিল না।

রচনা উৎকৃষ্ট, বর্ণনা সুন্দর। প্রথমাবধি লেখক পাঠকের মনে কৌতূহল জাগাইয়া রাখিতে জানেন। দৃষ্টিভঙ্গির কথা বাদ দিলে, বইখানির সাহিত্যিক মূল্য আছে। রচনার নিদর্শন ঃ

"গঙ্গাধর রাও বৃটিশ রেসিডেন্টকে এই পত্র প্রেরণ করিবার কিয়দ্দিন পরে পরলোক গমন করেন। তাঁহার পত্নী লক্ষ্মীবাই তেজস্বিনী ও বুদ্ধিমতী ছিলেন। তিনি অবিলম্বে স্বামীর প্রার্থনা পূরণ করিবার জন্য লর্ড ডেলহৌসীর নিকটে একখানি আবেদন পত্র পাঠাইলেন, কিন্তু গবর্ণর জেনারল তাঁহার আবেদন গ্রাহ্য না করিয়া ঝান্‌সি বৃটিশ অধিকারভুক্ত করিতে আদেশ করেন। লক্ষ্মীবাই তাঁহার আদেশ রদ করিবার জন্য বিস্তর চেষ্টা পাইয়াছিলেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু করিতে পারিলেন না। একদা বৃটিশ রেসিডেন্ট তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করাতে তিনি পরদার পশ্চাতে দাঁড়াইয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিয়াছিলেন, 'মেরা ঝান্‌সি দেগা নেহি', কিন্তু তিনি বাক্যে যেরূপ তেজস্বিনী ছিলেন, কার্যে তৎকালে ততদূর ছিলেন না, সুতরাং তাঁহার ক্ষুদ্র রাজ্য ঝান্‌সি উত্তর পশ্চিম প্রদেশের সহিত যোজিত হইয়া গেল।" (পৃঃ—১১৪)

হিতোপাখ্যান মালা ঃ

দুই ভাগে প্রকাশিত হইয়াছিল। পঞ্চম সংস্করণ ১৮৭৬ সালে মুদ্রিত হইয়াছে—অতএব অন্ততঃ আরো আট-দশ বছর আগে প্রথম সংস্করণের আবির্ভাব ঘটিয়াছিল মনে হয়। অনুবাদকের নাম নাই—নিবেদনে আছে "গ্রন্থ সংকলনকারী।"

ইহার প্রথম ভাগ পারস্যদেশীয় বিখ্যাত কবি শেখ সাদীর "গোলেস্তাঁ" এবং দ্বিতীয় ভাগ "বুস্তাঁ" হইতে নির্ব্বাচিত গল্প ও সুপ্রসঙ্গের অনুবাদ। পৃষ্ঠাসংখ্যা যথাক্রমে ৮০ ও ১৫১।

'বিজ্ঞাপন' হইতে জানা যায় লেখক পঞ্চম সংস্করণে গ্রন্থে প্রচুর মার্জ্জনা করিয়াছেন। "এই পুস্তক গোলেস্তাঁর সম্পূর্ণ অবিকল অনুবাদ নহে। অনেক স্থলে কোন কোন অংশ পরিবর্ত্তন ও পরিত্যাগ করা গিয়াছে। আবশ্যক মতে কোন কোন স্থলে প্রস্তাবের তাৎপর্য্যমাত্র গ্রহণ করা হইয়াছে। পুস্তকের ভাষা প্রাঞ্জল করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করা গিয়াছে।"

বইটি যে স্বাধীন অনুবাদ বা স্বচ্ছন্দ সংকলন ভূমিকাই তাহার প্রমাণ। বিদ্যালয়ে উচ্চ পাঠ্য বা পুরস্কারগ্রন্থ রূপেও নির্ব্বাচিত হইত বলিয়া মনে হয়। হওয়াই স্বাভাবিক। ভাষা অতি সহজ— সরল ও হৃদয়গ্রাহী। কোন খ্যাতনামা লেখক ইহার নেপথ্যে রহিয়াছেন বলিয়া অনুমান হয়।

সাদীর এই দুখানি বই-ই বিশ্ববিখ্যাত। নীতিশিক্ষার ও ধর্ম্মোপদেশের রত্নাগার রূপে ইহারা দেশে দেশে সমাদৃত হইয়াছে। বাংলা সাহিত্যে কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার হইতে আরম্ভ করিয়া এ-কালের কবিশেখর কালিদাস রায় পর্য্যন্ত সকলেই নানাভাবে গুলিস্তাঁ ও বুস্তাঁর কাছে ঋণী। প্রথম ভাগ গুলিস্তাঁর দুইটি গল্প উদ্ধৃত হইল:

(১)

কেহ বদান্যবর হাতেমকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল যে, "তুমি জগতে কাহাকেও আপনা অপেক্ষা অধিকতর সৎসাহসী দেখিয়াছ বা শুনিয়াছ কি?" তিনি বলিলেন, "হাঁ, একদিন আরবের সমুদয় সম্ভ্রান্ত লোককে ভোজে আহ্বান করিয়া কোন প্রয়োজনবশতঃ প্রান্তরে গিয়াছিলাম। তথায় এক কাঠুরিয়াকে দেখিলাম যে কাঠ সকল পুঞ্জীভূত করিয়াছে। আমি বলিলাম, "তুমি হাতেমের ভবনে কেন যাইতেছ না? বহু লোক অদ্য সেখানে আহার পাইবে।" সেই কাঠুরিয়া বলিল—"যে ব্যক্তি পরিশ্রম করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে সে রুটিকার জন্য হাতেমের নিকট তোষামোদ করিতে প্রস্তুত নয়।" আমি এই কাঠুরিয়াকে আমার অপেক্ষা অধিক স্বাধীন ও সাহসী স্থির করিয়াছি।"

(২)

কেহ বলিয়াছিল যে একদা আমার পাদুকা ছিল না। পাদুকা ক্রয় করিবার অর্থেরও অভাব ছিল। তখন আমি কুফা নগরের সাধারণ ভজনালয়ে আগমন করি, শূন্য পদ বলিয়া মনঃক্ষুণ্ণ ছিলাম। তথায় আসিয়া দেখি যে এক ব্যক্তির পা নাই। তখন আমি নিজের

পাতুকা অভাবে ধৈর্য্যধারণ করিলাম ও ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিলাম। ভোজনতৃপ্ত ব্যক্তির নিকট পলান্ন, শাকান্ন অপেক্ষাও অকিঞ্চিৎকর। কিন্তু ক্ষুধার্ত্ত দরিদ্রের শাকান্ন, পলান্নবৎ উপাদেয়।

দ্বিতীয় ভাগও "বুস্তাঁর অবিকল অনুবাদ নহে। অধিকাংশ স্থলে ভাবমাত্র গ্রহণ করা গিয়াছে।" লেখক ইহার কোনো কোনো প্রসঙ্গ "ধর্ম্মতত্ত্ব" পত্রিকায় প্রকাশ করিয়াছিলেন। এই প্রসঙ্গগুলিও "গুলিস্তার" ন্যায় অপূর্ব্ব। দুইটি উদ্ধৃত কর' হইল ঃ

(১)

একজন বস্ত্রহীন দরিদ্র একটি পয়সা ঋণ দ্বারা একখণ্ড পশুচর্ম্ম ক্রয় করিয়া আপন শরীর আচ্ছাদন করিয়াছিল এবং তখন এই বলিয়া খেদ করে "হায় দুরদৃষ্ট! উষ্ণ চর্ম্মাবরণের ভিতর থাকিয়া আমি যেন অগ্নিতে দগ্ধ হইলাম!"

তাহার এইরূপ কাতরোক্তি শ্রবণ করিয়া কূপবদ্ধ এক অপরাধী বলিয়া উঠিল, "ভ্রাতঃ! খেদ করিও না, ঈশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞ হও যে তুমি আমার ন্যায় অন্ধকারাময় কূপে নিক্ষিপ্ত হও নাই।"

(২)

একটী উদ্যানস্বামীর গর্দ্দভের মৃত্যু হইয়াছিল। তিনি খোর্ম্মা ও দ্রাক্ষাফলে লোকের কুদৃষ্টি না হয় এই কল্পনায় সেই গর্দ্দভের মস্তক উদ্যানপার্শ্বে দীর্ঘ কাষ্ঠ (?) খণ্ডোপরি বাঁধিয়া নিশানের ন্যায় করিয়া রাখিলেন। একদা কোন বহুদর্শী বৃদ্ধ তথায় উপস্থিত হন, তিনি তাহা দেখিয়া হাস্য করিয়া উদ্যানকর্ত্তাকে বলিলেন, "প্রিয়দর্শন! তুমি মনে করিও না যে গাধার মস্তক লোকের কুদৃষ্টি নিবারণ করিবে, এ যখন জীবিত ছিল, তখন আপনার মস্তক ও দীর্ঘ কর্ণ দ্বারা লগুড়ের আঘাত বারণ করিতে পারে নাই, এইক্ষণে তো মৃত। ভিষক্ নিজে রোগে মরেন, তিনি অন্যকে কি রোগমুক্ত করিবেন।"

বুস্তাঁর অনুবাদে সর্ব্বত্র কাহিনীই অবলম্বন করা হয় নাই ; নানাবিধ সৎপ্রসঙ্গ ও নিবন্ধ, প্রার্থনা ও ব্যক্তিগত অনুভূতির কথাও আছে। গোলেস্তাঁর ন্যায় ইহাতে সর্ব্বত্র বালকপাঠ্যতা নাই—বুস্তাঁর অনুবাদে গ্রন্থকার সর্ব্বজনীনতার দিকে লক্ষ্য রাখিয়াছিলেন মনে হয়। "ধর্ম্মতত্ত্বের" সহিত সম্পর্ক দেখিয়া অনুমান হয়, লেখক ব্রাহ্ম-সমাজভুক্ত অথবা সমাজের ঘনিষ্ঠ কেহ ছিলেন। "কলিকাতা ব্রাহ্ম সমাজ" লইতে "তত্ত্ববোধিনীর" আদর্শে "ধর্ম্মতত্ত্ব" প্রচারিত হইয়াছিল "সদ্ভাব শতকের" কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার ইহার রচয়িতা নন তো? ব্রাহ্ম সমাজের সঙ্গে তাঁহার গভীর সম্বন্ধ ছিল এবং পারস্য ভাষায় তাঁহার ব্যুৎপত্তিও সুবিদিত। তাহা ছাড়া "সদ্ভাব শতকে" তিনিও হাফেজের মর্ম্মানুবাদই করিয়াছেন—আক্ষরিক অনুবাদ করেন নাই—সেইটিও লক্ষ্য করিবার মতো।

ষষ্ঠ অধ্যায়

উচ্চ শ্রেণীর পত্রপত্রিকা : স্বর্ণদিগন্ত

॥ ১ ॥

জ্যোতিরিঙ্গণ

এ পর্য্যন্ত শিশু-সাহিত্যের যে বিকাশ আমরা লক্ষ্য করিয়াছি তাহাকে প্রধানতঃ মিশনারী প্রভাবিত বলিতে পারা যায়। বিদ্যাসাগর বা রাজেন্দ্রলালের ন্যায় ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব ঘটিলেও মিশনারীরা যে-ধরণের শিশু-শিক্ষামূলক সাহিত্য গঠনের পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিছু কিছু স্বাধীন লেখকের পদক্ষেপসত্ত্বেও এ পর্য্যন্ত ব্যাপক ভাবে তাহারই অনুবর্ত্তন চলিতেছিল।

দিগ্‌দর্শন হইতে রহস্য সন্দর্ভ পর্য্যন্ত যে-সমস্ত পত্র-পত্রিকার আলোচনা আমরা ইতঃপূর্ব্বে করিয়াছি—তাহাদের মধ্যে শিক্ষা এবং সংস্কৃতিমূলক উদ্দেশ্যটিই ছিল মুখ্য। স্কুল সোসাইটি, স্কুল বুক সোসাইটি এবং গার্হস্থ্য গ্রন্থাবলী সংগঠনের মূলে এই সর্ত্ত প্রথমেই মানিয়া লওয়া হইয়াছিল যে এগুলির সাহায্যে কোনো বিশেষ ধর্ম্মমত প্রচার করা হইবে না; কিন্তু লং-প্র্যাট্-কাউয়েলের ঔদার্য্য সমস্ত মিশনারীর ছিল না। তীব্র বাঙালী ও ভারতীয় বিদ্বেষের বিষে জর্জ্জরিত হইয়া একদল উগ্র খ্রীশ্চান, শিশু এবং নারীদের মধ্যে খ্রীষ্ট ধর্ম্ম প্রচারের প্রয়াস করিতেছিলেন। এই প্রয়াসের একটি অশোভন নিদর্শন—"স্ত্রীলোক ও বালক বালিকাদিগের নিমিত্ত মাসিক পত্র "জ্যোতিরিঙ্গণ"[১] (জোনাকী)। ১৮৬৯ সালের জুলাই হইতে

১। ১৮৬০ সনের জানুয়ারী মাসে খ্রীষ্টান ভার্নাকিউলার এডুকেশন সোসাইটির বঙ্গীয় শাখা "সত্যপ্রদীপ" নামে একখানি শিশুপাঠ্য মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন—বছর চারেক এটি জীবিত ছিল।

ইহা প্রকাশিত হয়। সম্পাদকের নাম ছিল না, "ভবানীপুর, কলিকাতা ট্রাক্‌ট সোসাইটির যন্ত্রে" সাপ্তাহিক সংবাদ যন্ত্রে শ্রীব্রজমাধব বসু কর্ত্তৃক ইহা মুদ্রিত হইত।

বস্তুতঃ এমন নির্লজ্জ ভারতীয় বিদ্বেষ এবং খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচারের অত্যুৎসাহী মনোভাব আর কোনো তথাকথিত শিশু-পত্রিকায় চোখে পড়ে না। ইহাতে শিশু অপেক্ষাও মহিলাদের প্রতি অধিক দৃষ্টি রাখা হইয়াছে এবং কাব্যাকারে, কাহিনীর মাধ্যমে ও নানা আলোচনার সাহায্যে সর্ব্বত্র ক্রিশ্চিয়ানিটির জয় ঘোষণা করা হইয়াছে। প্রথম সংখ্যার ভূমিকায়—"আমোদ ও নীতির" মহান আদর্শ সাড়ম্বরে ঘোষিত হইয়াছে: "আমরা আমাদের কোমলপ্রকৃতি পাঠকবর্গের হস্তে সুন্দর সুন্দর ছবি, সরল ভাষা, নীতিগর্ভ মিষ্ট মিষ্ট গল্প, বিজ্ঞান ও ইতিহাসাদি পূর্ণ প্রবন্ধ প্রদান করিব; কদাচ ভয় প্রদর্শন বা তিরস্কার করিব না। বোধ হয় এমন অবস্থায় আমাদের শিশু পাঠকগণ লোলুপ হইয়া মিষ্টান্নের এই সকল দ্রব্যাদি গ্রহণে আপনা হইতেই যত্নশীল হইবেন।" দামও সুলভ ছিল—প্রতি সংখ্যা মাত্র এক পয়সা।

সাধু প্রস্তাব। সরল ভাষা, সুন্দর ছবি, নীতিগর্ভ গল্প, বিজ্ঞান-ইতিহাস সবই ইহাতে মিষ্টভাবে পরিবেষিত হইত। কিন্তু এই মিষ্ট তত্ত্বের গভীরে ছিল বাঙালী বিদ্বেষ এবং খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচারের কটুস্বাদ বটিকা। শেষের দিকে ইহা খোলাখুলিই প্রচারের তাণ্ডবে মাতিয়া উঠিয়াছিল। ক্রীশ্চান সম্প্রদায়ে "জ্যোতিরিঙ্গণ" হয়তো জনপ্রিয় হইয়া থাকিবে—কিন্তু বিদ্বিষ্ট মনোভাবের জন্য সাধারণ বাঙালী ইহাকে কদাচ গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না।

প্রথম সংখ্যা ষোলো পৃষ্ঠা, তারপর নিয়মিত ভাবে বারো পৃষ্ঠায় "জ্যোতিরিঙ্গণ" প্রকাশিত হইত। ইহাতে বিচিত্র ভাব ও ভঙ্গিতে 'সত্যধর্ম্মের' জয়গান করা হইত। 'বীরাঙ্গনা উপাখ্যান' নাম দিয়া, আলাদা ভাবেও, অহল্যা, গার্গী, মৈত্রেয়ী, মন্দোদরী, দয়মন্তী,

সীতা ইত্যাদির কাহিনী প্রচার করা হইয়াছে এবং প্রায়ই কাহিনীর শেষে একটি চমকপ্রদ নীতিতথ্য দেওয়া হইয়াছে। 'সীতা'র শেষে সিদ্ধান্ত বাক্য এই ঃ "উক্ত বিবরণ পাঠ করিয়া কে না স্বীকার করিবেন, যে বহুবিবাহ রামচন্দ্রের অকারণ বনবাস প্রভৃতি নানা অনর্থের মূল কারণ, যদি দশরথ বহুবিবাহরূপ মহৎ দোষে দোষী না হইতেন, তবে কি সীতার এত অধিক দুর্দ্দশা হইত, না রাজা দশরথ আপনিই অকালে কালকবলে পতিত হইতেন? বর্ত্তমান কালেও কৌলীন্য দূরীভূত হয় নাই। ইহা অতি লজ্জার বিষয়।" (প্রথম খণ্ড, ডিসেম্বর)

প্রথম খণ্ডের সেপ্টেম্বর সংখ্যা হইতে ইহাতে একটি ধারাবাহিক উপন্যাস "স্বর্ণচাঁপা" নিয়মিত প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার ক্রীশ্চান নায়িকা স্বর্ণচাঁপা নারীমহলে খ্রীষ্টমহিমা প্রচারের মহৎ দায়িত্ব লইয়াছে এবং বলা বাহুল্য সম্পূর্ণ সাফল্য লাভ করিয়াছে। দ্বিতীয় খণ্ডের আগষ্ট হইতে "মালতী" নামে একটি কাব্য-সংলাপ ছয় সংখ্যা ধরিয়া লেখা হইয়াছে; তাহাতে তিনজন আছেন ঃ খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বিনী কন্যা মালতী, তাহার হিন্দু মাতা এবং ব্রাহ্মধর্ম্মাবলম্বিনী ভগিনী হেমাঙ্গিনী। ইহাতে মালতী তাহার সুদীর্ঘ বক্তৃতায় এক ঢিলে দুই পক্ষী—অর্থাৎ হিন্দু ও ব্রাহ্মদের নিপাত করিয়া সত্যধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। রচনা অতি নিকৃষ্ট শ্রেণীর, পদ্য বলিলেও ইহাকে সম্মান দেওয়া হয়। এইগুলিই জ্যোতিরিঙ্গণকে অপাঠ্য করিয়াছে।

বাঙ্গালী-বিদ্বেষের নমুনা সর্ব্বত্র প্রকট। যথেচ্ছ উদাহরণ দিতেছি। "নানাবিধ যান" নামে একটি আপাতঃনিরীহ বিভিন্ন যান-বিষয়ক সচিত্র কবিতা দ্বিতীয় খণ্ডের জুন মাসে প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার শেষাংশে একটি অকারণ খোঁচা এইভাবে লাগাইয়া দেওয়া হইয়াছে ঃ

"সিবিল সার্ব্বিসে যদি হবে অ্যাপিয়ার,
ধুঁয়ার জাহাজে তবে চড়িবে এবার।
পাস হয়ে কোট পরে ফিরে এলে দেশে,
বোনার্জ্জি সাহেব বলি পরিচয় শেষে।"

ইংরেজেরা বাঙালী সিভিলিয়ানদের কী চক্ষে দেখিতেন, ইহা হইতেই তাহা বোধগম্য হইবে। কিন্তু "বোনার্জ্জি সাহেবদের" সেদিন চৈতন্য হয় নাই—আজও হইয়াছে কিনা সন্দেহ!

চতুর্থ খণ্ডের "এপ্রেল" সংখ্যায় "বাঙ্গালি বালিকা"কে 'কুসুমের কলি, হীরার টুকরা, ক্ষীরের পুত্তলি, সোনার প্রতিমা, লাবণ্যের ছবি' ইত্যাদি অভিধায় বহু স্তব-স্তুতি করিয়া সিদ্ধান্ত হইয়াছে যে বাঙালার গৃহে জন্মিয়াই তাহাদের এত দুর্গতি। অতএব সুখ, শান্তি ও ত্রাণের উপায়ঃ

"পরম ধরম করহ আশ্রয়
অগতির গতি যীশু দয়াময়!"

অন্যত্র "খুব সাহস" প্রসঙ্গে ইংরেজ ও বাঙালীর সাহসের তুলনা-মূলক সমালোচনাঃ

"ইংরেজদের সাহস দেখ। এক জন ইংরেজ পর্ব্বতের পার্শ্বে বসিয়া পাখি শীকার করিতেছিল। এমন সময় তাহার মাথার উপর পর্ব্বতের চূড়ায় এক সিংহ গর্জ্জন করিয়া উঠিল। সিংহ দেখিয়া শীকারী তাহার দিকে তাকাইয়া রহিল।......যদি বাঙালী হইত, সিংহের গর্জ্জন শুনিয়া মূর্চ্ছা যাইত, আর সিংহেরও সেদিন ষোড়শোপচারে ভোজন হইত।"

"রুশীয় ভল্লুকে"র কাহিনীতেও অনুরূপ ভাষ্যঃ "কাঠুরিয়ার হাতে এক দা ছিল, তাহা দিয়া সে ভাল্লুককে মারিয়া ফেলিল। যদি বাঙালি কাঠুরিয়া হইত তাহা হইলে ভয়ে মরিয়া যাইত।" (মে, ১৮৭৩)।

"যন্ত্রের পূজা"-প্রসঙ্গে ব্রাহ্মণদের প্রতি নিন্দাবাদঃ

"ব্রাহ্মণদিগের প্রতারণায় এ দেশে পৌত্তলিকতা আসিল ও ব্রাহ্মণেরা নিজে দেবতা হইলেন। আবার হস্তকৃত প্রতিমা হইতে পশু, পক্ষী, বৃক্ষাদি পর্য্যন্ত দেবতা হইল। ব্রাহ্মণেরা সুখী হইলেন। লোকদের ফাঁকি দিয়া জীবিকা অর্জ্জন করিতে লাগিলেন। লোকেরা

ক্রমে অজ্ঞন, মূর্খ ও ঘোর পৌত্তলিক হইয়া উঠিল।" (এপ্রেল, ১৮৭৩)

একদিকে মেকলের প্রতিধ্বনি, অপরদিকে খ্রীষ্টধর্মের মাহাত্ম্য ঘোষণা—ইহাই ছিল 'জ্যোতিরিঙ্গণে'র "আমোদ সহকৃত নীতিশিক্ষার" গূঢ় উদ্দেশ্য!

পত্রিকাখানির একটি বিশেষ গৌরব এই যে, ইহাতে মাইকেল মধুসূদনের অন্ততঃ দুইটি কবিতা প্রকাশিত হইয়াছিল। তৃতীয় বর্ষের 'এপ্রেল' সংখ্যায় 'পুরুলিয়া' নামে একটি কবিতা মুদ্রিত হইয়াছে। লেখকের নাম নাই, পাদটীকায় বলা হইয়াছে: "একজন বিখ্যাত কবি পুরুলিয়ার খ্রীষ্ট-মণ্ডলীকে লক্ষ্য করিয়া এই কবিতাটি লিখিয়াছেন।"[১]

কবিতাটির আরম্ভ এইরূপ:

পাষাণময় যে দেশ, সে দেশে পড়িলে
বীজকুল, শস্য তথা কখন কি ফলে,
কিন্তু কত মনানন্দ তুমি মোরে দিলে
হে পুরুল্যে! দেখাইয়া ভকত-মণ্ডলে!
শ্রীভ্রষ্ট সরস সম, হায়, তুমি ছিলে
অজ্ঞান তিমিরাচ্ছন্ন এ দূর জঙ্গলে,
এবে রাশি রাশি পদ্ম ফোটে তব জলে
পরিমল ধনে ধনী করিয়া আনিলে।"

১৮৭২ সালের নবেম্বরে প্রকাশিত 'কবির ধর্ম্মপুত্র' স্বনামেই চিহ্নিত ছিল। এই সময় মধুসূদন পুরুলিয়ায় বাস করিতেছিলেন। স্থানীয়

১। "পুরুলিয়ার খ্রীষ্টীয়-সম্প্রদায় মধুসূদনকে তত্রত্য মিশন হাউসে অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। মহাকবি তাঁহাদের অভ্যর্থনায় প্রীত হইয়া স্থানীয় ধর্ম্মমণ্ডলীকে সম্বোধন করিয়া একটি কবিতা রচনা করেন"।—মধু-স্মৃতি, নগেন্দ্রনাথ সোম, ১৯শ অধ্যায়।

কোনো এক শ্রীমান খ্রীষ্টদাস সিংহের[১] ব্যাপ্‌টিজমের সময় "ধর্ম্ম-পিতা"রূপে মধুসূদন "ধর্ম্মপুত্র"কে এই কবিতাটি উপহার দিয়াছিলেন ক্রীশ্চান মধুসূদনের একটি পরিচয় এখানে পাওয়া যায় ঃ

"হে পুত্র, পবিত্রতর জনম গৃহিলা
আজ তুমি করি স্নান যর্দ্দনের নীরে
সুন্দর মন্দির এক আনন্দে নির্ম্মিলা
পবিত্রাত্মা বাস হেতু ও তব শরীরে ;
সৌরভ কুসুমে যথা, আসে যবে ফিরে
বসন্ত হেমান্তকালে। কি ধন পাইলা—
কি অমূল্য ধন বাছা বুঝিবে অচিরে—"

'জ্যোতিরিঙ্গণ' সম্বন্ধে এতটা আলোচনা এইজন্যই করা হইল যে প্রচারের অংশ বাদ দিলে ছবি, ছাপা ও রচনায় ইহা যথার্থই একটি প্রথম শ্রেণীর "শিশু ও মহিলাপাঠ্য" পত্রিকা হইতে পারিত। দুর্ভাগ্য, দুগ্ধে জল মিশিয়াছে ; তাহাও অল্প-স্বল্প নয়—প্রায় দুই তৃতীয়াংশ পরিমাণে।

কিন্তু শিশু-পত্রিকার ক্ষেত্রে নতুন যুগ আসিতেছিল। মিশনারীদের হাত হইতে এবার ইহার নেতৃত্ব কাড়িয়া লইলেন ব্রাহ্ম-সমাজ এবং ইহার অগ্রনায়ক রূপে দেখা দিলেন ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন

১। পুরুলিয়া জার্ম্মাণ মিশনের মিশনারী দেশীয় ক্রীশ্চান কাঙ্গালীচরণ সিংহের পুত্র। "মধুসূদন ইহাকে অতিশয় স্নেহ করিতেন। কবিতাটি পাঠে এরূপ অনুমিত হয় যে, তদীয় পুত্রের খ্রীষ্টধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণের সময় মধুসূদন তাঁহার ধর্ম্মপিতার (God Father) কার্য্য করেন।"—মধুস্মৃতি, নগেন্দ্রনাথ সোম, ১৯শ অধ্যায়।

॥ ২ ॥

কেশবচন্দ্র ও বালকবন্ধু :

বাংলাদেশে খ্রীষ্টধর্ম্মের দুরন্ত বিস্তৃতিকে রোধ করিবার কাজে ব্রাহ্ম-সমাজই সেকালে সর্ব্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিভাবে তাঁহারা ইয়োরোপীয় শিক্ষার সারাংশ আহরণ করিয়া এবং ভারতীয় ধর্ম্মধারণার মূল সত্যগুলিকে সংকলন করিয়া ক্রিশ্চিয়ানিটির প্রতিরোধকল্পে এক লৌহ-দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন সে আলোচনার এখানে প্রয়োজন নাই। কেবল ইহাই স্মরণীয় যে উদীয়মান জাতীয়তাবোধের সহিত ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রগতিশীল ভাবধারার মিলনে চারিদিকে যে সর্ব্বাত্মক কর্ম্মোদ্যম তখন রচিত হইয়াছিল, তাহাকেই বাংলার রেনেসাঁসের যথার্থ তুঙ্গ-যুগ বলা যাইতে পারে।

ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের আবির্ভাব ব্রাহ্ম-সমাজেও এক বৈপ্লবিক অধ্যায়। এই কর্ম্মযোগী ও জ্ঞানযোগী মানুষটিকে লইয়া ব্রাহ্ম-সমাজে সেদিন প্রলয়ের তুফান উঠিয়াছিল। কুচবিহার রাজ-পরিবারে কন্যাদান হইতে আরম্ভ করিয়া আচার্য্য-পূজা প্রবর্ত্তন, রামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের প্রভাবে সর্ব্ব-ধর্ম্মসমন্বয় প্রচেষ্টা—ইত্যাদি নানা বিচিত্র বিতর্ক ও ঘাত-প্রতিঘাতে কেশবচন্দ্রকে শেষ পর্য্যন্ত সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া "নববিধানে"র প্রতিষ্ঠা করিতে হইয়াছিল। শিবনাথ শাস্ত্রীর "আত্মচরিতে" এবং চিরঞ্জীব শর্ম্মার "কেশব-চরিতে" তাহার বিস্তারিত নাটকীয় বিবরণ মিলিবে। সংক্ষেপে বলা যায়, হিন্দু ও ব্রাহ্ম—উভয় সম্প্রদায়ের পক্ষ হইতেই কেশবচন্দ্র তখন সমান অপ্রীতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন।

কিন্তু কেশবচন্দ্র এমন একটি সত্যকে বুঝিয়াছিলেন, যাহা তদানীন্তন কঠোরচিত্ত ব্রাহ্মদের হৃদয়ঙ্গম হয় নাই। ব্রাহ্ম-ভাবধারার যথার্থ প্রসার ঘটাইতে হইলে কলিকাতার ব্রহ্মমন্দিরে বা আচার্য্যের

প্রার্থনা সভায় তাহা সম্পন্ন হইবার নয়, মাত্র বুদ্ধি ও তত্ত্বমুখ্য আলোচনায় ও উচ্চাঙ্গের ধর্ম্মচিন্তায় জনসাধারণকে আকর্ষণ করিবে না; তাহার জন্য ধর্ম্মের একটি সার্ব্বজনীন রূপ (popular form) গড়িয়া তোলা দরকার। নগর-সংকীর্ত্তন, প্রচার-কার্য্য, অন্য ধর্ম্ম সম্পর্কে সহিষ্ণুতা, এইগুলিই দেশের মানুষকে ব্রাহ্ম-আদর্শের সন্নিকট করিবে। কেশবচন্দ্রের এই ইঙ্গিত সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজ বুঝিতে পারেন নাই—পারিলে তাঁহারা লাভবানই হইতেন। কিন্তু সে কথা থাক।

"সুলভ সমাচার" নামে কেশবচন্দ্র এক পয়সা মূল্যের যে সংবাদ-পত্রটি প্রচার করিয়াছিলেন, তাহারই অনুজ রূপে তিনি "বালক বন্ধু" নামে একটি পত্রিকা বাহির করেন: ১৮০০ শক (১৮৭৮), ২০শে বৈশাখ হইতে। 'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম সমাজ' ইহার প্রকাশক ছিলেন—কেশবচন্দ্র ছিলেন সম্পাদক, মুদ্রিত হইত ইণ্ডিয়ান মিরর প্রেসে। আট পৃষ্ঠার এই পাক্ষিকপত্রিকাটির দাম ছিল জ্যোতিরিঙ্গণের মতোই সুলভ—মাত্র এক পয়সা। প্রতি সংখ্যাতেই অন্ততঃ একটি করিয়া মজার ছবি থাকিত—ত্রয়োদশ সংখ্যা হইতে পত্রিকার একটি নামচিত্রও সংযোজিত হইয়াছিল।

ঝকঝকে নতুন টাইপে ছাপা, বিভিন্ন ধরণের ছোট ছোট পরিচ্ছন্ন আলোচনা, বক্স করিয়া একটি সংস্কৃত নীতি শ্লোক ও তাহার অর্থ, উপদেশাবলী, হেঁয়ালী কবিতা, মজার মজার গল্প, উৎসাহ দিবার জন্য বালকদের রচনা প্রকাশ—আট পৃষ্ঠার মধ্যে মোটামুটি শিক্ষা ও আনন্দের সমস্ত উপকরণ নৈপুণ্যের সহিত সাজাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। সরসভাবে এবং ছড়ার মাধ্যমে ব্যাকরণ ও গণিত শিক্ষাও দেওয়া হইত। সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও বাংলা দেশে এই বালকবন্ধুই সর্ব্বপ্রথম আদর্শ শিশু-পত্রিকা। ইহাতে যে ধারা নির্দ্দেশিত হইয়াছিল, আজ পর্য্যন্ত ভারতীয় শিশু-পত্রিকায় তাহাই সাধারণভাবে অনুসৃত হইয়া আসিতেছে। বালকবন্ধু পথিকৃৎরূপে দেখা না দিলে পরবর্ত্তী

কালে 'সখা', 'সাথী' বা 'মুকুল' প্রভৃতি উচ্চাঙ্গের পত্রিকা এভাবে গড়িয়া উঠিত কিনা সন্দেহ।

লেখায় নাম থাকিত না। কেশবচন্দ্র ইহার অনেকখানি লিখিতেন এরূপ অনুমান করা যায়। বালকদের রচনা কয়েকটি আদ্যবর্ণে চিহ্নিত থাকিত। যেমন, অ—চ বন্দ্যোপাধ্যায়, স, শ, গুপ্ত, শ, ভূ, চ। শেষের দুইজন বোধহয় পরিচিত সুরেন্দ্রশশী গুপ্ত এবং শশিভূষণ চক্রবর্ত্তী।

শিক্ষার সহিত আনন্দের মনোরম সমাবেশ হইয়াছিল বালক বন্ধুতে। "ভাষাশুদ্ধি"র উপদেশ ঃ

"বালকগণ, এখন হইতে যেরূপ বর্ণোচ্চারণ করিবে সেইরূপই অভ্যাস হইয়া যাইবে; অধিক বয়সে সহজে সেই অভ্যাস ত্যাগ করিতে পারিবে না। তাই বলি, বালক, ভুল উচ্চারণ করিও না, ভুল কথা কহিও না, ভুল লিখিও না।" (১ম বর্ষ, ৮ম সংখ্যা)

ব্রহ্ম-সঙ্গীতগুলি সুনির্ব্বাচিত থাকিত—তাহাতে রাগিণী এবং তালেরও নির্দ্দেশ দেওয়া হইত। যেমন ঃ

সঙ্গীত।

রাগিণী ভৈরবী—তাল যৎ।

কিবা শোভা মনোলোভা হেরি কুসুম কাননে,
হাসিছে প্রফুল্ল ফুলে যেন তরু লতাগণে।
মন্দ মন্দ সমীরণ, করে সুগন্ধ বহন,
আহ্লাদিত হয় মন যার সুমিষ্ট আঘ্রাণে।
বিচিত্র বিহঙ্গ সব, আনন্দে করিছে রব, সুখে
বিহরিছে উন্মত্ত হয়ে মধুপানে।
ধন্য ধন্য ধন্য তিনি, করেছেন এ সব যিনি
না জানি কত সুন্দর দেখিতে তাঁরে নয়নে।—১০ম সংখ্যা

বিভিন্ন শিক্ষা-বিষয়ক প্রসঙ্গের সহিত ছোট ছোট হাসির গল্পও দেওয়া হইত। একটি গল্প এইরূপ ঃ

নূতন জুতা

"ওরে বাবারে গেলাম রে" বলিয়া নিতাই হঠাৎ মহালয়ার দিন চীৎকার করিয়া উঠিয়াছে। কারণ কি জানিবার জন্য সকলে ব্যগ্র হইয়া দৌড়িয়া আসিল। আসিয়া দেখে নূতন জুতা লইয়া নিতাই বিব্রত। চকচকে বার্ণিষ চামড়া দেখিয়া মোহিত হইয়া নিতাই চীনের দোকানে এক জোড়া জুতা কিনিয়াছেন। পায়ে হইল কিনা সেটা আর ঠাওরাইয়া দেখেন নাই। জুতা বগলে করিয়া আহ্লাদে নাচিতে নাচিতে বাটীতে আসিয়া উহা পায়ে দিয়া দেখেন মহাবিভ্রাট। কিছুতেই জুতা পায়ে হয় না। কত ধ্বস্তাধ্বস্তি কিছুতেই পায়ে ঢোকে না। নিতাই অত্যন্ত দুঃখিত। শেষে নিরাশপ্রায় হইয়া একটা পা উঁচু করিয়া তুলিয়া দিলেন এবং দাঁত্ মাত্ খিঁচিয়ে "লক্ষ্মীছাড়া চীনেম্যান" বলিয়া গালি দিতে দিতে জুতার মুখটা সজোরে ফাঁক করিয়া উহার ভিতর পা-টা ঠেলিতে লাগিলেন। হায়! হায়! নিতাইয়ের অদৃষ্ট মন্দ। শেষে অমন খাসা জুতা পড়্ পড়্ করিয়া ছিঁড়িয়া গেল। বৎসরকার দিন কোথায় নিতাই হাসিবেন, না জুতার জন্য চোখের জলে ভাসিতে লাগিলেন। (১৩শ সংখ্যা)।

গল্পটির সঙ্গে একটি মজার ছবিও আছে। ইহাতে অঙ্ক এবং ব্যাকরণও শেখানো হইত, পূর্ব্বেই বলিয়াছি। নামতার একটি নমুনা উদ্ধৃত হইল ঃ

তিন পাঁচ পনর
পনরটী বানর॥
তিন ছয় আঠার।
আঠার জন কামার॥
তিন সাথে একুশ।
একুশটী পিঁপীড়ার কুটুশ॥

তিন আটে চব্বিশ
চব্বিশটি ইলিশ ॥
তিন নয় সাতাশ।
সাতাশ জোড়া তাস ॥
তিন দশে ত্রিশ
ত্রিশবার ফিস্ ফিস্ ॥ —৯ম সংখ্যা

সুন্দর পত্রিকা অথচ অতি সুলভ—তথাপি বালক বন্ধু কেন যে দীর্ঘায়ু হয় নাই তাহা নির্ণয় করা বোধ হয় কঠিন নয়। 'জ্যোতিরিঙ্গণে'র সঙ্গে অবশ্য কোনমতেই তুলনা চলে না, কিন্তু বলিতে বাধা নাই—ব্রাহ্ম-সমাজের বিশিষ্ট প্রচারাত্মক মৃদু মনোভাব ইহাতেও গোপন থাকে নাই। ১৩শ সংখ্যায় একটি চুটকি হিউমারে বলা হইয়াছেঃ "ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগের মাথায় কি ঝোলে তা জান না! টিকটিকির আধখানা—দুষ্ট ছোকরার উক্তি।"

২৩ সংখ্যায় "জাতে জাতে লড়াই" নামে একটি নাটকে হিন্দু বর্ণভেদের সমালোচনা করা হইয়াছে। আজ এগুলিকে দূষণীয় কিছু মনে হইবে না; কিন্তু ব্রাহ্ম-সমাজের সম্পর্ক-চিহ্নিত এই পত্রিকায় এগুলি কী রূপ গ্রহণ করিত তাহা অনুধাবন করা সম্ভবতঃ কঠিন নয়। মনে হইতেছে, বৃহত্তম জনসাধারণ অর্থাৎ হিন্দু-সমাজ ইহাকে প্রসন্ন চিত্তে বরণ করিতে পারে নাই। প্রতিবন্ধকতা যে ব্রাহ্ম-সমাজ হইতেও আসিয়াছিল—ইহাও অনুমান করিবার সঙ্গত কারণ আছে। ১৮৭৮ সালে যখন বালক বন্ধু প্রকাশিত হয়, তখন সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের সহিত কেশবচন্দ্রের বিরোধ চরমে উঠিয়াছে। কুচবিহার রাজবাড়ীতে কন্যাদান করিয়া কেশবচন্দ্র তীব্র নিন্দা ও সমালোচনার ভাগী হইয়াছেন—কুৎসিত আত্মকলহের মধ্য দিয়া 'নববিধানে'র জন্ম হইয়াছে। অতএব কেশবচন্দ্র-প্রবর্ত্তিত পত্রিকা কি হিন্দু, কি ব্রাহ্ম কাহারো নিকট হইতেই উপযুক্ত সহযোগিতা পায় নাই—পাইলে এমন সুন্দর পত্রিকা এ-ভাবে লুপ্ত হইত না।

১৮৮১ সালে, ১২৯৩ (১৮৮৬) ও ১২৯৮ (১৮৯১) সালে মাসিক রূপে বালকবন্ধুর পুনরুজ্জীবনের চেষ্টা করা হইয়াছিল। কিন্তু কোনোবারই ইহা দীর্ঘস্থায়ী হয় নাই। তথাপি যুগোপযোগী শিশু পত্রিকার প্রথম আদর্শ গঠন করিয়া ইহা স্মরণীয় হইয়া আছে।

॥ ৩ ॥

"সখা'

'বালকবন্ধু'র পন্থানুবর্ত্তনে বাংলা শিশু সাহিত্যে একটি অসাধারণ পত্রিকা প্রকাশ করিলেন অক্লান্তকর্ম্মী প্রমদাচরণ সেন। বালকবন্ধুর সম্ভাবনা ইহাতে স্পষ্টতর হইল—সাম্প্রদায়িক গণ্ডী ভাঙ্গিয়া ইহা সর্ব্বজনীনতা লাভ করিল। শিশু পত্রিকার ইতিহাসে প্রমদাচরণের নাম স্বর্ণাক্ষরে লিখিত হওয়া উচিত।

মাত্র সাতাশ বৎসর বয়সে ক্ষয়রোগে প্রমদাচরণ সেনের মৃত্যু ঘটিয়াছে, সুকুমার রায়ের অকাল-প্রয়াণের মতোই শিশু-সাহিত্যে ইহা পরম শোকাবহ ঘটনা। কঠোর দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম করিয়া, ইয়োরোপে উচ্চতর শিক্ষালাভের আশায় দৃঢ় সংকল্প থাকিয়া ও ব্যর্থ হইয়া, সিটি স্কুলের এই শিক্ষকটি মহৎ জীবনাদর্শের একটি নিদর্শন রাখিয়া গিয়াছেন। "সখা" তাঁহার সার্থক কীর্ত্তি। বলিতে গেলে, বুকের রক্তবিন্দু দিয়া, নিজে অর্দ্ধাহার বরণ করিয়া, প্রমদাচরণ ইহাকে গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। প্রমদাচরণের মৃত্যুর পরে কয়েক বৎসর ধরিয়া সগৌরবে "সখা" নিজের অস্তিত্ব রক্ষা করিয়াছিল, পরে ইহা ভুবনমোহন রায়ের "সাথী"র সহিত মিলিয়া গিয়া "সখা ও সাথী" নামে নবরূপ লাভ করে।

প্রমদাচরণ সেন ব্রাহ্ম-সমাজভুক্ত ছিলেন। কিন্তু তাঁহার পত্রিকায় একটি সর্ব্বব্যাপী উদার আদর্শ-বাদ, আনন্দ দান ও সুশিক্ষার সামঞ্জস্য ঘটিয়াছিল। কিছু বিস্তৃত ভাবেই আমরা এখানে পত্রিকাটির পরিচয় দিব।

এই পত্রিকাটি ১৮৮৩ সালের জানুয়ারী হইতে প্রমদাচরণের সম্পাদকত্বে প্রকাশিত হয়। বার্ষিক মূল্য ছিল এক টাকা। অনন্য-কর্ম্মী সম্পাদক প্রথম সংখ্যায় ইহার একমাত্র লেখক ছিলেন। সর্ব্ব-বিষয়েই সমান যোগ্যতার সহিত তিনি লেখনী চালাইয়াছিলেন। তুটি কবিতা--"ছেড়ে দাও না কুকুরচন্দ্র, মায়ের কাছে যাই" ও "উষা," "ভীমের কপাল" নামে ধারাবাহিক বালকপাঠ্য উপন্যাস, গল্প "সতীশ ওতাহার সঙ্গী," "মহাত্মা হেয়ার সাহেব" নামে জীবনী, "মেয়েরা আমাদের কে" এই নামে স্ত্রীজাতি সম্বন্ধে সশ্রদ্ধ একটি আলোচনা, কথোপকথনের মাধ্যমে "বৃষ্টি" নামে বৈজ্ঞানিক প্রসঙ্গ, ধাঁধা—ইহাদের সব কয়টিই তাঁহার একক রচনা। কুমারী টিশিমেকারের "বিলাতের পত্র"ও তাঁহারই অনূদিত। সমগ্র সংখ্যাটি একা লিখিয়া—বিভিন্ন বিষয়ে দক্ষতা দেখাইয়া এরূপ সম্পাদনার কৃতিত্ব বাংলা দেশে আর কেহ অর্জ্জন করিয়াছেন বলিয়া জানি না। এমন কি, প্রথম সংখ্যায় টাইটেল্ পেজের-ছবিটি পর্য্যন্ত তাঁহার নিজের হাতে আঁকা।[১]

প্রথম সংখ্যার 'প্রস্তাবনায়' সম্পাদক জানাইয়াছেন ঃ

"এরূপ পত্রিকা আমাদের দেশে নাই বলিয়াই আমরা এই পত্রিকাখানি প্রকাশ করিবার ইচ্ছা করিয়াছিলাম। আমাদের হতভাগ্য দেশে বালক বালিকাদিগের জ্ঞানের ও চরিত্রের উন্নতির জন্য অধিক লোক চিন্তা করে না, অথবা করিবার অবকাশ হয় না; এই জন্যই সখার জন্ম হইল। সখা পিতামাতার উপদেশ এবং শিক্ষকের শিক্ষা তুই-ই প্রদান করিবে।"

প্রথম বছরে 'সখা'র ৬০০ গ্রাহক ছিল। পরের বছর ১০০০ হয় এবং পত্রিকাটির জনপ্রিয়তা ক্রমশঃই বাড়িতে থাকে।

প্রমদাচরণ তাঁহার সংকল্প-বাক্য বিস্মৃত হন নাই। তাঁহার গদ্য-পদ্য রচনার কিছু নিদর্শন দিতেছি ঃ

১। স্বর্গীয় প্রমদাচরণ সেনের জীবনী, পৃ ৬৬

আঃ ছেড়ে দাও না

আঃ ছেড়ে দাও না কুকুরচন্দ্র মায়ের কাছে যাই
এখন কি আর খেলা করবার সময় আছে ভাই ?
দেখ্ছো না কি হাঁড়ি হাতে চাল ধোয়া রয়েছে তাতে
মা বলেছেন নিয়ে যেতে "চাকর বাকর" নাই।
কাজটি সেরে ফিরে এলে. তখন তোমায় আমায় মিলে
মনের সুখে করবো খেলা যত ভেবে পাই,
কাজ ছেড়ে না করবো খেলা, ছেড়ে দাও না হলো বেলা
আগে কাজ কি আগে খেলা জানতে আমি চাই।

এই উৎকৃষ্ট সচিত্র কবিতাটি পরে যোগীন্দ্রনাথ সরকার নিজের "রাঙা-ছবি" গ্রন্থে সংকলন করিয়া লইয়াছেন।

"ভীমের কপাল" উপন্যাস হইতে গদ্য রচনার নমুনা ঃ

"ইহাদের মধ্যে আর একটু ভিন্নতা ছিল—বিপিনের বাড়ী বাখরগঞ্জ, ভীমের বাড়ী কলিকাতা। কলিকাতায় ছেলেরা যে প্রকার পূর্ব্ব দেশের ছেলেদের ঘৃণা করিয়া থাকেন, তাহাতে ভীম ও বিপিনের ভালবাসার কথা শুনিয়া আশ্চর্য্য হইতে হয়। ভীম কখনও বিপিনকে 'বাঙ্গাল' বলিয়া ঘৃণা করে নাই—ঘৃণা করা দূরে থাকুক, 'বাঙ্গাল' বলিয়া তাহার মনে কিছু মাত্র বিরক্তির ভাবও উদয় হয় নাই। কলিকাতার ছেলেরা যেমন পূর্ব্বদেশের ছেলেদের দেখিলে তাহাদের তিন পুরুষের দোষের কথা বলিয়া নিজেদের যে সব ভাল তাহাই ঠিক করিয়া বসেন—ভীম গোঁয়ার হইলে কি হয়, তাহার এ দোষ ছিল না।"

প্রমদাচরণের সম্পর্কে পরে আমরা আরও কিছু আলোচনা করিব।

সখার দ্বিতীয় সংখ্যা হইতে প্রমদাচরণ একজন তরুণ সহযোগী পাইয়াছেন, তিনি তখন বি-এ ক্লাসের ছাত্র মাত্র। কিন্তু পরবর্ত্তী সময়ে বাংলা শিশু-সাহিত্যে তিনি ও তাঁহার পরিবার মহত্তম

গৌরবের অধিকারী হইয়াছেন। এই তরুণ লেখকটির নাম উপেন্দ্র কিশোর রায়—তখনও তিনি "চৌধুরী" ব্যবহার করিতেন না। দ্বিতীয় সংখ্যায় "মাছি" নামে তাঁহার একটি নিবন্ধ আছে—এইটিই উপেন্দ্রকিশোরের প্রথম শিশুপাঠ্য রচনা। ভাষার সরলতা এই প্রথম রচনাতেই লক্ষণীয়। সামান্য উদ্ধৃতি দিতেছি :

"না ভাবিয়া কাজ করার বড় বিপদ। মাছিগুলি খাইবার কিছু দেখিলে বুদ্ধিহীন হইয়া যায়। দুধের বা'টিতে যত মাছিরা উড়িয়া পড়িয়াছে, তাহার কয়টা উঠিয়া যাইতে দেখিয়াছে ?

একটুকু অনিষ্টে দশজনের ক্ষতি হয়। মাছি দুধের বাটিতে পড়িয়া মরিল, ক্ষুধা তো তাহার গেলই না, তুমিও দুধটুকু খাইতে পাইলেনা।

সামান্য পাপেও মহৎ অনিষ্ট হয়। মাছি অতি অকিঞ্চিৎকর জিনিষ; কিন্তু একটি মাছি পড়িয়া মহামূল্য ঔষধ অকর্ম্মণ্য হইয়া যায়।"

ইহার পর উপেন্দ্রকিশোর "সখার" শেষ পর্য্যন্ত নিয়মিত লেখক ছিলেন। "ধূমপান" (তৃতীয় সং—সম্পাদকের সহযোগে), "মাকড়সা", (৫ম) "গিলফয় সাহেবের অদ্ভুত সমুদ্র যাত্রা" (৬ষ্ঠ) "বানর" (১০ম) ইত্যাদি তাঁহার বহু রচনা ইহাতে প্রকাশিত হইয়াছে। দ্বাদশ সংখ্যায় Parables of Nature হইতে "নিয়ম এবং অনিয়ম, বাধ্যতা এবং অবাধ্যতা" নামে একটি গল্পের সুন্দর ভাবানুবাদ করিয়াছিলেন উপেন্দ্রকিশোর। লেখাটির একটু বৈশিষ্ট্য আছে বলিয়া মনে করি। সম্পূর্ণ চলিত ভাষায় ছোটদের জন্য গল্প লিখিবার এইটিই বোধ হয় প্রথম প্রয়াস। অবশ্য লেখক শেষ রক্ষা করিতে পারেন নাই, সাধু ও চলিতে মিশাইয়া ফেলিয়াছেন, কিন্তু সমগ্র ভাবে ইহার চালটি কথ্য ভাষার :'

"গ্রীষ্মকাল, সকাল বেলা একদিন বড় সুন্দর দেখতে হ'য়েছে। একটি কর্ম্মকার মৌমাছি মধু আনবার জন্য বাহির হ'ল। এমন সুন্দর

রোদ। বেশ গরম বাতাস। সে উড়ে উড়ে অনেক দূরে গেল। ……বেলাও শেষ হয়েছে, তখন বাড়ী ফিরে আসবার কথা মনে হ'ল। তাহার আসবার পথে এক বড়লোকের বাড়ীতে জানালা খোলা ছিল সুতরাং তার মধ্য দিয়ে ঘরের ভিতর গেল। সেখানে ভারী খাবার ভীড়—ডাকাডাকি, হাকাহাকি, মহা গোলমাল। নিমন্ত্রিত ব্যক্তিরা কথা বলতে কিছু বেশী চীৎকার করে ফেলছেন, দেখে শুনে বেচারা মৌমাছির মনে বড় ভয় হ'ল—'এ কোথায় এসে পড়লাম রে বাবু!'—কিন্তু তা হলে কি হয়, বাবুরা যে লাল টুকটুকে রসগোল্লা পাতে নিয়েছেন, তার একটুখানি একবার চেটে না দে'খলে কি চলে? মৌমাছি সেইদিকে গেল। এর মধ্যে একটা ছেলে চিৎকার করে বলিল—'ওরে! মৌমাছিটে ধর! ধর!' মাছি ভাবিল, 'বাবা গো! এই বেলা পালাই!'"

ইহার পর লেখকসংখ্যা ক্রমেই বাড়িয়াছে। মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় 'ঠাকুরদাদার গল্প' শিরোনামায় গল্পচ্ছলে মাসে মাসে বিজ্ঞানের কথা শোনাইয়াছেন। অন্যান্যদের মধ্যে আসিয়াছেন মহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, কুমারী হেমলতা দেবী, কুমারী হিরণ্ময়ী দেবী, রজনীকান্ত চৌধুরী ও কালীকৃষ্ণ দত্ত প্রভৃতি।

প্রথম বর্ষের ষষ্ঠ সংখ্যার একটি প্রবন্ধ অতিশয় মূল্যবান। প্রবন্ধটির নাম "সুরেন্দ্রবাবুর কারাবাস"—লেখক স্বনামধন্য দেশনেতা ও সাহিত্যিক বিপিনচন্দ্র পাল। রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার বিখ্যাত "বেঙ্গলী" পত্রে জাস্টিস্ নরিসের তীব্র সমালোচনা করেন এবং ফলে তাঁহার দুইমাস কারাদণ্ড হয়। তাহাতে ক্ষুব্ধ ব্যথিত বিপিনচন্দ্র প্রবন্ধটি লেখেন। এটি মুদ্রিত করিয়া প্রমদাচরণ সেন উল্লেখযোগ্য সৎসাহসের পরিচয় দিয়াছেন। এই ঐতিহাসিক রচনাটির কিছু অংশ সশ্রদ্ধভাবে উদ্ধৃত করিতেছি:

"যে দোষে কিছুদিন পূর্ব্বে এই হাইকোর্টেই……ইংলিশম্যান পত্রের সম্পাদক ক্ষমা চাহিয়া মুক্তিলাভ করিয়াছিলেন, সেই অপরাধে

বাঙ্গালী সুরেন্দ্রনাথের দুইমাস কারাদণ্ড ন্যায় হইয়াছে কি অন্যায় হইয়াছে তাহার আলোচনা আমরা করিব না। কিন্তু সুরেন্দ্রবাবু দেশের হিতৈষী, সুরেন্দ্রবাবু ছেলেদের—"সখার" অনেক পাঠকের শিক্ষক, তাই সুরেন্দ্রবাবুর অবমাননায় সমস্ত বাঙ্গালী অবমানিত হইয়াছে—, একথা বলিব।

······সুরেন্দ্রবাবু পুণ্যবান, দেশের জন্য তিনি জেলে গিয়াছেন। তাঁহার আজ আনন্দের দিন. তাঁহার আজ গৌরব করিবার সময়। আমরা তাঁহার গৌরবে আপনাদিগের গৌরব মনে করিতেছি। তাঁহার শাস্তিতে এই হতভাগ্য জাতির কাল মুক আজ উজ্জ্বল হইল। পাঠক! পাঠিকা! তোমার হতভাগ্য মাতৃভূমির জন্য একা ফোঁটা চক্ষুজল ফেলিতে শেখ! একদিন তোমার দ্বারাও ভারতের কারাগার পবিত্র হইবে; একদিন তোমার নিজের ক্লেশে দেশের দুর্গতি দূর হইবে, একদিন তোমার গৌরবেও তোমার জাতির মুখ উজ্জ্বল হইবে।"

বালক-বালিকাদিগের উদ্দেশ্যে দেশ-সেবার এইরূপ উদাত্ত আহ্বান ইতঃপূর্বে আর ধ্বনিত হয় নাই।

আধুনিক শিশুপত্রের সমস্ত দিকগুলিই সখায় প্রতিফলিত হইয়াছিল। আয়োজনে কোনো ত্রুটিই সম্পাদক রাখেন নাই। ইহার প্রভাব পাঠকচিত্তে কিরূপ সক্রিয় হইত—এক 'ধূমপান' প্রসঙ্গ হইতেই তাহা জানা যায়। এই আলোচনাটি পড়িয়া নানাজনে ধূমপান ত্যাগ করিয়াছিলেন—কোথাও কোথাও "ধূমপান বিরোধিনী সভা" পর্য্যন্ত স্থাপিত হইয়াছিল। মদ্যপানের বিরুদ্ধেও সখায় নিয়মিত আন্দোলন চালানো হইত।

আড়াই বৎসর "সখা" পরিচালনার পর ১৮৮৪ সালের ২১শে জুন খুলনায় প্রমদাচরণের দেহান্ত হয়। মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত তিনি 'সখা'র সেবা করিয়াছেন। উক্ত বৎসরের মে মাসে প্রকাশিত—সিংহ চর্ম্মাবৃত গর্দ্দভের কাহিনী অবলম্বনে রচিত "গাধা সিংহ" তাঁহার সর্ব্বশেষ

রচনা। জুলাই মাসের পত্রিকায় শিবনাথ শাস্ত্রী প্রমদাচরণের উপর একটি চমৎকার প্রবন্ধ লিখিয়া শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন।

অতঃপর দুই বৎসর শিবনাথ শাস্ত্রী 'সখা' পরিচালনা করেন যথোচিত যোগ্যতার সঙ্গে। ইতোমধ্যে তরুণ উপেন্দ্রকিশোর বি, এ-পাশ করিয়া রায় চৌধুরী হইয়াছেন এবং যথাবিধ নানা বিষয় লইয়া লিখিতেছেন। পূর্ব্বের লেখকেরা ছাড়াও আসিয়াছেন ভুবনমোহন রায় (পরে 'সাথী' সম্পাদক), অন্নদাচরণ সেন, রজনীকান্ত গুপ্ত, বিখ্যাত ব্রাহ্ম-প্রচারক ও কবি চিরঞ্জীব শর্ম্মা (ত্রৈলোক্যনাথ সান্ন্যাল) বিহারী লাল গুহ—ইত্যাদি। কুমারী কামিনী সেন (পরে কামিনী রায়) সক্রেটিসের উপরে প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, কুমারী সরলা মহলানবিশ সেলাই শিখাইয়াছেন এবং সামসুদ্দীন নামে একটি মুসলমান বালক 'বসন্ত সঙ্গীত' নামে কবিতা লিখিয়াছেন।

পঞ্চম বর্ষ হইতে দায়িত্ব নিয়াছেন অন্নদাচরণ সেন, নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য নিয়মিত লেখক হইয়াছেন, আসিয়াছেন দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু; দ্বিজেন্দ্রনাথের ধারাবাহিক "পিপীলিকার উপদেশ" গল্পচ্ছলে প্রাণীবিজ্ঞান শিখাইবার চমৎকার প্রয়াস—প্রথম শ্রেণীর রচনা।

'সখা'র শেষ চারি বর্ষ নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্যই দেখাশুনা করিতেন।

১৮৯১ সালের 'সখা'য় একটি উল্লেখযোগ্য বস্তু "স্বর্ণলতা"র লেখক তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের ধারাবাহিক উপন্যাস "বিধিলিপি" (পরে "অদৃষ্ট" নামে গ্রন্থাকারে বাহির হইয়াছিল)। বিপিনচন্দ্র পাল নিয়মিত লেখকে পরিণত হইয়াছেন ও কবিতা প্রবন্ধ প্রভৃতি উপহার দিয়াছেন। বিপিনচন্দ্র শিশুদের উপযোগী কবিতাও যে সুন্দর লিখিতে পারিতেন তাহার নমুনা স্বরূপ 'খোকাবাবু' কবিতার কিছু অংশ উদ্ধৃত করিলাম :

"পড়াশুনা সারা হল কাজকর্ম্ম নাই
জয়ঢাকটা নিয়ে একটু খেলা করি ভাই।
কাঠি দিয়া দিচ্ছি টোকা একি চমৎকার
ঢ্যাং-ঢ্যাং ঢ্যাং ন্যাটাং ন্যাটাং বেজে ওঠে আর।

সাদাসিদে চারিদিক কল কৌশল নাই,
কোথা হতে শব্দ আসে ভাবছি বসে তাই,
নিশ্চয় এর মধ্যে আছে সন্দেহ কি তার,
ঢ্যাং ঢ্যাং ঢ্যাং ন্যাটাং ন্যাটাং কোথায় থাকে আর।"

(সেপ্টেম্বর, ১৮৮৯)

১৮৯৪ সালে ভুবনমোহন রায়ের "সাথীর" সহিত মিলিয়া "সখা" "সখা ও সাথী" নামে নবরূপ গ্রহণ করে। প্রমদাচরণের পত্রিকা বাঁচিয়া থাকে নাই—কিন্তু অনতিদীর্ঘ জীবন কালের মধ্যেই সে শিশু-পত্রিকার জন্য নব-দিগন্ত রচনা করিয়া গিয়াছে।

'সখা' সম্পর্কে একখানি চিঠিতে বঙ্কিমচন্দ্র যাহা লিখিয়াছিলেন, সেইটি এখানে উদ্ধৃত করিতেছি: " 'সখা' পড়িয়াছি। সকল পড়ি নাই, কিন্তু যতদূর পড়িয়াছি, তাহাতে বিশেষ প্রীতি লাভ করিয়াছি। 'সখা' প্রধানতঃ বালক বালিকাদিগের সহায় বটে, কিন্তু এ 'সখার' সাহায্য অনেক পলিতকেশ বৃদ্ধের পক্ষেও অনবলম্বনীয় নহে। বালক বালিকার এমন সদ্বন্ধু অতি দুর্লভ। এই পত্রের রচনা অতি সরল, বিষয়গুলি জ্ঞানগর্ভ, রুচি মার্জ্জিত। এই "সখার" সঙ্গে এদেশীয় তরুণ বয়স্ক মাত্রেরই সখিত্ব করা উচিত। "সখা"র জন্য, যাহার ঘরে শিক্ষণীয় বালক বালিকা আছে, সেই আপনার নিকট ঋণী। আপনি যশস্বী ও কৃতকার্য্য হউন জগদীশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি। ইতি ৩০ শে অগ্রহায়ণ[১]"

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

১। স্বর্গীয় প্রমদাচরণ সেন, 'সখা' প্রসঙ্গ



॥ ৪ ॥

বালক

"'ছবি ও গান' 'এবং 'কড়ি ও কোমল'—এর মাঝখানে বালক নামক একখানি মাসিকপত্র এক বৎসরের ওষধির মতো ফসল ফলাইয়া লীলা সংবরণ করিল।

বালকদের পাঠ্য একটি সচিত্র কাগজ বাহির করিবার জন্য মেজ বউঠাকুরাণীর বিশেষ আগ্রহ জন্মিয়াছিল। তাঁহার ইচ্ছা ছিল, সুধীন্দ্র বলেন্দ্র প্রভৃতি আমাদের বাড়ির বালকগণ এই কাগজে আপন আপন রচনা প্রকাশ করে। কিন্তু শুদ্ধমাত্র তাহাদের লেখায় কাগজ চলিতে পারে না জানিয়া, তিনি সম্পাদক হইয়া আমাকেও রচনার ভার গ্রহণ করিতে বলেন।"[১]

রবীন্দ্রনাথ এই ভাবেই "বালক" পত্রিকার উৎসকথা বিবৃত করিয়াছেন। ১২৯২ সালের বৈশাখ মাসে (মার্চ, ১৮৮৫) সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্নী জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর সম্পাদনায় কলিকাতা আদি ব্রাহ্ম সমাজ যন্ত্রে মুদ্রিত হইয়া বালক আত্মপ্রকাশ করে। রবীন্দ্রনাথ কেবল রচনার দায়িত্বই লন নাই—তিনি ইহার কার্য্যাধ্যক্ষও ছিলেন।

বালকের বর্ষব্যাপী জীবনের ইতিহাসে রবীন্দ্রনাথই ইহার প্রাণ-পুরুষের ভূমিকা লইয়াছিলেন : গদ্যে, পদ্যে, নাটকে, উপন্যাসে এক বৎসরের মধ্যে তাঁহার পঞ্চাশেরও অধিক রচনা "বালকে" পত্রস্থ হইয়াছিল। ইহাদের মধ্যে "রাজর্ষি" ধারাবাহিক, "মুকুট" দুই সংখ্যায় লেখা। এই সময় 'ভারতী'র জন্য রচনাতেও তাঁহার বিরাম ছিল না। এই অপরিসীম প্রাচুর্য্য এবং সৃষ্টি-বৈচিত্র্য মাত্র রবীন্দ্রনাথের পক্ষেই সম্ভব।

১। জীবনস্মৃতি, বালক

'বালক' নামতঃ বালকপাঠ্য ছিল বটে, কিন্তু ইহার বহু রচনাই বয়স্কদের জন্য। হয়তো ঠাকুর-বাড়ীর বালক-বালিকারা সাধারণ কিশোর পাঠক-পাঠিকাদের অপেক্ষা কিছু অধিক পরিমাণে মনঃপ্রকর্ষ অর্জ্জন করিয়াছিল, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও 'বালক' তাহাদের পক্ষেও সর্ব্বত্র সুপাঠ্য ছিল কিনা বলা কঠিন। এক বৎসর পরে "ভারতী"র সহিত যুক্ত হইয়া গিয়া পত্রিকাটি তাহার যথাযোগ্য পরিণতিই লাভ করিয়াছিল বলা যায়।

প্রথম সংখ্যার আরম্ভ হইয়াছিল রবীন্দ্রনাথের শিশুদের জন্য রচিত প্রথম কবিতা সুপরিচিত 'বিষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদী এল বাণ' দিয়া। লেখকদিগের নাম থাকিত না—শেষের দিকের দু-তিনটি সংখ্যায় মাত্র কিছু কিছু নাম দেওয়া হইয়াছিল। 'বালক' সচিত্র পত্রিকা ছিল—বড় বড় পাতাজোড়া ছবি আঁকিতেন এবং লিথো করিতেন এইচ্‌ সি হালদার। ছবিগুলি খুব সুদৃশ্য ছিল এ কথা বলিতে পারা যায় না। ইহা ছাড়া সত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়ও ছবি আঁকিতেন, সরলভাবে 'করোটি বিদ্যা' (ফ্রেনোলজী) শিখাইতে গিয়া জ্যোতিরিন্দ্রনাথও স্বনামধন্য ব্যক্তিদের কিছু কিছু স্কেচ্‌ দিয়াছিলেন। বোম্বাই দ্বীপের মানচিত্রটি আঁকিয়াছেন বোধ হয় ধারাবাহিক প্রসঙ্গটির লেখক সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর নিজেই। 'নব্যভারতের মানচিত্র' এবং 'বন্দেমাতরং' প্রমুখ কয়েকটি বিচিত্র ছবিও বালকের শোভাবর্দ্ধন করিয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের রচনাই বালকে সর্ব্বাধিক স্থান পাইয়াছে। তিনি ছাড়াও লেখক-মণ্ডলীতে ছিলেন সত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়, নরেন্দ্রবালা দেবী, প্রতিভাসুন্দরী দেবী, সম্পাদিকা জ্ঞানদানন্দিনী স্বয়ং, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, রমণীমোহন চট্টোপাধ্যায়, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর (দুই সংখ্যায় বাংলা শর্টহ্যাণ্ড—'রেখাক্ষর বর্ণমালা' সরস ছড়ায় লিখিয়াছেন), শরৎচন্দ্র দত্ত, খ্যাতনামা নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত (তখন করাচীতে থাকিতেন —প্রথমে পত্র, পরে অন্যান্য লেখা উপহার দেন), শ্রীশচন্দ্র মজুমদার,

প্রিয়নাথ সেন, পরবর্ত্তীকালে "দাদামশাই" কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শীতলাকান্ত চট্টোপাধ্যায়, স্বর্ণকুমারী দেবী, ভুবনমোহন মিত্র ও প্রবোধচন্দ্র ঘোষ। বালক-বালিকাদিগের মধ্যে যাঁহাদের রচনা প্রকাশিত হইয়াছিল তাঁহারা হইলেন সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর, হিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর। বলেন্দ্রনাথ ক্রমশঃ বালকত্বের সীমা পার হইয়া বালকের নিয়মিত লেখকদের পর্য্যায়ভুক্ত হইয়া গিয়াছিলেন। লক্ষ্য করিবার মতো, বালক একান্ত ভাবেই ঠাকুর-বাড়ীর এবং ইহার একান্ত বন্ধুবান্ধবের একটি ছোট গণ্ডীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। 'ব্যায়াম' সম্পর্কে প্রথম সংখ্যায় জ্ঞানদানন্দিনী একটি সচিত্র প্রবন্ধ লেখেন, পরের সংখ্যায় 'লাঠির উপর লাঠি' লিখিয়া রবীন্দ্রনাথ একটি সরস প্রতিবাদ জানান। সম্পাদিকা তাহার জবাব দেন দেন এবং দেবর-ভ্রাতৃজায়ার এই স্নিগ্ধ কলহে "লাঠালাঠি" শীর্ষক পত্র লিখিয়া দক্ষিণেশ্বর হইতে "শ্রীকেদার" নামে তাহাতে যোগদান করিয়া রসিক কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বালকের লেখকমণ্ডলীর অন্তর্ভুক্ত হইয়া যান। কেদারনাথ তখন দক্ষিণেশ্বরে থাকিতেন এবং বালকের মাধ্যমেই রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁহার প্রথম যোগাযোগ রচিত হয়।

বালকের প্রথম দুই সংখ্যায় "মুকুট" গল্পটি শেষ হইলে তৃতীয় সংখ্যা হইতে রবীন্দ্রনাথ ধারাবাহিকভাবে "রাজর্ষি" লিখিতে সুরু করেন। 'রাজর্ষি' শেষ হইবার আগেই বালক অস্তমিত হয়। কি ভাবে একটি স্বপ্নলব্ধ কাহিনীর মাধ্যমে 'রাজর্ষি' রচনার প্লট আসিয়াছিল তাহার মনোরম কাহিনী রবীন্দ্রনাথ "জীবনীস্মৃতিতে" ব্যক্ত করিয়াছেন, এখানে তাহার পুনরাবৃত্তি অনাবশ্যক। ইহা ছাড়া রবীন্দ্রনাথের নিয়মিত "হেঁয়ালি নাটক" (পরে 'হাস্য কৌতুক') এবং সত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়ের "প্রবাদ প্রশ্ন" ইহার অন্যতম আকর্ষণ ছিল।

রবীন্দ্রনাথের পরিচিত গল্প, উপন্যাস, নাটক, কবিতাগুলি পরে নানাগ্রন্থে পাঠকদের কাছে উপস্থিত হইয়াছে—সেগুলির উল্লেখের

প্রয়োজন নাই। ইহা ছাড়াও শিখগুরু নানক, তেগ্ বাহাদুর, বন্দা সিংহের কাহিনী ও আকবর শাহের ঔদার্য্য প্রভৃতিতে ইতিহাসের গল্প সরস ও শিক্ষণীয় ভাবে বর্ণনা করিবার কৃতিত্বও তিনি দেখাইয়াছেন। নবোদ্ভূত জাতীয়তাবাদের যে প্রেরণায় ঠাকুরবাড়ী তখন চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল—তাহাতে অনুপ্রাণিত হইয়াই প্রসঙ্গগুলির সাহায্যে রবীন্দ্রনাথ বালকদের মধ্যে শৌর্য্য-বীর্য্য, ধর্ম্মবোধ ও দেশপ্রেম সঞ্চার করিতে চাহিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথের আর একটি উল্লেখযোগ্য রচনা, 'চিরঞ্জীবেষু' ও 'শ্রীচরণেষু' নামে কাল্পনিক 'নাতি-ঠাকুর্দ্দার' পত্র-বিনিময়ের মাধ্যমে প্রাচীন ও আধুনিক মনন-চিন্তন-রীতি-নীতির গভীর অথচ কৌতুকস্নিগ্ধ আলোচনা। তবে আলোচনাটি বয়স্কদেরই আস্বাদ্য—বালক-বালিকার পক্ষে ইহা কতখানি উপাদেয় তাহা অনুমান করা কঠিন। প্রতিভা দেবীকৃত "কালমৃগয়া"র একটি ধারাবাহিক 'স্বরলিপি'ও বালকে প্রকাশিত হইয়াছিল।

সত্যেন্দ্রনাথের বোম্বাই সংক্রান্ত প্রবন্ধগুলি শিক্ষামূলক ও তথ্যগর্ভ—তবে ইহাও বয়ঃপ্রাপ্তদের জন্যই। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের "মুখ চেনা" শীর্ষক আলোচনাটি সুন্দর। তাঁহার রচনার নমুনা কিছু উদ্ধৃত হইল:

"চোখে ভাষাশক্তি প্রকাশ পায়। যাদের চোখ বাহির দিকে ও নীচের দিকে বের করা—ফুলো ফুলো ও বড় তাদের ভাষাশক্তি বিলক্ষণ আছে—কথার উপর তাদের খুব দখল—তারা উপস্থিত বক্তা ও দ্রুত লেখক। বের করা চোখে চারিদিককার বহির্বস্তুর ছবি সহজে পড়ে। যাদের এই প্রকার চোখ তারা এক দৃষ্টিতে সাধারণভাবে সমস্ত পদার্থ দেখিয়া লইতে পারে—কিন্তু তারা প্রত্যেক বস্তু তেমন খুঁটিনাটি করিয়া দেখিতে পারে না, যাদের চোখ ভিতরে ঢোকা তারা যাহা দেখে তাহা খুব ঠিক করিয়া দেখে—খুব তন্নতন্ন করিয়া দেখে।… …সুবক্তা মহাত্মা রামগোপাল ঘোষের ছবিটি দেখ—ইঁহার চোখের নীচের পাতা কেমন ফুলো—ইহাতেই ইঁহার ভাষাশক্তি প্রকাশ পাইতেছে"। (জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা)

বালকে ধারাবাহিক ভাবে বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ লিখিতেন সত্যপ্রসাদের স্ত্রী নরেন্দ্রবালা দেবী। বাংলা মাসিক পত্রে মহিলাদের লেখনীতে বিজ্ঞানচর্চ্চার ইহাই সর্ব্ব প্রথম নিদর্শন। নরেন্দ্রবালা বেশ সহজ সরল ভঙ্গীতে লিখিতেন :

"এক ইঞ্চি লম্বা ও এক ইঞ্চি চওড়া এক টুকরা কাগজের উপরেও ৭৷৷০ সের বায়ুর চাপ পড়িতেছে। তোমরা এখন বলিতে পার যে কাগজের উপর যদি এতটা চাপই পড়ে তবে, তাহা তুলিবার সময় সে চাপ আমরা বোধ করি না কেন? তাহার কারণ রবরের মত বায়ু স্থিতিস্থাপক। ভারাকর্ষণ শক্তি যেমন বায়ুকে নিচের দিকে টানিতেছে, স্থিতিস্থাপকতা গুণে তেমনি ভারাকর্ষণের হাত ছাড়াইয়া বায়ু উপরে উঠিতেছে, সুতরাং বায়ুর নীচের ও উপরের চারিদিকের চাপ সমান রহি.াছে বলিয়া একখণ্ড কাগজ তুলিতে আমাদের কিছুই ভারবোধ হয় না।" (ভাদ্র সংখ্যা)

'আশ্চর্য্য পলায়ন' নামে জ্ঞানদানন্দিনী নিয়মিতভাবে বিদেশী হইতে একটি রোমাঞ্চকর কাহিনীর অনুবাদ করিয়াছেন। বাংলা রচনায় তাঁহার নৈপুণ্য এই অনুবাদ হইতে বুঝিতে পারা যায়। রাজদ্রোহের অপরাধে বন্দী একজন রুশ বিদ্রোহীর আত্মকাহিনীর কিছু অংশ এইরূপ ঃ

"কিছুক্ষণ বাদে রক্ষকদের এমনই নাসিকাধ্বনি হইতে লাগিল যে তাহাতে মৃতও জাগিয়া উঠে। সম্মুখস্থিত রক্ষক দুই হাত ও দুই পা দিয়া তাহার বন্দুক জড়াইয়া একবার সাম্‌নে ও একবার পিছনে ঢুলিয়া পড়িতে লাগিল আর মাঝে মাঝে হেঁড়ে গলায় অস্পষ্ট বকিতে লাগিল। সে এক স্বপ্নরাজ্যের গভীর প্রদেশে। আমি আস্তে আস্তে উঠিয়া চারিদিকে চাহিলাম। নির্ম্মল আকাশে কোটি কোটি তারকা জ্বল জ্বল করিতেছে, তখন আমরা একটা নিবিড় বনের মধ্য দিয়া চলিতেছি। একটি লাফ দিলেই ঐ বনমধ্যে যাইতে পারি। আর, একবার ঐ বনমধ্যে যাইয়া পড়িতে পারিলে আমাকে ধরা

পলাতক ঋঘকে ধরার মত দুঃসাধ্য হইয়া উঠিবে, কেননা আমি দ্রুত দৌড়িতে সক্ষম ও স্বাধীনতার জন্য ব্যগ্র।" (জ্যৈষ্ঠ)

রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও সাহিত্যরসিক প্রিয়নাথ সেনের দুইটি সুন্দর কবিতাও প্রকাশিত হইয়াছিল।

তাঁহার 'সোহাগ' কবিতাটি হইতে কয়েকটি পংক্তি উদ্ধৃত করিলাম:

"নন্দনের ছেলেগুলি,
স্বপনের ডালা ধরি,
ধীরে তারে ঘিরে বসে,
হাসি দেয় প্রাণ ভরি।
ঘুমন্ত আননে তার
হাসিটি জাগ্রত দেখি,
গ'লে যায় মার মন,
ভেসে যায় দুটি আঁখি।
কিসে যে শিহরে তনু,
মা-ই তাহা জানে খালি,
প্রাণখানি আনি মুখে,
চুমো দিয়ে দেয় ঢালি।"

বলেন্দ্রনাথের প্রতিভার স্বাক্ষর বালকের কয়েকটি লেখাতেই ফুটিয়া উঠিয়াছে। তাঁহার রচনাগুলি "এসে" (essay) জাতীয়, রবীন্দ্রনাথের প্রভাবও তাহাতে দুর্লক্ষ্য নয়। কিন্তু কিশোর বলেন্দ্রনাথের স্বাভাবিক দার্শনিকতা, চিন্তাশক্তি এবং ভাবগম্ভীর পরিবেশ রচনার ক্ষমতা এই লেখাগুলিতেও ফুটিয়া উঠিয়াছে। ফাল্গুন সংখ্যায় প্রকাশিত তাঁহার 'পুলের ধারে' হইতে কিছু অংশ এই:

"রজনী উষার ক্রোড়ে মাথা রাখিয়া অগাধ নিদ্রায় মগ্না। তাহার কালো চুলগুলি আলুথালু হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে—

তাহার মুখের উপর ঊষার স্নেহ দৃষ্টি ও শুভ্রকান্তিচ্ছটা পড়িয়াছে। গঙ্গা নিয়মিত কাজ করিয়া যাইতেছে কিন্তু সে জ্যোৎস্না নাই। ·········কোথায় গেল সেই সব আকাশ ভরা তারা, কোথায় গেল চাঁদ। কোথা হইতে চোখ রাঙ্গাইয়া সূর্য্য উঠিল। আমি পুলের ধারে এই ক ঘণ্টা দাঁড়াইয়া আছি ইতিমধ্যে কখন পৃথিবীটা ঘুরিয়া গেছে—আকাশের গ্রহতারকারা কে কোথায় সরিয়া গেছে—কেবল আমি আর এই সহস্রচরণবিশিষ্ট 'হাওড়ার পুল' এক জায়গায় খাড়া দাঁড়াইয়া আছি।"

চৈত্র সংখ্যায় কার্য্যাধ্যক্ষের পদ হইতে রবীন্দ্রনাথের অবসর গ্রহণ এবং বালকেরও বিদায়। কিন্তু এই বর্ষকাল পরমায়ুর মধ্যেই বালক তাহার বিশিষ্টতার স্বাক্ষর রাখিয়া গিয়াছে। নামে বালক হইলেও ইহা বিমিশ্র পত্রিকা, অতএব "ভারতী"র সহিত মিলিয়া ইহার গোত্রান্তর ঘটে নাই। প্রমদাচরণের 'সখা' দুই বৎসর আগে প্রকাশিত হইলেও 'বালক' তাহার নিকট হইতে কোনো সংকেত গ্রহণ করে নাই—ঠাকুরবাড়ীর স্বাতন্ত্র্য ও আভিজাত্যের চিহ্ন সর্ব্বাঙ্গে অঙ্কিত করিয়া শিশু-কিশোরপাঠ্য পত্রিকার ভীড় হইতে ইহা এক পাশে নিঃসঙ্গ হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। বালক কাহারও আদর্শ গ্রহণ করে নাই—বালকের আদর্শও কোনো পত্রিকার পক্ষে গ্রহণ করা সম্ভব হয় নাই।

দেশাত্মবোধের একটি অপরূপ অনুরণন বালকের অন্তরালে ফল্গুধারার মতো পূর্ব্বাপর বহিয়া গিয়াছে। পৌষ সংখ্যার 'আবাহন গীতে' (পরে কড়ি ও কোমলের অন্তর্ভুক্ত) রবীন্দ্রনাথ ডাকিয়া বলিয়াছেন:

"উঠ বঙ্গ কবি, মায়ের ভাষায় মুমূর্ষুরে দাও প্রাণ—
জগতের লোক সুধার আশায় সে ভাষা করিবে পান।
চাহিবে মোদের মায়ের বদনে, ভাসিবে নয়ন জলে,
বাঁধিবে জগৎ গানের বাঁধনে মায়ের চরণ তলে।

বিশ্বের মাঝারে ঠাঁই নাই বলে কাঁদিছে বঙ্গভূমি,
গান গেয়ে কবি জগতের তলে স্থান কিনে দাও তুমি।
একবার কবি মায়ের ভাষায় গাও জগতের গান—
সকল জগৎ ভাই হয়ে যায়—ঘুচে যায় অপমান—"

ইহা যেন কবির নিজের সম্পর্কেই ভবিষ্যদ্বাণী। এ আহ্বানে আর কেহ সাড়া দিক আর নাই দিক—রবীন্দ্রনাথ একাই তাঁহার কর্ত্তব্য পালন করিয়াছেন। চব্বিশ বৎসর বয়সের প্রতিজ্ঞা বায়ান্ন বৎসরে নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তিতে পূর্ণ হইয়াছে; যথার্থই তাঁহার গানে হৃত-গৌরব নতশির বাঙালা বিশ্বসভায় স্থান পাইয়াছে—তাঁহারই গানের আকর্ষণে সারা পৃথিবীর অগণিত মানুষ আজ বাংলা ভাষা শিখিতেছে ও পড়িতেছে, তাঁহার সাহিত্য বিশ্বমৈত্রীর রাখীবন্ধনরূপে চরিতার্থ হইয়াছে।

॥ ৫ ॥

সাথী, সখা ও সাথী

'সখার' সমপর্য্যায়ী "সাথী" নামে শিশুপাঠ্য পত্রিকা ১৩০০ সালের (ইংরাজী মার্চ, ১৮৯৩) বৈশাখ মাসে প্রথম প্রকাশিত হয়। ইহার সম্পাদক ভুবনমোহন রায় প্রমদাচরণের আত্মীয় এবং স্বদেশ-বাসী—'সখা'রও তিনি নিয়মিত লেখক ছিলেন। এই কারণে 'সাথী' সম্পূর্ণভাবে সখার আদর্শেই কল্পিত হইয়াছিল। সখার লেখকেরাই প্রধানতঃ ইহাতে লিখিতেন। বার্ষিক মূল্য মাত্র চৌদ্দ আনা—সখা অপেক্ষাও দু আনা সুলভ। 'বালক'দিগের জন্য 'বিশেষ পৃষ্ঠা'ও একটি ছিল, তাহাতে সচিত্র হাসির কবিতা থাকিত—লিখিতেন ত্রৈলোক্যনাথ সান্ন্যাল (চিরঞ্জীব শর্ম্মা) এবং যোগীন্দ্রনাথ বসু (হয় ঋষি রাজনারায়ণ বসুর পুত্র 'সুরভি' সম্পাদক,, অথবা

মাইকেলের জীবনী রচয়িতা দেওঘর উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক যোগীন্দ্রনাথ)।'

'সাথী'র প্রথম সংখ্যায় দেশের ছোট ছোট ভাইবোনদের সুন্দর কবিতায় সস্নেহ আহ্বান জানাইয়াছিলেন যোগীন্দ্রনাথ সরকার ঃ

কোথায় আছ ভাইটি আমার কোথায় আছ বোন,
আয় ছুটে আয় শোনরে এসে "সাথীর আবাহন"।
উপদেষ্টা নয় সে যে ভাই, হাতে নাই কো ছড়ি,
নাইক তাহার উচ্চ ধমক দন্তের কড়মড়ি,
ভায়ের মতন থাকবে সে যে ধরে হাতে হাতে,
যথায় যাবে তথা রবে তোমাদেরি সাথে।

বিষয়-বিন্যাস, রচনাভঙ্গি এবং অন্যান্য দিক হইতে সখার সহিত ইহার প্রভেদ সামান্যই। কিন্তু একটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করিবার আছে। 'সখা'তেও মধ্যে মধ্যে দেশীয় কৃতী ব্যক্তিদের জীবনী থাকিত—কিন্তু সাথীতে ইহা নিয়মিত স্থান পাইতেছে। দেশ এবং জাতি সম্পর্কে শ্রদ্ধাবোধ জাগাইয়া তুলিবার উদ্দেশ্যও ইহার নেপথ্যে ছিল। 'সাথী' পত্রিকায় 'কঙ্কাবতীর' প্রণেতা প্রসিদ্ধ ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় ও লেখনী চালনা করিয়াছেন—অবশ্য প্রবন্ধকার রূপে। দেওঘর হইতে ঋষি রাজনারায়ণ বসু অগ্রহায়ণ সংখ্যায় বালকদের উদ্দেশ্যে সুন্দর একটি বাণী দিয়াছিলেন, তাহার আরম্ভ এইরূপ ঃ

"প্রিয় বালকগণ! তোমরা কি মহৎ পদার্থ তাহা তোমরা নিজেরা জান না। কোন ইংরাজ কবি বলিয়াছেন যে, সূর্য্য যেমন পৃথিবীর এক দেশ হইতে অস্ত যাইয়া আর এক দেশে উদিত হয়, তেমনি তেমনি তোমরা পূর্ব্বে দেবলোকে ছিলে সেখান হইতে অস্ত যাইয়া পৃথিবীতে উদিত হইয়াছ। তোমাদের সরলতা, সত্যপরায়ণতা, উদারতা, মনুষ্যকে একান্ত বিশ্বাস, পিতামাতার প্রতি একান্ত নির্ভর, সদানন্দতা ও সহজ জ্ঞান দেবোচিত গুণ।"

উপেন্দ্রকিশোরও ইহাতে নিয়মিত লেখক—বিজ্ঞানমূলক

আলোচনার দিকেই তাঁহার প্রধান ঝোঁক। কার্ত্তিক সংখ্যায় তাঁহার "বেচারাম ও কেনারাম" নামে একটি সচিত্র সুন্দর নাটিকা প্রকাশিত হইয়াছে। গল্পটি বিদেশী হইতে লওয়া হইলেও রচনা কৌশলে উপেন্দ্রকিশোর এটিকে মৌলিকের ন্যায় উপাদেয় করিয়া তুলিয়াছেন। লেখাটি বর্ত্তমান শিশু-সাহিত্যেও সুপরিচিত।

"সাথী"তে এমন একজন লেখকের সন্ধান পাওয়া যায়—ভবিষ্যতের শিশু-সাহিত্যে যাঁহার নামটি স্থান পাওয়া উচিত ছিল। ইনি বিজয়কুমার সেন বি, এ। প্রথম বছরেই ইঁহার কতকগুলি কবিতা প্রকাশিত হইয়াছে। কৌতুকধর্ম্মী এবং ভাবগভীর—উভয়বিধ রচনাতেই লেখকের সমান নৈপুণ্য ছিল। বিজয়কুমার সেনের কোন প্রকাশিত বই দেখিতে পাই নাই—এমন শক্তিমান লেখকটি কী ভাবে কোথায় হারাইয়া গিয়াছেন ভাবিতেও বিস্ময় জাগে। চৈত্র সংখ্যায় বিজয়কুমারের "কোকিলের গান" হইতে কয়েকটি পংক্তি ঃ

"কাঁপাইয়া বনরাজি
সবে তোরা গা রে গান—
বসন্ত এসেছে ফিরে
দুঃখ নিশা অবসান।....
হাসে ধরা ফুলভারে
হাসে নিশা তারা হারে
নদী জলে চাঁদ তারা
দেখে নাচে মন প্রাণ—
মৃদুল মধুর বায়
ফুলমধু নিয়ে যায়,
মুকুলের মধু নিয়ে
অলি ধরে মৃদু তান।
বসন্ত এসেছে ফিরে
সবে তোরা গা রে গান"

প্রকাশিত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই "সাথী" সমাদর লাভ করিয়াছিল—করিবারই কথা। কিন্তু দ্বিতীয় বর্ষ হইতে ইহার অপ্রত্যাশিত রূপান্তর ঘটিল। 'সখা' প্রকাশিত হইত ইংরাজি মাসের হিসাবে—১৮৯৪ সালের মার্চ্চ পর্য্যন্ত তিন সংখ্যা প্রকাশিত হইয়া ইহা বন্ধ হয় এবং এপ্রিলে (বাংলা বৈশাখ, ১৩০১) 'সাথী'র দ্বিতীয় বর্ষ হইতে 'সাথীর' সহিত যুক্ত হইয়া যায়। ভুবনমোহন রায় গভীর মমতাভরে 'সখাকে' কেবল কাছেই টানিয়া আনেন নাই—নিজের পত্রিকার পূর্ব্বে ইহার নামটি যুক্ত করিয়া অসীম ঔদার্য্যেরও পরিচয় দিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে 'সখা ও সাথী'র প্রথম সংখ্যা (সাথী দ্বিতীয় বর্ষ, প্রথম সংখ্যা)-য় তিনি লিখিয়াছেন ঃ

"যে বয়সে বড় তাহার সম্মান করিতে হয়। সখা সাথী অপেক্ষা বয়সে বড় সুতরাং সখাকে সাথীর সম্মান করা উচিত। বিশেষ প্রমদাচরণই এ দেশে এ প্রকার পত্রিকার প্রবর্ত্তক বলিলে হয়। তাই প্রমদাচরণের সম্মান ও স্মৃতি রক্ষার জন্য এবং তাঁহার প্রতি আমাদের হৃদয়ের গভীর শ্রদ্ধা প্রীতির নিদর্শন স্বরূপ, এই সম্মিলিত পত্রিকার নামাকরণে (?) তাঁহার সখার নামই প্রথমে দেওয়া হইল। আমরা আশা করি সাথীর গ্রাহকগণেরও এখন কোন ক্ষোভের কারণ নাই।" যুক্তিটি যেমন সুন্দর, তেমনি ভুবনমোহনের চিত্ত-মাহাত্ম্যের পরিচয়ও ইহাতে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

'সখা ও সাথী' এই দুইটি পত্রিকার সম্মিলিত শক্তি লইয়াই অগ্রসর হইয়াছিল। বিভিন্ন লেখকদের রচনা আরো পরিচ্ছন্ন এবং শিশুচিত্তের উপযোগী হইয়া উঠিতেছে—অভিজ্ঞতার মাধ্যমে শিশু পত্রিকার স্বরূপটি এতদিনে সুস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে। 'খোকার দপ্তরে'র বিখ্যাত মনোমোহন সেনের লেখনী ক্রমে শক্তিলাভ করিতেছে। লেখক-তালিকায় আর একটি স্মরণীয় নাম যুক্ত হইয়াছে—ইনি জলধর সেন। দিল্লীর অভিজ্ঞতার উপর তিনি দুইটি সরস প্রবন্ধ লিখিয়াছেন—একটি "ঠেকে শেখা", আর একটি "দিল্লী"। "কথা

লহরী" নামে বুদ্ধদেব সম্পর্কে একটি সুন্দর প্রবন্ধ প্রথম সংখ্যায় লিখিয়াছেন বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী জগদ্বন্ধু ভদ্র; কবি গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী এবং কবি মানকুমারী বসু লিখিতেছেন, জগদানন্দ রায় তাঁহার প্রথম বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ লইয়া উপস্থিত হইয়াছেন। জগদানন্দের "উল্কাপিণ্ড" (আশ্বিন, প্রথম বর্ষ) নামে এই রচনাটির অংশ বিশেষ এইরূপ :

"নক্ষত্রপাতের সহিত দেশের মঙ্গলামঙ্গলের কোন ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে কিনা, তাহা আজ আমি কিছুই বলিব না। ইচ্ছা করিলে তোমরা ঠাকুরমার কথাটা আপাততঃ সত্য বলিয়া ধরিয়া লইতে পার। তবে আকাশস্থ দীপ্যমান নক্ষত্রগুলির মধ্যে দুই একটি খসিয়া পড়ে বলিয়া যে বিশ্বাস আছে, তাহা সম্পূর্ণ ভুল বলিয়া জানিবে। প্রকৃত ব্যাপারটি কি তাহা আমি বলিতেছি—"

বিজয়কুমার সেন আরো সুন্দর সুন্দর কবিতা লিখিয়াছেন,—সম্পাদকের নিজস্ব সুপরিচিত কবিতাগুলি ছাড়াও 'অবাধ্য বালক' নামে একটি শিক্ষামূলক নীতি উপন্যাস প্রকাশিত হইয়াছে। 'সাথী'তে 'বড় গল্প নয়' নামে একটি সত্যমূলক রোমাঞ্চ-কাহিনী লিখিয়াছেন হরিসাধন মুখোপাধ্যায়—'সখা ও সাথীতে' তিনি 'আশ্চর্য্য হত্যাকাণ্ড' নামে দীর্ঘ গোয়েন্দা কাহিনী লিখিয়াছেন। 'সখা ও সাথীর' আর একটি বিশেষ আকর্ষণ ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের 'সেকালের কথা' নামে একটি কৌতুকস্নিগ্ধ রোমাঞ্চকর বড় গল্প।

তিন সংখ্যায় 'সেকালের কথা' শেষ হইয়াছিল। গল্প হিসাবে মূল্য এমন কিছু নয়—কিন্তু "কঙ্কাবতীর" স্রষ্টার লেখনীর যাদুস্পর্শ ইহাতেও পড়িয়াছে—অতি সুখপাঠ্য সরস রচনা। ঘুষখোর দারোগার চরিত্রটি ('সবই প্যাটের জন্য') এক কথায় অনবদ্য। ত্রৈলোক্যনাথের এই লেখাটি কোথাও সংকলিত হয় নাই, সেদিক হইতেও ইহার বিশেষ মূল্য আছে। গল্পের নায়ক রামসদয় হঠাৎ গাছ হইতে একটি বাঘের

পিঠে পড়িয়া যাইবার পর বাঘের মানসিক-প্রতিক্রিয়া ত্রৈলোক্য-নাথের ভাষায় এইরূপ :

বিরক্তি, বিস্ময়, ভয়, ঘৃণা এককালে এই সমস্ত ভাবগুলি বাঘের মনে উদয় হইল। বাঘ ভাবিল, এ পৃথিবী হইল কি? কালে কালে কত না হবে! কলির দেখিতেছি সব উল্টা। আমরা কোথায় মানুষ ধরিয়া খাইব, তা নয়, মানুষ কিনা গাছ হইতে লাফ দিয়া আমাকে ধরে! বাঘের পিঠে পড়িয়া রামসদয় মুঠা করিয়া দুই হাতে বাঘের ঘাড়ের লোম ধরিলেন। প্রাণের ভয়ে রামসদয়কে পিঠে করিয়া বাঘ ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িল ও মাঝে মাঝে তাঁহাকে ঝাড়িয়া ফেলিতে চেষ্টা করিতে লাগিল। রামসদয়ের হাতে মুঠা মুঠা বাঘের লোম ছিঁড়িয়া আসিতে লাগিল। বাঘ মনে করিল—"আজ ভাল মানুষ খাইতে গিয়াছিলাম বটে! আমার পিঠের ছাল চামড়া আজ সব তুলিয়া লইল। আজ এ দায় হইতে যদি প্রাণ বাঁচে তো দিব্যি করিতেছি, আর কখনও মানুষ ধরিব না।" (আষাঢ়)

১৩০৩ সালে (সখার সহিত হিসাব ধরিয়া ত্রয়োদশ বর্ষ, সাথীর চতুর্থ বর্ষ) শ্রাবণ সংখ্যায় ১২ বৎসরের বালকের একটি কবিতা প্রকাশিত হইয়াছে। এই বালকটি উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, কবিতার নাম 'সন্ধ্যা'। আরম্ভ এইরূপ :

> সূর্য্যদেব ডুবে গেছে এল সন্ধ্যাকাল,
> পশ্চিম আকাশে মেঘ হইয়াছে লাল।
> ধীরে বায়ু বহে, তায় ফুলগন্ধ ধায়,
> গাছের উপরে বসি পাখী গান গায়—

ভাবী বিখ্যাত ঔপন্যাসিকের এই সূচনাটি নেহাৎ মন্দ নয়।

আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীও এই পত্রিকার লেখকশ্রেণীতে আসিয়াছিলেন। আষাঢ়—১৩০৪ সংখ্যায় তাঁহার বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ "ভূমিকম্প" হইতে কিছু নিদর্শন দিলাম :

"আসল কথা পৃথিবীর পৃষ্ঠকে স্থির মনে করাটাই ভুল। পৃথিবীর

পৃষ্ঠদেশ সর্ব্বদাই চঞ্চল। পূর্ব্বে যে যন্ত্রের কথা বলিয়াছি, তাহার সাহায্যে আমরা দেখিতে পাই, ভূপৃষ্ঠ প্রায় সর্ব্বদাই কাঁপিতেছে। তবে সেই কম্প এত ক্ষীণ যে, আমরা আদৌ টের পাই না। যখন ঘটনাক্রমে একটু তীব্র হয় তখন আমরা বুঝিতে পারি ও ভয় পাই।"

স্বনামধন্য দেশপ্রেমিক মহারাষ্ট্রীয় পণ্ডিত সখারাম গণেশ দেউস্করও 'সখা ও সাথীতে' লিখিয়াছেন। বাংলা-রচনায় এই অবাঙালী মনীষী যে অসামান্য সাফল্য অর্জ্জন করিয়াছিলেন, তাহা সুবিদিত, কিন্তু বালক-বালিকাদের জন্য সুন্দর সহজ রচনাতেও যে তাঁহার কেমন হাত খুলিত, ১৩০৪-এর পৌষ সংখ্যায় প্রকাশিত 'প্রাচীন মহারাষ্ট্রীয় জাতি' হইতে তাহার প্রমাণ মিলিবে ঃ

"বাঘ ভালুকের ভয়ে যতটা না হউক, মাতঙ্গ রাক্ষসের ভয়ে সেকালে বড় কেহ দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ করতে সাহস করত না। কেবল দুচার জন ঋষি তপস্যা করবার জন্য স্থানে স্থানে দু একটি আশ্রম বেঁধে বাস করতেন। তাঁদের তপস্যার বলে মাতঙ্গ রাক্ষসেরা তাঁদের আশ্রমে এসে উৎপাত করতে পারত না। সেখানে এলেই হিংসা রাগ ভুলে গিয়ে তারা শান্ত হয়ে পড়ত।"

'সখা ও সাথীর' আর একটি বিশেষ গৌরব এই যে ইহার ১৩০২ সালের শ্রাবণ সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথের একটি ক্ষুদ্র জীবনী প্রকাশিত হয়, পরের সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথ তাহার কিছু ভুল-ত্রুটি সংশোধন করিয়া দেন। বাংলা সাহিত্যে এইটিই রবীন্দ্রনাথের প্রথম মুদ্রিত জীবনী।

'সখা' ও 'সাথী'র মিলিত হিসাব ধরিয়া চৌদ্দ বৎসর—অর্থাৎ ১৩০৪ পর্য্যন্ত পত্রিকাটি চলিয়াছিল।

॥ ৬ ॥

মুকুল

'সখার' সহিত সম্পর্ক বেশিদিন রাখিতে না পারিলেও আচার্য্য শিবনাথ শাস্ত্রী দেশের ছেলেমেয়েদের ভুলিতে পারেন নাই। আদর্শ-বাদী সত্যনিষ্ঠ শিবনাথ যেমন বৃহত্তর কর্ম্মক্ষেত্রে নিজের পূর্ণ প্রতিভা লইয়া অগ্রসর হইতেছিলেন, তেমনি দেশের বালক-বালিকাদের জন্যও তাঁহার অন্তরে একটি শুভেচ্ছার স্নেহধারা বহিতেছিল। তাহারই প্রেরণায় ১৩০২ সালের আষাঢ় হইতে তিনি "মুকুল" নামে একটি বালকপাঠ্য পত্রিকা প্রকাশ করেন। কাগজটি বাহির হইয়াছিল কয়েকটি মহিলার উদ্যোগে। "কয়েক বৎসর পরে (১৮৯৫) সালে ইঁহারা (গুরুচরণ মহলানবীশের কন্যা সরলা, ভগবানচন্দ্র বসুর কন্যা লাবণ্যপ্রভা, চণ্ডীচরণ সেনের কন্যা কামিনী এবং শিবনাথ শাস্ত্রীর কন্যা হেমলতা) বালক বালিকাদিগের জন্য একখানি মাসিক পত্রিকা বাহির করিবার সংকল্প করিলেন। তখন আমি তাহার সম্পাদক হইয়া 'মুকুল' নামে এক মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করিলাম এবং কিছুদিন তাহার সম্পাদকতা করিলাম।"[১]

যে মহিলাদের উৎসাহে 'মুকুল' প্রকাশিত হয়, তাঁহারা সকলেই ইহার লেখিকা ছিলেন।

১৬ হইতে ১৮ পৃষ্ঠার বড় আকারের মাসিক পত্র, বার্ষিক মূল্য ছিল পাঁচ সিকা। প্রথম বর্ষ দশ সংখ্যা, তাহার পর হইতে নিয়মিত বারো সংখ্যায় "মুকুল" প্রকাশিত হইয়াছে।

নামে 'মুকুল', প্রকৃতপক্ষে ইহাকে পুষ্প-সম্ভার বলা যাইতে পারে। 'বালক-বন্ধু'তে কেশবচন্দ্র বীজ বপন করিয়াছিলেন, 'সখা',

---

১। আত্মচরিত, শিবনাথ শাস্ত্রী, ষোড়শ পরিচ্ছেদ

'সাথী' এবং 'সখা ও সাথী'তে তাহা পল্লবিত ও বিকশিত হইয়াছে—'মুকুলে' আসিয়া পুষ্পমঞ্জরীর গৌরবে ভূষিত হইয়া উঠিয়াছে। ইহা ঊনবিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ শিশু-পত্রিকা। পাঁচ বৎসর পরে শিবনাথ সম্পাদনা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, কিন্তু ইহাতে যে শক্তি তিনি সঞ্চার করেন, তাহারই বলে ইহা উনিশ বৎসরের দীর্ঘ জীবন লাভ করিয়াছিল। ১৩২০ সাল পর্য্যন্ত পত্রিকাটি জীবিত ছিল।

প্রথম সংখ্যার প্রস্তাবনায় সম্পাদক বলিয়াছেন:

"জ্ঞানের মুকুল, প্রেমের মুকুল, সকল ভাল বিষয়েরই মুকুল অবস্থা আছে। এই পত্রিকা যাহাদের জন্য, তাহারাও মুকুল, মানব মুকুল। তোমরা কি কেহ বলিতে পার, তাহারা ফুটিলে কি দাঁড়াইবে? আশা করিয়া চারাগাছে জল দিতে হয়, আশা করিয়া মানব মুকুলকে ফুটাইতে হয়। মানব মুকুলদিগকে ফুটাইবার পক্ষে সাহায্য করাই মুকুলের উদ্দেশ্য।......... আমরা মানব মুকুলদের হস্তে জ্ঞানের মুকুল দিব, যাহা তাহাদের জীবনে ফুটিয়া ফুলফলে পরিণত হইবে।"

আচার্য্য শিবনাথ তাঁহার সংকল্প পালন করিয়াছিলেন। মুকুল যথার্থভাবেই জ্ঞানের মুকুলে পরিণত হইয়াছিল। দ্বিতীয় সংখ্যায় "মুকুল কাহাদের জন্য?" প্রসঙ্গে সম্পাদক ইহার পাঠকদের গণ্ডী নির্দ্ধারিত করিয়া দিয়াছেন। বস্তুতঃ দুগ্ধপোষ্য শিশুদের জন্য—বয়স যাহাদের ৮।৯ বৎসরের মধ্যে, তাহাদের জন্য কোনো পত্রিকা আদৌ চালানো যায় কি না, তাহাতেই সন্দেহ আছে। শিবনাথ সুস্পষ্ট ভাবেই বলিয়া দিয়াছেন:

"যাহাদের বয়স ৮।৯ হইতে ১৬।১৭র মধ্যে ইহা প্রধানতঃ তাহাদের জন্য।

আমরা লিখিবার সময় এই বয়সের বালক বালিকাদের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াই লিখি। কিন্তু এই সকল বালক বালিকার একটা কর্ত্তব্য আছে। তাহাদের বাড়ীতে যে সকল ছোট ছোট ভাই বোন আছে, তাহাদিগকে মুকুলের ছবি দেখাইয়া তাহার বিবরণ মুখে মুখে বুঝাইয়া

দিতে হইবে। তা ভিন্ন তাহারা নিজে নিজে যাহা পড়িতে পারে, তাহাও বুঝাইয়া দিতে হইবে”—

শিশু-পত্রিকা সম্পর্কে ইহাই সঠিক এবং বিজ্ঞানসম্মত দৃষ্টিভঙ্গি।

কাগজটিকে সর্ব্ববিষয়ে আকর্ষণীয় করিয়া তুলিবার ব্যাপারে শাস্ত্রী মহাশয়ের চেষ্টার কোনো ত্রুটি ছিল না। নিজেই কবিতা, পুণ্যশ্লোক জীবনী, বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ, বিচিত্র প্রসঙ্গ লইয়া নিয়মিত লিখিতেন। এই রচনাগুলিতে তাঁহার চিত্তমাধুর্য্য এবং পবিত্র আদর্শবাদের দীপ্তি বিকীর্ণ হইয়াছে। তাঁহার গদ্য পদ্য রচনার নিদর্শন এই রকম :—

“পরের জিনিস না বলে লয়, তাকেই চুরি বলে,
সেই চুরির ধন কেউ যদি লয়, বাটপাড়ি তা হলে।
চোরের পিছে চোর তো আছে, বাঘের পিছে ফেউ,
এ সংসারে পাপটি করে রক্ষা না পায় কেউ।
চোরের জিনিষ চুরি করে, সে বড় তামাসা,
তবে শোন ‘কেলো ভেলোর’ কি হোল দুর্দ্দশা”—

(দ্বিতীয় বর্ষ, শ্রাবণ, “চোরের উপর বাটপাড়ি”)

“আমেরিকা দেশের একটি গল্প বলিতেছি। সে দেশে আনিপোস পর্ব্বত নামে একটা পর্ব্বত আছে। একবার শীতকালে সেই পাহাড়ের উপর দিয়া ঘোড়ায় চড়িয়া একজন লোক যাইতেছিলেন। ভয়ানক শীত পড়িয়াছে, চারিদিকে তুহিন্ পড়িতেছে, পথঘাট যেন তুলায় ঢাকা হইয়া গিয়াছে—চারিদিক সাদা ধপ্ ধপ্ করিতেছে। এমন সময় জঙ্গলের ভিতর দিয়া সেই ভদ্রলোকটি অশ্বারোহণে একেলা যাইতেছেন। অনেক ক্রোশের মধ্যে জনপ্রাণীর দেখা হইল না”—(তৃতীয় বর্ষ, বৈশাখ, কুকুরের প্রভুভক্তি)

শিবনাথ নিজে লিখিতেছিলেন, তাঁহার সহযোগিতা করিবার জন্য বাংলা সাহিত্যের তৎকালীন সমস্ত শ্রেষ্ঠ প্রতিভা আসিয়া মুকুলের লেখক সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিলেন। যোগীন্দ্রনাথ সরকার,

গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী, নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য, উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী প্রভৃতি প্রতিষ্ঠিত শিশু-সাহিত্যিকেরা তো ছিলেন-ই, তাঁহাদের সহিত মিলিত হইয়াছিলেন রবীন্দ্রনাথ, রমেশচন্দ্র দত্ত, আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, অবলা বসু, হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, দীনেন্দ্রকুমার রায়, কুসুমকুমারী দাস, রমণীমোহন ঘোষ, শশিভূষণ বসু, "আলো ও ছায়া" প্রণেতৃ কামিনী রায়, বিপিনচন্দ্র, যোগেশচন্দ্র রায়, কৃষ্ণকুমার মিত্র, অক্ষয় মৈত্রেয়, গিরিশচন্দ্র বসু, অতুলপ্রসাদ সেন, সারদারঞ্জন রায়, (ক্রিকেট সম্বন্ধীয় রচনায়) প্রমথনাথ রায় চৌধুরী, হরিহর শেঠ, এবং আরো অনেকে। শিবনাথ শাস্ত্রী ছোটদের জন্য এই পত্রিকায় যে রাজসূয় যজ্ঞের আয়োজন করিয়াছিলেন তাহা "ন ভূতো ন ভবিষ্যতি।" দলমতনির্ব্বিশেষে দেশের এতগুলি শ্রেষ্ঠ সুসন্তানের সমাবেশ, নবীন ও প্রবীণের প্রতিভার এমন সর্ব্বাত্মক সমন্বয়---বাংলা দেশের আর কোন সাময়িক পত্রে কোনদিন ঘটিয়াছে কিনা সন্দেহ। এই কাগজের খ্যাতি তখন ইংলণ্ড পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হইয়াছিল—মুকুলের একটি বিজ্ঞাপন হইতে তাহাও জানা যায়।

এই পত্রিকায় প্রকাশিত বহু রচনাই আজ পর্য্যন্ত বাংলা সাহিত্যের স্থায়ী-সম্পদ হইয়া আছে। উপেন্দ্রকিশোর "মুকুলে" আসিয়া নিজের প্রতিভার স্বরূপটি বুঝিয়াছেন—সাংবাদিকসুলভ নানা ধরণের লেখা ছাড়িয়া তিনি নিজস্ব পথটি বাছিয়া নিয়াছেন, তাঁহার "টুনটুনির বইয়ে"র অনেক গল্পই ইহাতে প্রকাশিত হইয়াছে। যোগীন্দ্রনাথ সরকারের যে কবিতাগুলি আজও শিশুরাজ্যে সমান সমাদৃত—এই মুকুলেই তাহাদের আবির্ভাব। প্রথম বছরের চতুর্থ সংখ্যাতে (আশ্বিন) দেখা দিয়াছে রবীন্দ্রনাথের "কাগজের নৌকা":

"ছুটি হলে রোজ ভাসাই জলে
কাগজ নৌকা খানি।

লিখে রাখি তাতে আপনার নাম,
লিখি আমাদের বাড়ী কোন্ গ্রাম,
বড় বড় করে মোটা অক্ষরে
যতনে লাইন টানি"—

কুসুমকুমারী দাসের সর্ব্ব-পরিচিত "আদর্শ ছেলে"ও প্রথম বছরের সপ্তম সংখ্যাতে (পৌষ) আবির্ভূত হইয়াছে :

আমাদের দেশে হবে সেই ছেলে কবে ?
কথায় না বড় হয়ে কাজে বড় হবে।
মুখে হাসি, বুকে বল, তেজে ভরা মন,
"মানুষ হইতে হবে"—এই যার পণ—

এই কাগজেই শিশু-সাহিত্য রচনায় দীনেন্দ্রকুমার রায় ও হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষের হাত খুলিয়াছে—অজস্র মনোহর রচনা তাঁহারা ইহাতে উপহার দিয়াছেন। দ্বিতীয় বছরে একজন অষ্টম বর্ষীয় বালকের সাহিত্য-সাধনায় হাতে-খড়ি হইয়াছে, তিনি সুকুমার রায় চৌধুরী। 'আবোল তাবোল'-এর স্রষ্টার প্রথম রচনা বলিয়াই নয়, মাত্র আট বছরেই ভাষা ও ছন্দের উপর তাঁহার কেমন অধিকার জন্মিয়াছিল, তাহাই লক্ষ্য করিবার মতো। কবিতার নাম "নদী"—তাহার কয়েকটি চরণ :

"পথে যেতে যেতে নদী দেখে কত শোভা,
কি সুন্দর সেই সব কিবা মনোলোভা।
কোথাও কোকিলে দেখে বসি সাথী সনে,
কি সুন্দর কুহু গান গায় নিজ মনে।
কোথাও ময়ুর দেখে পাখা প্রসারিয়া
বন ধারে দলে দলে আছে দাঁড়াইয়া।"

(জ্যৈষ্ঠ, ১৩২০)

তৃতীয় বৎসরে নবম বর্ষীয় সুকুমার রায়ের আর একটি কবিতা পাই—"টিক্ টিক্-টং।" বিষয়টি মৌলিক নয়—সুপরিচিত ইংরেজী

ঘুমপাড়ানি ছড়া "Hickory-dickory-dock" হইতে স্বচ্ছন্দ অনুবাদ। কিন্তু ইহাতেই সুকুমার রায়ের বিশিষ্ট মনোধর্ম্মের নির্দ্দেশ রহিয়াছে বলিয়া মনে হয়ঃ

টিক্-টিক্ টং

টিক্ টিক্ চলে ঘড়ী টিক্ টিক্ টিক্,
একটা ইঁদুর এলো সে সময়ে ঠিক।
ঘড়ি দেখে এক লাফে তাহাতে চড়িল,
টং করে অমনি ঘড়ি বাজিয়া উঠিল।
অমনি ইঁদুর ভায়া লেজ গুটাইয়া,
ঘড়ীর উপর থেকে পড়ে লাফাইয়া
ছুটিয়া পালায়ে গেল আর না আসিল,
টিক্ টিক টিক্ ঘড়ী চলিতে লাগিল।

(জ্যৈষ্ঠ—১৩০৩)

'মুকুলে' অজস্র মজার মজার ছবি বাহির হইত। এই ছবিগুলি সম্বন্ধে একটু বলিবার অছে। ইহাদের কতকগুলি বিলাতী পত্র-পত্রিকা হইতে গৃহীত হইয়াছিল। মধ্যে মধ্যে এইসব ছবি ছাপিয়া তরুণ লেখদের নিকট হইতে গল্প, কবিতা আহ্বান করা হইত। পরে এই ছবিগুলিই যোগীন্দ্রনাথ সরকারের গ্রন্থাবলীতে তাঁহার নিজের কবিতার সঙ্গে যুক্ত হইয়াছে। চতুর্থ বর্ষের আষাঢ় সংখ্যায় যে ছবির উপরে কবিতা লিখিয়া বারীন্দ্রকুমার ঘোষ (পরে বিখ্যাত বিপ্লবী) পুরস্কার পাইয়াছিলেন, সেইটির উপরেই "হাসি রাশি"তে কবিতা আছে—"বেজায় ধূর্ত্ত"। স্বয়ং সম্পাদক শিবনাথও এইরূপ ছবির উপর কবিতা লিখিয়াছেন—আবার যোগীন্দ্রনাথ তাঁহার নিজের বইতে সেই ছবিতেই কবিতা যোজনা করিয়াছেন। কৌতূহলোদ্দীপক হইবে মনে করিয়া এইরকম দুইটি

কবিতা উদ্ধৃত করিলাম। কোন কবিতাটি ভালো, তাহার বিচার অবশ্যই নিরর্থক :

যেমন কর্ম্ম তেম্‌নি ফল

টব হাতে গুটি গুটি ও কে যায় গো !
দিল দিল চাপা দিল পালা সাপের পো !
"দিয়েছি দিয়েছি চাপা, জব্দ এইবার।
জারিজুরি ফোঁসফাঁস খাটিবে না আর ॥"
"পোলো চাপা সাপ ভায়া এইবার যান।
বসিলাম রাজতক্তে হয়ে গদিয়ান ॥"
"ল্যাজে কি কামড়ালো মোর বাপরে বাপ
পালা ভাই ল্যাজ নিয়ে থাক পোড়া সাপ ॥"
ল্যাজ ফুলে কলা গাছ এ-ত বড় দায়।
ডালে বসে মন্ত্রী ভায়া মরে ভাবনায় ॥

(শিবনাথ শাস্ত্রী—'মুকুল' চৈত্র ১৩০১)

আর 'হাসিরাশি'তে :

সাপ নয় তো যম

সাপ নয়তো যম
টব্‌টা দিয়ে চাপা দিয়ে
ফাটিয়ে দেব দম।
যেমন তুমি খল
কারাগারে অন্ধকারে ভোগো প্রতিফল।
বাহবা কি মজা
সিংহাসনে বসে আছি কিষ্কিন্ধ্যার রাজা।
উঃ, জ্বলে মলুম বাপ্‌
ল্যাজের গোড়ায় ছুবলেছেরে হতভাগা সাপ্‌

প্রাণটা বুঝি যায়।
ল্যাজটা ফুলে কলাগাছ
করি কি উপায়।
মুখ থুবড়ে পড়ি বুঝি—হায়—হায়—হায়॥

মুকুলের স্মৃতি আজও সুদূর হইয়া যায় নাই। আজও বাংলা দেশের বহু প্রাচীন হয়তো তাঁহাদের বাল্যজীবনের স্বপ্নাচ্ছন্ন দিনগুলির সহিত মুকুলকে স্মরণ করিবেন। শিশু ও বালক চিত্ত-গঠনে—তাহাদের পাঠ্য-জীবনের বাহিরে প্রীতিময় সহচররূপে মুকুল চিরস্থায়ী নাম রাখিয়া গিয়াছে। বিংশ শতাব্দীতে "সন্দেশ" আসিয়াছে, "শিশু" দেখা দিয়াছে—"মৌচাক"—"শিশুসাথী"—"খোকাখুকু"—"রামধনু" প্রভৃতি প্রথম পর্য্যায়ের পত্র-পত্রিকা জন্ম নিয়াছে। কিন্তু মুকুল অতুলনীয়—সে ইহাদের শীর্ষ ভাগে আজও অবস্থান করিতেছে। অক্ষয় কীর্ত্তিমান শিবনাথ শাস্ত্রীর অন্যতম প্রধান কীর্ত্তি বলিয়াই ইহাকে আমরা মনে করি।

॥ ৭ ॥

অন্যান্য

এই প্রধান প্রধান পত্রিকাগুলি ছাড়াও এই শতাব্দীর শেষাশেষি আরো অনেকগুলি তরুণপাঠ্য পত্রিকা বাহির হইয়াছিল। ব্রাহ্ম-সমাজের সুশিক্ষা আন্দোলন এবং নবজাগ্রত জাতীয়তাবাদই ইহার প্রধান উদ্দীপনা বলা যাইতে পারে। বাংলা দেশের দূরতম প্রান্তগুলিতে পর্য্যন্ত দুটি একটি শিশুপাঠ্য পত্রিকার জন্ম হইয়াছে দেখা যায়। ইহা ছাড়া বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছাত্র ও শিক্ষকদের উদ্যোগে শিক্ষার অনুপূরক রূপেও বেশ কিছু পত্রিকা আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। তখন এত ব্যাপক ভাবে স্কুল ম্যাগাজিনের ব্যবস্থা ছিল না—ছাত্রদের দ্বারা প্রকাশিত

কাগজগুলি সেই দাবিই কতকটা মিটাইত—রচনাগুলিও আধা অ্যাকাডেমিক ছিল। ইহাদের অধিকাংশই স্বল্পায়ুঃ এবং বর্ত্তমানে কালগর্ভে বিলীন। দুই একটির সামান্য পরিচয় দিব। বিচ্ছিন্নভাবে ইহাদের বিশেষ গুরুত্ব না থাকিলেও সামগ্রিক ভাবে ইহারা যুগচেতনার একটি বিশেষ দিককে প্রতিফলিত করিয়াছে এবং সে-হিসাবেই ইহারা স্মরণযোগ্য।

বিশ্বদর্পণ: (১২৭৮, মাঘ ; জানুয়ারী ১৮৭১) প্রথমে পাক্ষিক রূপে, পরে মাসিকে পরিণত হয়। মোহনলাল বিদ্যাবাগীশ ও তারাকুমার তর্করত্ন সম্পাদনা করিতেন। বালক-বালিকাগণের শিক্ষোপযোগী "বিজ্ঞান সাহিত্যাদি রিযয়ক প্রস্তাব এবং ধর্ম্মনীতি, সামাজিক রীতিনীতি সংক্রান্ত প্রবন্ধ প্রকাশ" করাই ইহার অভিপ্রায় ছিল।

সন্তোষ প্রতিমা: (১২৯৬, ১৮৭৯) সাপ্তাহিক। বালকপাঠ্য সাপ্তাহিক পত্রিকা বোধ হয় এইটিই প্রথম। আমরা ১২৮৬ সালের 'ভারতী' পত্রিকার শ্রাবণ সংখ্যায় ইহার একটি সমালোচনা দেখিয়াছি। বলা হইয়াছে: 'কতকগুলি সুকুমারমতি বালক এই পত্রিকার অনুষ্ঠাতা। "বীণাপাণি" নামক ক্ষুদ্র অথচ সুকোমল কবিতাটি বিশেষ হৃদয়গ্রাহী। ভরসা করি, ইহা শুক্ল পক্ষের চন্দ্রের ন্যায় দিন দিন বর্দ্ধিতকায় ও বর্দ্ধিতপ্রভ হইয়া বঙ্গভাষাকে উজ্জ্বল করিবে।'

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার "বাংলা সাময়িক-পত্রে" ইহার কোন উল্লেখ করেন নাই।

বালক-হিতৈষী: (মাসিক, কার্ত্তিক, ১২৮৮) পরিচালক জানকীপ্রসাদ দে।

আর্য্য কাহিনী: সাপ্তাহিক (৮ই নভেম্বর, ১৮৮১) সম্পাদক সিদ্ধেশ্বর মুখোপাধ্যায়।

বালিকা: মাসিক (ভাদ্র, ১২৯০) ঢাকা হইতে অক্ষয়কুমার গুপ্তের সম্পাদনায় প্রকাশিত হইয়াছিল।

সুনীতি : পাক্ষিক (১লা কার্ত্তিক, ১৮০৫ শক, ১২৯০) পরিব্রাজক নামে খ্যাত কৃষ্ণপ্রসন্ন সেনের 'ধর্ম্ম প্রচারক' পত্রের আশ্রয়ে, বালক ও যুবকদিগের চিত্তে আর্য্যভাব সঞ্চারের প্রেরণায় বারাণসী সুনীতিসঞ্চারিণী সভা হইতে প্রচারিত হয়।

বাল্যবন্ধু : মাসিক (কার্ত্তিক, ১২৯০) বালকদের জন্য খ্রীষ্টধর্ম্ম বিষয়ক পত্রিকা। "জ্যোতিরিঙ্গণে"র আদর্শেই কল্পিত হইয়াছিল। সম্পাদনা করিতেন জে-ই পেন্।

ভোজবাজী : মাসিক (মাঘ, ১২৯১) অমৃতলাল বসু সম্পাদিত এই পত্রিকাখানি আজ পর্য্যন্ত একটি নিজস্ব বৈশিষ্ট্য লইয়া একক হইয়া আছে। ইহাতে বালকদের ইন্দ্রজাল, রসায়ন ও ম্যাজিক ইত্যাদি শিক্ষা দেওয়া হইত।

সুখী-পাখী : মাসিক (শ্রাবণ, ১২৯৫)। নীতিবিষয়ক বালক-পাঠ্য পত্রিকা। যশোহর হইতে প্রকাশিত হইত। সম্পাদক সারদাপ্রসাদ বসু।

শ্রীহট্ট সুহৃদ : মাসিক, (পৌষ, ১২৯৫, জানুয়ারী, ১৮৮৯)। "স্কুল কলেজের হীনচরিত্র বালক ও যুবকদিগের সৎপথে আনাই 'শ্রীহট্ট সুহৃদের' ব্রত।" ৮ পৃষ্ঠার পত্রিকা, বালকেরা পরিচালনা করিত।

শুক-সারি : মাসিক (মাঘ, ১২৯৬), নিবারণচন্দ্র কাব্যতীর্থ যশোহর জেলা স্কুল হইতে প্রকাশ করেন। ৮ পৃষ্ঠার পত্রিকাটির বৈশিষ্ট্য হইল শুক-শারির সংলাপের মধ্য দিয়া জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষা-দানের প্রয়াস। ছাত্রছাত্রীদের জন্য বার্ষিক মূল্য ৵০ আনা, বয়স্কদের জন্য এক টাকা। নিবারণচন্দ্র সুকবি ছিলেন, পত্রিকার প্রচ্ছদে এই 'মটো'টি মুদ্রিত থাকিত :

মানবের দেহ-শাখী, তায় মন শুকপাখী
বুদ্ধি সারি কাছে থাকি, বলে নাথ। গাও রে,
শ্রবণ-রঞ্জন তান, ধরিয়া মধুর গান
ত্রিতাপে তাপিত প্রাণ জুড়াও জুড়াও রে।

শিশু-বান্ধব : মাসিক, (১৮৮৯ ?) ইহাও মিশনারীদের পত্রিকা। জি, এইচ, রুজ (Rouse) সম্পাদক ছিলেন।

ছাত্রসখা : মাসিক, (১২৯৮) কাছাড় হাইলাকান্দি ছাত্র-সখা সমিতি হইতে কতিপয় ছাত্রদ্বারা প্রকাশিত হইয়াছিল।

শৈশবসখা : মাসিক। বৈশাখ ১৩০৩ (১৮৯৬)। সম্পাদক গুরুপ্রসন্ন দাসগুপ্ত।

অঞ্জলি : মাসিক। বৈশাখ ১৩০৫ (এপ্রিল—১৮৯৮)। চট্টগ্রাম হইতে প্রকাশিত হইত। সম্পাদনা করিতেন রাজ্যেশ্বর গুপ্ত। শিক্ষা-বিষয়ক মাসিক পত্রিকা ছিল।

প্রথম সংখ্যার প্রথম কবিতাটি সুন্দর। নাম 'উৎসর্গ'। আরম্ভ এইরূপ :

প্রক�ৃতি প্রাঙ্গণে যাঁর
চন্দ্র সূর্য্য তারকায়
খেলিছে অনন্তজ্যোতিঃ
অনন্ত চিন্ময় জ্ঞান ;
তাঁহার রাতুল পায়ে
করি এ অঞ্জলি দান।

বিশুদ্ধ শিক্ষা-মূলক পত্রিকা। কঠিন গম্ভীরমূর্ত্তি শিক্ষক সর্ব্বত্র বসিয়া আছেন—কোথাও লঘুতার লেশ মাত্রও নাই। দুই চারিটি জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধের সহিত রহিয়াছে ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার সিলেবাস হইতে আরম্ভ করিয়া মাননীয় ডিরেক্টর বাহাদুরের নির্দ্দেশ পর্য্যন্ত। বস্তুতঃ ইহা একেবারে হেড মাস্টারের ডেস্‌ক্‌ হইতেই আবির্ভূত হইয়াছে মনে হয়—ছাত্র এবং শিক্ষক, ইহার তর্জ্জনী-নির্দ্দেশ হইতে কেহই বাহিরে পড়েন নাই।

ছাত্রদের জন্য রাশি রাশি উপদেশ আছে—থাকিবারই কথা। ইহা টীচার্স গাইড্‌ও বটে। 'শিক্ষকের ত্রুটি' শিরোনামায় কতগুলি

সূত্র-সংকলন করা হইয়াছে। বেশ কৌতূহলোদ্দীপক বলিয়া কয়েকটি উদ্ধৃত করিয়া দিলাম :

১। স্কুল বসিবার পূর্ব্বে স্কুলে না যাওয়া।

২। ঘণ্টাধ্বনি হওয়া মাত্র শ্রেণীতে না যাওয়া।

৩। ছুটির ঘণ্টার জন্য উর্ধ্বকর্ণ হইয়া থাকা।

৮। অনুচ্চৈঃস্বরে কি অত্যুচ্চৈঃস্বরে শিক্ষাদান করা।

৯। শ্রেণীতে বসিয়া আলস্য, তন্দ্রা (তন্দ্রা ?) বা নিদ্রাগমন।

১১। ছাত্রদিগকে অঙ্ক দিয়া বা পড়িতে বলিয়া সংবাদপত্র বা অন্য কিছু পাঠ করা।

১৬। ছাত্রদের মুখে প্রশংসা শুনিবার বা তাহাদের নিকট বাহাদুরী পাইবার ইচ্ছা—ইত্যাদি।

ছাত্রদের নিকট 'অঞ্জলি' নিশ্চয়ই প্রিয়ত্ব অর্জ্জন করে নাই, শিক্ষকদের নিকটও করিয়াছিল কি না সে বিষয়ে বিশেষ সন্দেহ আছে।

প্রকৃতি : মাসিক ১৩০৭ (১৯০০)

প্রথম "Under the Supervision of Students" বলিয়া প্রকাশিত হইত, পরে বসন্তকুমার বসু প্রকাশক হন। পঞ্চম ও ষষ্ঠ যুগ্ম সংখ্যায় শীর্ষবাণী আরোপিত হয় : "প্রবন্ধাদির মতামতের জন্য লেখকই দায়ী।"

প্রথম সংখ্যার প্রচ্ছদপটের বিপরীত দিকে 'বিবাহ উপলক্ষে' নামে ক্ষেত্রমোহন ভট্টাচার্য্য লিখিত একটি' 'প্রীতি উপহার' জাতীয় কবিতা সম্পূর্ণ অকারণে ছাপিয়া দেওয়া হইয়াছে :

"বলিব তোমারে কিবা প্রণয়-মিলনে,
বাঁধিলে যাহারে আজি সংসার বন্ধনে ;
সেই প্রাণ সাথে মিলি, নব প্রেম-সুধা ঢালি
ধরম করম সতি, কর পতি সেবা—" ইত্যাদি।

আট পৃষ্ঠার বৈচিত্র্যহীন পত্রিকা। ছোট ছোট লেখা ও কবিতা

থাকিত, ধাঁধাও দেওয়া হইত। পরীক্ষার্থীদের সুবিধার্থে এণ্ট্রান্স-পাঠ্য ইংরাজি কবিতার অনুবাদ মধ্যে মধ্যে প্রকাশিত হইত। নমুনা স্বরূপ বসন্তকুমার বসুকৃত Hood-এর Past and Present-এর কয়েক পংক্তি অনুবাদ উদ্ধৃত হইল :

"মনে পড়ে মনে পড়ে শৈশব-খেলায়
তুলিতাম যবে সেই বৃক্ষের শাখায়,
সেবিতাম হৃষ্ট মনে বালকের মত,
বিমল-অন্তরে স্নিগ্ধ সমীর সতত।
শৈশবের সেই মম নির্ম্মল জীবন,
পাপে-তাপে দহিতেছে এবে অনুক্ষণ—"

অনুবাদটি নিতান্ত মন্দ হয় নাই।

ইহাতে গল্প, উপন্যাস, নাটিকাও থাকিত—কিন্তু সেগুলি নিতান্তই অনুল্লেখযোগ্য। পত্রিকাটি ছিল বিমিশ্র, একাধারে বালক ও যুবকদের জন্য। ইহাতে দুই তিনটি লেখকের নাম স্মরণযোগ্য : কুমুদরঞ্জন মল্লিক, দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার ও ইন্দুপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শিশু পত্র-পত্রিকার মোটের উপর ইহাই ইতিহাস। পূর্ব্বের বক্তব্য অনুসরণ করিয়া বলিব পত্র-পত্রিকা প্রকাশ করিয়া এবং শিশুযোগ্য গ্রন্থাদি রচনা করিয়া এই সময় ব্রাহ্ম-সমাজই দেশব্যাপী আনন্দময় সুশিক্ষার আলোড়ন গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। প্রথম প্রথম হিন্দু সমাজ তাঁহাদের এই প্রচেষ্টাকে যথেষ্ট সমর্থন করেন নাই। 'সখা' এবং 'সখা ও সাথী'র স্বল্প সীমিত জীবন হয় তো তাহারই প্রমাণ। প্রমদাচরণের অমন সুন্দর অসাম্প্রদায়িক পত্রিকার তৃতীয় বৎসরের সূচনাতেও কোনো গ্রাহক লিখিয়াছেন : "আমি আর আপনাদের কাগজের গ্রাহক থাকিতে ইচ্ছা করি না। আপনাদের পত্রিকা যেরূপ ব্রাহ্মভাবপূর্ণ তাহাতে আর্য্যসন্ততিবর্গের তাহা পাঠ করা বা গ্রহণ করিয়া উৎসাহ দেওয়া উচিত নয়।" উত্তরে প্রমদাচরণ বলিয়াছিলেন, "ছি ! ছি ! ছি ! এমন লোকের সঙ্গেও তর্ক

করিতে হয়! 'সখা' হিন্দু সমাজেরও কাগজ নয়, ব্রাহ্ম-সমাজেরও কাগজ নয়। কেবল বালক-বালিকাদের যাহাতে উপকার হয়, তাহাই করিতে ইহার জন্ম, 'সখা' চিরকাল তাহাই করিবে।" প্রমদাচরণ হয়তো পারেন নাই—কিন্তু ব্রাহ্ম-সমাজের বিশিষ্ট আচার্য্য হইয়াও শিবনাথ শাস্ত্রী 'সখা'র অসমাপ্ত কার্য্যভার সমাপ্ত করিয়াছিলেন। সম্প্রদায়গত গোঁড়ামীর গণ্ডী পার হইয়া দেশের বৃহত্তর জনসাধারণ এই সব পত্র-পত্রিকার সার্থকতা ক্রমশঃ বুঝিতে পারিয়াছিলেন—হিন্দু-ব্রাহ্মের মধ্যগত ভেদরেখাটি লুপ্ত হইয়া গিয়া শিশু-পত্রের স্থায়ী ভিত্তি রচিত হইয়া গিয়াছিল।

সপ্তম অধ্যায়

নবযুগের অধিনায়কবৃন্দ

॥ ১ ॥

পূর্ব্ববর্ত্তী অধ্যায়ে আমরা যে আলোচনা করিয়াছি, আশা করি বাংলা শিশু-সাহিত্যের কয়েকটি স্মরণীয় নাম তাহা হইতে উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। আমরা এইবারে তাঁহাদের বৈশিষ্ট্যের কিছু কিছু পরিচয় দিতে চেষ্টা করিব। ইঁহাদের কয়েক জনেরই সাধনা বিংশ শতাব্দীর বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ হইয়া সম্পূর্ণতা লাভ করিয়াছে; কিন্তু প্রধান ভাবে উনবিংশ শতাব্দীতেই ইঁহারা কতখানি দীপ্তিমান হইয়া উঠিয়াছিলেন, তাহাই আমাদের আলোচ্য। আর ইঁহাদের মধ্যে প্রথমেই স্মরণ করিতেছি: রবীন্দ্রনাথকে।

রবীন্দ্রনাথ

"তবু আমার পক্ক কেশের লম্বা দাড়ির সম্ভ্রমে
আমাকে যে ভয় কর নি দুর্ব্বাসা কি যম ভ্রমে,
মোর ঠিকানায় পত্র দিতে হয় নি কলম কম্পিত,
কবিতাতে লিখতে চিঠি হুকুম এল লম্ফিত,
এইটে দেখে মনটা আমার পূর্ণ হল উৎসাহে,
মনে হল, বৃদ্ধ আমি মন্দ লোকের কুৎসা এ।
মনে হল আজও আছে কম বয়সের রঙ্গিমা,
জরার কোপে দাড়ি গোঁপে হয় নি জবড় জঙ্গিমা।
তাই বুঝি সব ছোট যারা তারা যে কোন বিশ্বাসে
এক বয়সী বলে আমায় চিনেছে এক নিঃশ্বাসে—"

১৩৩০ সালে শোভনা দেবী এবং নলিনী দেবী নামে দুইটি ছোট মেয়েকে কবিতায় চিঠি লিখিতে গিয়া এম্‌নি করিয়াই মনের স্নেহমধুর পরিচয়টি বিশ্ব-কবি মেলিয়া ধরিয়াছিলেন। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ লেখকদের মধ্যে তাঁহার আসন—দেশ-দেশ নন্দিত করিয়া তাঁহার জয়ভেরী বাজিয়াছে—মাত্র সাহিত্য-সম্রাটই তিনি নন, বিচিত্র, বহুমুখী কর্ম্মযজ্ঞে তাঁহাকে ঋত্বিকের আসন লইতে হইয়াছে। কিন্তু শিল্প-সাধনা ও জীবন-সাধনার নীরন্ধ্র নিরবচ্ছিন্নতার মধ্যেও কবি শিশুদের কখনো ভুলিতে পারেন নাই। বিশ্বকবির জগদ্ব্যাপী স্বাভাবিক সহানুভূতির সহিত মিশিয়া গিয়াছে অকালে মাতৃহারা তাঁহার নিজ সন্তানদের বেদনা। তাই জীবনের শেষ দিনটি পর্য্যন্ত যখনই অবসর পাইয়াছেন, ছোটদের জন্য গল্প, কবিতা, নাটক তিনি উপহার দিয়াছেন। 'নদী', 'মুকুট', 'শিশু', 'শিশু ভোলানাথ', 'খাপছাড়া', 'সে', 'ছড়ার ছবি', 'ছেলেবেলা', ও 'গল্প স্বল্প'—প্রধানতঃ এই নয় খানি ছাড়াও 'সহজ পাঠ', 'পাঠ-প্রচয়' এবং 'ছুটির পড়াকে'ও ইহাদের মধ্যে স্থান দেওয়া যাইতে পারে। সংখ্যার দিক হইতেও বইগুলি নিতান্ত অল্প নয়।

'বালকের' আলোচনা হইতেই দেখিয়াছি—রবীন্দ্রনাথ শিশুদের জন্য সমগ্র মন-প্রাণ দিয়া কি ভাবে লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। উপন্যাস, নাটক, জীবনী, কবিতা, পত্র-সাহিত্য—এক বছর ধরিয়া প্রচুর পরিমাণে সৃষ্টি করিয়াছেন। ইহাদের সবগুলিই একান্ত শিশুজনোচিত হয় নাই—তথাপি শিশু-সাহিত্যের সর্ব্বতোমুখী সম্ভাবনা সম্পর্কে তিনি যে কতখানি সচেতন ছিলেন—এগুলি হইতে তাহা বোঝা যায়; এবং ইহাও বোঝা যায়—তরুণ পাঠক-পাঠিকাদের সম্পর্কে তাঁহার মনে অনুকম্পার উপেক্ষা ছিল না, তাহাদের গ্রহণক্ষমতার উপর তাঁহার শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস ছিল।

আমেরিকার প্রথিতযশা লেখক মার্ক টোয়েনের "টম্ সোয়েয়ার", "হাক্‌লবেরী ফিন্" কিংবা "দি প্রিন্স এণ্ড দি পপার" (The

Prince and the Pauper) সর্ব্ব স্তরের নর-নারীর উপর একটি সাধারণ দৃষ্টি রাখিয়া লিখিত—সকলেই এগুলি পড়িয়া আনন্দ পান। 'বালকে' অসমাপ্ত ও পরে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত **'রাজর্ষি'**তেও রবীন্দ্রনাথ এই রকম একটি পরীক্ষা করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। অতিরিক্ত দৈর্ঘ্য এবং অসংখ্য ঘটনার বিন্যাসে 'রাজর্ষি' সম্পূর্ণ সার্থক হইতে পারে নাই—কিন্তু ইহার মধ্যে যে বিপুল সম্ভাবনাটি ছিল পরবর্ত্তী লেখকেরা সেটিকে উপলব্ধি করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না। দৃষ্টান্তস্বরূপ "রাজর্ষি"র দশম অধ্যায় হইতে একটি সুপরিচিত অংশ উদ্ধৃত করিতেছি ঃ

"অরণ্যের মধ্যস্থলে কতকটা ফাঁকা। একটি স্বাভাবিক জলাশয়ের মতো আছে, বর্ষাকালে তাহা জলে পরিপূর্ণ। সেই জলাশয়ের ধারে সহসা ফিরিয়া দাঁড়াইয়া রাজা বলিলেন, 'দাঁড়াও!'

নক্ষত্র রায় চমকিয়া দাঁড়াইলেন। মনে হইল রাজার আদেশ শুনিয়া সেই মুহূর্ত্তে কালের স্রোত যেন বন্ধ হইল—। সেই মুহূর্ত্তেই যেন অরণ্যের বৃক্ষগণ যে যেখানে ছিল ঝুঁকিয়া দাঁড়াইল—নীচে হইতে ধরণী এবং উপর হইতে আকাশ যেন নিঃশ্বাস রুদ্ধ করিয়া স্তব্ধ হইয়া চাহিয়া রহিল। কাকের কোলাহল থামিয়া গেছে, বনের মধ্যে একটি শব্দ নাই। কেবল সেই 'দাঁড়াও' শব্দ যেন তড়িৎ প্রবাহের মতো বৃক্ষ হইতে বৃক্ষান্তরে, শাখা হইতে প্রশাখায় প্রবাহিত হইতে লাগিল; অরণ্যের প্রত্যেক পাতাটা যেন শব্দের কম্পনে রী-রী করিতে লাগিল। নক্ষত্র রায়ও যেন গাছের মতোই স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইলেন।

রাজা তখন নক্ষত্র রায়ের মুখের দিকে মর্ম্মভেদী স্থির বিষণ্ণ দৃষ্টি স্থাপিত করিয়া প্রশান্ত গম্ভীর স্বরে ধীরে ধীরে কহিলেন, "নক্ষত্র, তুমি আমাকে মারিতে চাও?"—

নক্ষত্র বজ্রাহতের মতো দাঁড়াইয়া রহিলেন, উত্তর দিবার চেষ্টাও করিতে পারিলেন না।

রাজা কহিলেন, "কেন মারিবে ভাই? রাজ্যের লোভে? তুমি কি মনে করো রাজ্য কেবল সোনার সিংহাসন, হীরার মুকুট ও রাজছত্র? এই মুকুট, এই রাজছত্র, এই রাজদণ্ডের ভার কত জান? শত সহস্র লোকের চিন্তা এই হীবার মুকুট দিয়া ঢাকিয়া রাখিয়াছি—"

ইহার ভাষায়, ভাবে ও ব্যঞ্জনায় যে ঐক্যের সৃষ্টি হইয়াছে—অরণ্যের বর্ণনায় সে রুদ্ধশ্বাস নাট্য-মুহূর্ত্ত গড়িয়া উঠিয়াছে, শিশু বা বালক পাঠকের কাছে তাহার সমস্ত সৌন্দর্যটি ধরা পড়িবে না; কিন্তু তাহা সত্ত্বেও মূল গল্পের কৌতূহল তাহাকে আকর্ষণ করিবে এবং ইহার পূর্ণ ব্যঞ্জনাটি দূরাগত সমুদ্রধ্বনির মতো তাহার মনে রহস্যময়-তার একটি অনুভব জাগাইয়া তুলিবে। শিশু-সাহিত্যের সহিত নিত্য-সাহিত্যের যোগ এই ভাবেই অন্তর্নিহিত থাকে।

কিন্তু পরে রবীন্দ্রনাথ 'রাজর্ষি'কে 'বিসর্জনে' সংহত করিয়াছেন—ছোটদের জন্য দ্বিতীয় উপন্যাস আর লেখেন নাই।

শিশু-কবিতার ক্ষেত্রেও রবীন্দ্রনাথ তরুণ মন ও পরিণত মনের মধ্যে এমনি ভাবেই যোগসূত্র রচনা করিতে চাহিয়াছিলেন। "বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদী এল বাণ"—"বালকের" পৃষ্ঠায় শিশুদের জন্য রচিত ইহাই তাঁহার সর্ব্বপ্রথম কবিতা। লক্ষ্য করিবার মতো, এটি কেবল অল্পবয়সী পাঠককে উদ্দেশ করিয়াই লেখা নয়। রবীন্দ্রনাথের যে মন বর্ষণ-মুখরিত দিনে, বিস্মৃত যুগের উজ্জয়িনীচারিণী' 'মালবিকা'র স্বপ্ন দেখে, সেই মনটিই আর একভাবে নিজের ফেলিয়া আসা অতীতের দিকে যাত্রা শুরু করিয়াছে ঃ

"মেঘের খেলা দেখে কত খেলা পড়ে মনে,
কতদিনের লুকোচুরি কত ঘরের কোণে।
তারি সঙ্গে মনে পড়ে ছেলেবেলার গান—
'বৃষ্টি পড়ে টুপুর টাপুর নদেয় এল বান।'
······মনে পড়ে সুয়োরানী দুয়োরানীর কথা,
মনে পড়ে অভিমানী কঙ্কাবতীর ব্যথা।

মনে পড়ে ঘরের কোনে মিটিমিটি আলো,
একটা দিকের দেয়ালেতে ছায়া কালো কালো—"
—(রচনাবলীর পাঠ)

'বালকে' প্রকাশিত অনেকগুলি কবিতা প্রথমে 'কড়ি ও কোমলে', পরে 'শিশু'তে সঙ্কলিত হইয়াছিল। কিন্তু শিশুর কবিতাগুলির মনোভঙ্গি অন্যত্রও প্রতিফলিত হইয়াছে। শৈশবের হারাইয়া যাওয়া দিনগুলির জন্য বয়স্ক মনের দীর্ঘশ্বাস 'কড়ি ও কোমলে'র 'উপকথা' কবিতাতেও অনুরূপভাবে ঝরিয়া পড়িয়াছে ঃ

"রাজপুত্র অবহেলে কোন্ দেশে যেত চলে
কত নদী কত সিন্ধু পার।
সরোবর ঘাট আলা মণি হাতে নাগবালা
বসিয়া বাঁধিত কেশভার।
সিন্ধুতীরে কতদূরে কোন্ রাক্ষসের পুরে
ঘুমাইত রাজার ঝিয়ারী—"

সেই স্বপ্নভরা শৈশব আর নাই। এখন বয়ঃপ্রাপ্ত মন কঠিন বাস্তবের বন্ধনে সীমায়িত ঃ

"আজি ফুরায়েছে বেলা জগতের ছেলেখেলা
গেছে আলো-আঁধারের দিন।
আর তো নাইরে ছুটি মেঘরাজ্য গেছে টুটি
পদে পদে নিয়ম অধীন—"

সেদিনের মেঘরাজ্য ভাঙিয়াছে বটে, কিন্তু যে কল্পনাশক্তি মুহূর্ত্তে সহস্র বৎসর পার হইয়া সিপ্রা নদীতটে উত্তীর্ণ হইয়া সন্ধ্যালগ্নে মহাকাল-মন্দিরে গম্ভীরমন্দ্র সন্ধ্যারতির বন্দনা শুনিতে পায়—তাহার পক্ষে কিছুক্ষণের জন্য শৈশব-স্মৃতি-প্রবাহে অবগাহন করা এমন কী কঠিন! বস্তুতঃ শিশুর খণ্ড খণ্ড অস্পষ্ট কল্পনা তাঁহার পরিণত প্রতিভার পরিস্রবণে একটি পরিচ্ছন্ন শিল্পরূপ ধরিয়াছে।

শিশুদের জন্য রবীন্দ্রনাথ প্রথম লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন

১২৯২ সালে এবং পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত ইহাদের অনেকগুলিকেই 'ছবি ও গান', 'কড়ি ও কোমল', 'সোনার তরী' ইত্যাদিতে ছড়াইয়া দিয়াছিলেন। ইহারাই রবীন্দ্রনাথের শিশু-কবিতার প্রথম উপচার। কবি-পত্নীর দেহান্তের (৭ই অগ্রহায়ণ, ১৩০৯) পর বেদনার্ত্ত হৃদয়ে সন্তানদের সান্ত্বনা দিবার জন্য তিনি আরো কিছু কবিতা লিখিয়া এবং বিভিন্ন গ্রন্থের কবিতাগুলিকে সংগ্রহ করিয়া মোহিতচন্দ্র সেন সম্পাদিত 'কাব্যগ্রন্থে'র সপ্তমভাগে 'শিশু' নামে প্রকাশ করেন (১৩১০)।

তাঁহার এই কবিতাগুলির মধ্যে দুইটি সুস্পষ্ট বিভাগ লক্ষ্য করিতে পারা যায়। একদিকে তাঁহার মন পরিত্যক্ত বাল্য জীবনের মধ্যে ফিরিয়া গিয়া আবার বালক হইয়া উঠিয়াছে—আর একদিকে মাতা-পিতার যৌথ-বাৎসল্যের স্নেহধারা অকৃত্রিম ভাবে উৎসারিত হইয়া পড়িতেছে।

স্মৃতিচর্চ্চার পরিচয় বহন করিতেছে 'বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর', 'সাত ভাই চম্পা,' 'পুরোনো বট' ইত্যাদি কবিতা। 'পুরোনো বট'-এ রবীন্দ্রনাথের শিশুচিত্তটির সহজ-সরল এবং একান্ত unsophisticated পরিচয় বিমূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে :

"গল্প কত ছিল যেন তোমার খোপে খাপে,
পাখির সঙ্গে মিলে মিশে ছিল চুপে চাপে,
দুপুর বেলা নূপুর তাদের বাজত অনুক্ষণ,
ছোট দুটি ভাই ভগিনীর আকুল হত মন।
ছেলেবেলায় ছিল তারা কোথায় গেল শেষে।
গেছে বুঝি ঘুমপাড়ানি পিসি মাসির দেশে।"

বাৎসল্য ক্ষরিত হইয়া পড়িয়াছে 'হাসি-রাশি' 'বাব্‌লা রাণী' 'মায়ের আশা' ও 'আশীর্ব্বাদ' প্রভৃতিতে। 'কড়ি ও কোমলে'র বিস্তীর্ণ 'মঙ্গল-গীতি'র তিনটি কবিতা (নাসিকে ইন্দিরা দেবীর উদ্দেশে সস্নেহ আশীর্ব্বাদ ও আবেগতপ্ত উপদেশ) এই পর্য্যায়ে পড়ে ; যদিও 'মঙ্গল-গীতি'র গভীর বক্তব্য শিশুদের কাছে সম্পূর্ণ স্পষ্ট হইবে না,

তথাপি দেশের তরুণ মনে কোন্ প্রেরণাটি তিনি সঞ্চার করিতে চাহিয়াছিলেন, এগুলি হইতে তাহা বোঝা যাইবে ঃ

"শোনো শোনো উঠিতেছে সুগম্ভীর বাণী
ধ্বনিতেছে আকাশ পাতাল।
বিশ্ব চরাচর গাহে কাহারে বাখানি
আদিহীন অন্তহীন কাল।
যাত্রী সবে ছুটিয়াছে শূন্যপথ দিয়া
উঠেছে সংগীত কোলাহল,
ওই নিখিলের সাথে কণ্ঠ মিলাইয়া
মা আমরা যাত্রা করি চল।

যাত্রা করি বৃথা যত অহংকার হতে
যাত্রা করি ছাড়ি হিংসা দ্বেষ,
যাত্রা করি স্বর্গময়ী করুণার পথে,
শিরে ধরি সত্যের আদেশ।
যাত্রা করি মানবের হৃদয়ের মাঝে
প্রাণে লয়ে প্রেমের আলোক,
আয় গো মা যাত্রা করি জগতের কাজে
তুচ্ছ করি নিজ দুঃখ শোক।" (মঙ্গল-গীতি)
— রচনাবলীর পাঠ

ইহা পিতার হৃদয়ের প্রতিফলন—স্নেহ-স্নিগ্ধ, অথচ গভীর ও গম্ভীর। অন্যদিকে মাতৃহৃদয়ের কোমল-সুন্দর অভিব্যক্তি 'হাসি-রাশি'র এই পংক্তিগুলিতে অসামান্য হইয়া দেখা দিয়াছে ঃ

"রাঙা দুটি ঠোঁটের কাছে মুক্তো আছে ফলে,
মায়ের চুমোখানি যেন মুক্তো হয়ে দোলে
আকাশেতে চাঁদ দেখেছে, দুহাত তুলে চায়,
মায়ের কোলে দুলে দুলে ডাকে 'আয় আয়'।

চাঁদের আঁখি জুড়িয়ে গেল তার মুখেতে চেয়ে,
চাঁদ ভাবে কোত্থেকে এল চাঁদের মত মেয়ে।”

—রচনাবলীর পাঠ

বলিতে গেলে, নীতিধর্ম্মী শিশু-কবিতাকে স্নেহরসে সিক্ত করিয়া তাহার একটি নূতন পথ রবীন্দ্রনাথ দেখাইয়া দিলেন। যোগীন্দ্রনাথ সরকার এখান হইতেই তাঁহার নির্দ্দেশ লইয়াছিলেন। গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী এই সুরে অনেকগুলি কবিতা লিখিয়াছিলেন, স্বর্ণকুমারী দেবীর বিদ্যালয়পাঠ্য 'গল্প-স্বল্পের' কবিতাগুলিতেও ইহারই প্রতিফলন পড়িয়াছে।

বাংলা-সাহিত্যে শিশুদের জন্য দীর্ঘতম কবিতা ('আদর্শ-কবিতা'য় যোগীন্দ্রনাথ বসুর 'রামায়ণ-কথা'[১] বাদ দিলে) রচনার গৌরব রবীন্দ্রনাথেরই প্রাপ্য বলিয়া মনে হইতেছে। কবিতাটির নাম **'নদী'**। বলেন্দ্রনাথকে নিবেদিত এই খণ্ড-কাব্যটি স্বতন্ত্র গ্রন্থরূপে প্রথম প্রকাশিত হয় ১৩০২ সালে, পরে ইহা 'শিশু'র অন্তর্ভুক্ত হয়। ইহার ভূমিকায় (প্রথম মুদ্রণ) রবীন্দ্রনাথ জানাইয়াছিলেন :

“এই কাব্যগ্রন্থখানি বালক-বালিকাদের পাঠের জন্য রচিত হইয়াছে। পরীক্ষার দ্বারা জানিয়াছি, ইহার ছন্দ শিশুরা সহজেই আবৃত্তি করিতে পারে। বয়স্ক পাঠকদিগকে বলা বাহুল্য যে প্রত্যেক ছত্রের আরম্ভ শব্দটির পরে যেখানে ফাঁক দেওয়া হইয়াছে সেখানে অল্পকাল মাত্র থামিতে হইবে।”

কবিতাটির উপকরণ ভৌগোলিক। তুষারমগ্ন সমুচ্চ পর্ব্বতচূড়ায় হিমবাহ হইতে জন্ম লইয়া, দুর্গমের বন্ধন ভাঙিয়া, আদিম মহারণ্যের জটিল অন্ধকারের মধ্যে দিয়া পথ কাটিয়া সমতলে নদীর অবতরণ এবং গ্রাম-জনপদ-মন্দির-শস্যভূমিকে সজল সিক্ত করিয়া মহাসমুদ্রে আত্মনিবেদন—বিষয়বস্তু বলিতে ইহাই। কিন্তু আশ্চর্য্য চিত্র-রচনার কৌশলে, প্রকৃতি-জীবজন্তু-দেশ-বিদেশের মানুষের সংক্ষিপ্ত অথচ

১। অষ্টম অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য

অপরূপ নিপুণ বর্ণনায় এবং ভাষার কোমল কারুকৃতিতে তরুণ পাঠকের মন এই নদীস্রোতের সহিত শৈল-শিখর হইতে সমুদ্র পর্য্যন্ত বহিয়া চলে, চক্ষের সম্মুখে দ্রুত দৃশ্য-পবিবর্ত্তন একটি বর্ণাঢ্য ছায়াচিত্রের মতো জাগিয়া ওঠে। বাংলা শিশু-সাহিত্যে 'নদী' রবীন্দ্রনাথের একটি অভিনব কীর্ত্তি:

সেই নীল আকাশের পায়ে
সেথা কোমল মেঘের গায়ে
সেথা সাদা বরফের বুকে,
নদী ঘুমায় স্বপন-সুখে।
কবে মুখে তার রোদ লেগে
নদী আপনি উঠিল জেগে,
কবে একদা রোদের বেলা
তার মনে পড়ে গেল খেলা।
সেথায় একা ছিল দিন রাতি,
কেহই ছিল না খেলার সাথি।
সেথায় কথা নাহি কারো ঘরে,
সেথায় গান কেহ নাহি করে।
তাই ঝুরু ঝুরু ঝিরি ঝিরি
নদী বাহিরিল ধীরি ধীরি।
মনে ভাবিল, যা আছে ভবে
সবই দেখিয়া লইতে হইবে—"

১৩০২ সালেই রবীন্দ্রনাথের নাট্যকাব্য সংগ্রহ 'কাহিনী' প্রকাশিত হয়। **"লক্ষ্মীর পরীক্ষা"** নাটকটি ইহারই অন্তর্গত। বাড়ীর মেয়েদের অভিনয়ের জন্য "লক্ষ্মীর পরীক্ষা" লিখিত হইয়াছিল। ৮।৯ হইতে ১৫।১৬ বৎসর পর্য্যন্ত শিশু-সাহিত্যের যে সীমারেখা শিবনাথ শাস্ত্রী নির্ণয় করিয়া দিয়াছেন, সেদিক হইতে বিচার করিয়া এটিকেও নিঃসংশয়ে এই পর্য্যায়ের অন্তর্গত করা চলে।

রবীন্দ্রনাথের পূর্ব্ববর্ত্তী হেঁয়ালি নাট্যগুলি ক্ষুদ্রায়তন; তাঁহার 'মুকুট' নাটকাকারে অনেক পরে (১৯০৮) প্রকাশিত হইয়াছে। অতএব দুই দৃশ্যে বিভক্ত এই অপূর্ব্ব রচনাটিকে আমরা প্রথম পূর্ণাঙ্গ শিশু-নাটকের গৌরব দিব। ইহার বক্তব্য তরুণ মনের সম্পূর্ণ উপযোগী। রচনাটির উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ইহার ছন্দ ও ভাষা। 'কর্ণকুন্তী সংবাদ' এবং 'গান্ধারীর আবেদনে'র জলদমন্দ্র তান-প্রধান ছন্দ ও গম্ভীর তৎসম শব্দের পাশাপাশি ইহার লঘু চপল ছন্দ, চলিত ভাষার স্বচ্ছন্দ ব্যবহার ও অন্ত্যমিলের চমকপ্রদ প্রয়োগ রবীন্দ্র-প্রতিভার সর্ব্বাত্মকতার স্বাক্ষর বহিতেছে :

মালতী

আজ্ঞে।

ক্ষীরো

কী কর্ত্তব্য ?

মালতী

জরিমানা দিক যত অসভ্য
একশো – একশো।

ক্ষীরো

গরীব ওরা যে,
তাই একেবারে একশোর মাঝে
নব্বই টাকা করে দিনু মাপ।

প্রথমা

আহা গরীবের তুমিই মা-বাপ।

দ্বিতীয়া

কার মুখ দেখে উঠেছিল প্রাতে,
নব্বই টাকা পেল হাতে হাতে।

তৃতীয়া

নব্বই কেন, যদি ভেবে দেখে
আরো ঢের টাকা নিয়ে গেল ট্যাঁকে।
হাজার টাকার ন-শো নব্বই
চোখের পলকে পেল সর্ব্বই।

রাজর্ষি উপন্যাসের মতোই বাংলা শিশুনাট্যে একটি নূতন সম্ভাবনা সংকেতিত করিয়াছিল 'লক্ষ্মীর পরীক্ষা'। ছন্দের দোলার সহিত নাট্য-রসের সমন্বয়ে চমৎকার একটি শিল্প-রীতির সূত্রপাত করিয়া দিয়াছিলেন রবীন্দ্রনাথ। কিন্তু আর কেহই এই সংকেত গ্রহণ করেন নাই—সম্ভবতঃ শক্তিতে কুলায় নাই বলিয়াই। সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত কিশোরীদের জন্য "ধূপের ধোঁয়া" নামে একটি অপূর্ব্ব নাটক লিখিয়াছিলেন; তাঁহার পক্ষে এ জাতীয় রচনা অসম্ভব ছিল না—কৌতুকস্নিগ্ধ মন এবং ভাষা ও ছন্দ তাঁহার আয়ত্তগত ছিল—কিন্তু তিনিও এ দিকে অগ্রসর হন নাই।

রবীন্দ্রনাথের আরো দুইটি বই ঊনবিংশ শতাব্দীর শিশু-সাহিত্য প্রসঙ্গে স্মরণযোগ্য। ইহারা 'কথা ও কাহিনী' (পূর্ব্বে আলাদা ভাবে ছিল, পরে একত্রে যুক্ত হয়) এবং 'কণিকা'—দুইখানিই ১৩০৬ সালে প্রকাশিত হয়।

ইহাদের সম্পর্কে ১৩০৮ সালে জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় সংখ্যার 'মুকুলে' মজুমদার লাইব্রেরীর পক্ষ হইতে সুবোধচন্দ্র মজুমদার যে বিজ্ঞাপন দিয়াছেন, তাহাতে বলা হইয়াছে: "ছেলেমেয়েদের পড়িবার উপযোগী কবিতা এই গ্রন্থগুলিতে বিস্তর আছে।" সুতরাং শিশু সাহিত্যের দিকেও যে ইহাদের লক্ষ্য ছিল, সে কথা বলা যাইতে পারে।

অবশ্য 'কথা ও কাহিনীর' পরিশোধ, হোরিখেলা বা অপমান বর প্রভৃতি নিশ্চয়ই শিশুদের যোগ্য নয়; কিন্তু শ্রেষ্ঠ ভিক্ষা, মানী, বন্দী-বীর, নগরলক্ষ্মী, বিচারক, নিষ্ফল উপহার, নকলগড়, পণরক্ষা, স্পর্শমণি,

পুরাতন ভৃত্য কিংবা দুই বিঘা জমিকে আমরা অবশ্যই শিশু-সাহিত্যের পর্য্যায়ভুক্ত করিতে পারি। আজও বাংলা দেশের শিশু-পাঠ্য গ্রন্থে এই সব কবিতা পরম সমাদরে আদৃত হইয়া থাকে। "বালকে"র পৃষ্ঠায় রবীন্দ্রনাথ যখন ইতিহাস আশ্রয় করিয়া বন্দা সিংহ, শূরতান সিংহ ও তেগ বাহাদুর প্রভৃতির কাহিনী গল্পচ্ছলে শুনাইতেছিলেন, তখনই ইহাদের অনেকগুলি কবিতা তাঁহার মনের মধ্যে অঙ্কুরিত হইয়াছিল এবং কাব্যাকারে ইহাদের বাণীবদ্ধ করিবার সময়েও 'বালকে'র পাঠক-পাঠিকাদেরই তিনি মনশ্চক্ষুর সম্মুখে রক্ষা করিয়াছিলেন।

জাতীয় আন্দোলনের প্রেরণায় দেশের কিশোরদের কণ্ঠে কণ্ঠে 'বন্দী বীরের' পংক্তিগুলি ধ্বনিত হইয়াছে :

"কাদের কণ্ঠে গগন মন্থে
নিবিড় নিশীথ টুটে—'
কাদের মশালে আকাশের ভালে
আগুন উঠেছে ফুটে।
পঞ্চনদীর তীরে
ভক্তদেহের রক্ত লহরী
মুক্ত হইল কিরে।
লক্ষ বক্ষ চিরে
ঝাঁকে ঝাঁকে প্রাণ পক্ষী সমান
ছুটে যেন নিজ নীড়ে
বীরগণ জননীরে
রক্ততিলক ললাটে পরালো
পঞ্চ নদীর তীরে।"

'কাণকা' আজ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্নপত্রে ভাব-সম্প্রসারণের আকর-গ্রন্থে পরিণত হইয়াছে। কিন্তু এই ছোট ছোট কবিতাগুলি নীতি

শিক্ষার উদ্দেশ্যে বালক-পাঠ্যরূপেই তাঁহার মনে কল্পিত হইয়াছিল। যেমন 'নূতন চাল' কবিতাটি ঃ

"একদিন গরজিয়া কহিল মহিষ
ঘোড়ার মতন মোর থাকিবে সহিস।
একেবারে ছাড়িয়াছি মহিষি চলন।
দুই-বেলা চাই মোর দলন-মলন।
এই ভাবে প্রতিদিন রজনী পোহালে
বিপরীত দাপাদাপি করে সে গোহালে।
প্রভু কহে চাই বটে, ভালো, তাই হোক
পশ্চাতে রাখিল তার দশজন লোক।
দুটো দিন না যাইতে কেঁদে কয় মোষ,
আর কাজ নাই প্রভু, হয়েছে সন্তোষ।
সহিসের হাত হতে দাও অব্যাহতি—
দলন-মলনটার বাড়াবাড়ি অতি।"

'কণিকা'য় গূঢ় তত্ত্বগর্ভ অনেকগুলি কবিতা থাকিলেও নীতি-কবিতা সংকলন হিসাবে এটিকেও আমরা শিশু-সাহিত্যের সন্নিহিত বলিয়াই মনে করি। শিশু মনের গ্রহণ-ক্ষমতা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ যে সাধারণ অপেক্ষা কিছুটা ভিন্নমত পোষণ করিতেন—'বালকে'র পৃষ্ঠাতেই আমরা তাহা দেখিয়াছি। শিশুদের সম্পর্কে কবির গভীর শ্রদ্ধা ছিল—তাই 'কণিকা'র সব কবিতা তাহারা না বুঝিলেও অন্ততঃ তাহাদের বুদ্ধি ও কল্পনা যে এগুলির সাহায্যে কিছুটা উদ্বুদ্ধ হইবে এ বিশ্বাস তিনি করিতেন।

উত্তর-জীবনে 'শিশু' সংকলিত হইয়াছে, 'শিশু ভোলানাথ', 'সে', 'খাপছাড়া', 'গল্প-স্বল্প' ইত্যাদি রচিত হইয়াছে। এগুলি আমাদের বর্তমান আলোচনার গণ্ডীর মধ্যে আসে না। কিন্তু নানাভাবে, বিচিত্র পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথ জীবনের শেষ দিনটি পর্য্যন্ত শিশুদের সহিত অন্তরের যোগসূত্রটি রক্ষা করিতে চাহিয়াছেন।

'শিশু' আরো পরিণতি পাইয়াছে 'শিশু ভোলানাথে'—অনেকগুলি উৎকৃষ্ট শিশু-কবিতা ইহার অন্তর্গত। খেয়ালী কল্পনার জাল বুনিয়াছেন 'সে'-র গল্পগুলিতে—ছড়ার ছন্দে হালকা তুলির টানে টানে 'খাপছাড়া' রচিত হইয়াছে।

শিশু এবং বয়স্কদের মধ্যে কোনো অনুকম্পার সীমারেখা রাখেন নাই বলিয়াই রবীন্দ্রনাথের বহু রচনা শিশু-সাহিত্যরূপে চিহ্নিত হইয়াও শিশুদের জন্য নয়। 'খেলা-ভোলার দিন' কিংবা 'রাজা ও রানী'র তির্যক ইঙ্গিত ছোটদের কতখানি মনোহরণ করিবে? 'খাপছাড়া'-র এই কবিতা কতখানি শিশুযোগ্য ?

"টেরিটি বাজারে তার সন্ধান পেনু
গোরা বোষ্টম বাবা নাম তার বেণু
শুদ্ধ নিয়মমতে মুরগিরে পালিয়া
গঙ্গা জলের যোগে রাঁধে তার কালিয়া—
মুখে জল আসে তার চরে যবে ধেনু।
বড়ি করি কৌটায় বেচে পদরেণু।"

আসলে ছোট এবং বড় এই দুইয়ে মিলিয়াই শিশু-জগৎ। রবীন্দ্রনাথের শিশু-গ্রন্থগুলির মধ্যে মায়ের মন, শিশুর ভাবনা এবং শিশুর ভাবনা সম্পর্কে বয়স্কের অনুভব—এই ত্রিধারা একসঙ্গে মিলিয়াছে। এইটি বুঝিতে পারিলেই রবীন্দ্রনাথের শিশু-সাহিত্য সম্বন্ধে আমাদের ধারণা সুস্পষ্ট হইবে। 'সে' গল্পগ্রন্থটিতে ইহা পরোক্ষভাবে বলিয়াই দেওয়া হইয়াছে। 'খাপছাড়া'র ভূমিকায় রাজশেখর বসুর উদ্দেশ্যে যে উৎসর্গ কবিতাটি তিনি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাহাতে বলিয়াছেন :

"যদি দেখ চপলতা
প্রলাপেতে সফলতা
ফলেছে জীবনে সেই ছেলেমিতে সিদ্ধের"—

তবে তাহাতে কবি হিসাবে তিনি লজ্জিত নন। চতুর্মুখ ব্রহ্মার

উপমা আনিয়া সকৌতুকে রবীন্দ্রনাথ জানাইয়াছেন, ব্রহ্মার তিনটি মুখে নানা গুরুতর বিষয় আলোচিত হয়, কিন্তু আরো যেটি অবশিষ্ট থাকে :

নিশ্চয়ই জেনো তবে
একটাতে হো হো রবে
পাগলামি বেড়া ভেঙে ওঠে উচ্ছ্বাসিয়া।

রবীন্দ্রনাথকে চতুর্মুখ ভাবিয়া তাঁহার ত্রিমুখে দেখি : কবি, দার্শনিক ও কথা-সাহিত্যিককে। কিন্তু চতুর্থ মুখে পাই তাঁহার অনন্য শিশু-সাহিত্য—মাতার হৃদয়োৎসারিত বাৎসল্য, পিতার স্নেহ-গম্ভীর উপদেশ এবং শিশুচিত্তের কলধ্বনি তাহাতে একই সঙ্গে বাজিয়া উঠিয়াছে।

॥ ২ ॥

উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

সখা হইতে মুকুল পর্য্যন্ত সমস্ত শিশুপাঠ্য পত্রিকায় উপেন্দ্রকিশোর অক্লান্তভাবে লেখনী চালনা করিয়াছেন—শেষের দিকে ছবিও আঁকিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। একমাত্র বালকেই তাঁহার রচনার সন্ধান পাই না—সম্ভবতঃ একটি বিশিষ্ট গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল বলিয়াই উপেন্দ্রকিশোর অভিজাত পত্রিকাটিতে আহূত হন নাই। কিন্তু উপেন্দ্রকিশোর বোধ হয় তৎকালে শিশুদের জন্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে রচনা করিয়াছেন—গল্প, নাটক, বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ, প্রসঙ্গ কথা—সর্ব্ববিষয়ে তাঁহার সমান কৃতিত্ব দেখা গিয়াছে। চমৎকার ছবি আঁকিতে পারিতেন—তাঁহার নিজের 'ছেলেদের রামায়ণে', প্রাগৈতিহাসিক কালের ভিত্তিতে রচিত বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ 'সেকালের কথা'য় অথবা তাঁহার শিশুচিত্তহারী অপরূপ 'টুনটুনির বই'তে তাহার নিদর্শন রহিয়াছে। ইহা ছাড়াও আরো বহু গ্রন্থে তাঁহার চিত্র-প্রতিভার সন্ধান মেলে।

পূর্ব্বের পত্রিকা-প্রসঙ্গ আলোচনায় দেখিয়াছি বহুদিন পর্য্যন্ত উপেন্দ্রকিশোর যেন নিজের যথার্থ স্থানটি খুঁজিয়া পান নাই—তিনি প্রায় "ফ্রি-ল্যানসার" ছিলেন। জীব-জন্তু কীট-পতঙ্গ লইয়া প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, ইংরাজী হইতে নানা ধরণের জিনিষ অনুবাদ করিয়াছেন, অন্ধদের ব্রেল-পদ্ধতির পরিচয় দিয়াছেন, ছায়াবাজী দেখাইয়া আমোদ করিবার উপায় চিত্রযোগে বুঝাইয়াছেন। এক কথায় উপেন্দ্রকিশোর সাময়িক পত্রের সর্ব্বপ্রকার ক্ষুধা মিটাইবার যোগান দিয়াছেন—কিন্তু তাঁহার নিজত্ব লইয়া আবির্ভূত হন নাই। সখার দ্বিতীয় বর্ষে 'সহজে কি বড়লোক হওয়া যায়' এই নাম দিয়া একটি উপন্যাসও ধরিয়াছিলেন, কিন্তু নিষ্ঠাভরে শেষ করেন নাই—নীতি উপদেশ দিয়াই লেখাটি সমাপ্ত করিয়াছিলেন।

সহজ সরল ভাষায় হাতে খড়ি তিনি প্রমদাচরণের কাছ হইতেই পাইয়াছিলেন; দীর্ঘ দিন ধরিয়া অক্লান্ত লেখার চর্চ্চার ফলে ছোটদের জন্য কেমন করিয়া লিখিতে হয় তাহা তিনি ঠিকই বুঝিয়াছিলেন; কিন্তু কী লিখিলে তাঁহার শ্রেষ্ঠ দান তাহাদের নিকট তুলিয়া দিতে পারিবেন সেইটিই তখন পর্যান্ত তাঁহার জানা ছিল না। অবশেষে উপেন্দ্রকিশোর নিজেকে আবিষ্কার করিলেন অন্ততঃ তুইখানি গ্রন্থের মধ্য দিয়া। একখানি তাঁহার 'ছেলেদের রামায়ণ', অপরখানি 'টুনটুনির বই'।

'ছেলেদের রামায়ণে' (১৮৯৬) ঝরঝরে ভাষায় গল্পটি সুন্দরভাবে পরিবেষণ করা হইয়াছে। স্বভাবসিদ্ধ কৌতুকের স্পর্শে লেখার মধ্যে একটি অতিরিক্ত স্বাদের সন্ধান মেলে। বইখানি দীর্ঘদিন ধরিয়া শিশু পাঠকদের মনোরঞ্জন করিয়া আসিয়াছে, আজও ইহার আকর্ষণ কমিয়া যায় নাই। তাঁহার 'অযোধ্যা কাণ্ড' হইতে কিছু উদ্ধৃত হইল :

'কৈকেয়ী বলিলেন, "আমার ভরত যেমন, রামও তেমন। রাম আমাকে যত মানে, ভরতও তত মানে না। রামই আমার রাজা হউক।"

এ সব কথা শুনিয়া মন্থরার আরো রাগ হইল। সে কৈকেয়ীকে কত যে বকিল, তাহা বলিবার নয়। আরো বলিল যে, "রামকে রাজা হইতে দিলে, রাম নানান্ ফন্দি করিয়া ভরতকে মারিয়া ফেলিবে।" কৈকেয়ীর মন আগে খুব ভাল ছিল কিন্তু ঐ তুষ্ট মন্থরার কথা শুনিয়া তাঁর মনেও হিংসা হইল। তখন তুজনে মিলিয়া যুক্তি করিতে বসিল, কিসে রামকে তাড়াইয়া ভরতকে রাজা করা যায়।'

কেবল ভাষাই নয়, বলিবার ভঙ্গীটির মধ্যেও শিশুর মনকে আকর্ষণ করিবার একটি স্বাভাবিক শক্তি আছে। ১৩০৪-এর বৈশাখ সংখ্যা 'সখা ও সাথীতে' বলা হইয়াছে—"ছেলেমেয়েদের উপযুক্ত এমন একখানি সুন্দর পুস্তক আমরা শীঘ্র দেখি নাই"। উপেন্দ্র-

কিশোরের অপূর্ব্ব "টুনটুনির বই" তখনো প্রকাশিত হয় নাই—১৯১০ সালে বইখানির আবির্ভাব ঘটিয়াছিল। কিন্তু ১৯০০ সালের মধ্যেই তাহার কয়েকটি গল্প 'মুকুলে'র পাতায় দেখা দিয়াছিল। বলিতে গেলে 'দুঃখারাম' গল্পটি দিয়াই শিশুদের কথা-সাহিত্যে উপেন্দ্রকিশোরের আবির্ভাব। গল্পটির ভাষা ও ভঙ্গি সম্পূর্ণ ভাবে শিশুদের উপযোগী :

'দুঃখীরাম ইহাতে নিতান্ত কৃতার্থ হইয়া বলিলেন, "বাপু সকল, তোমরা রাজা হও।"

সেই রাজসভায় রাজার সিংহাসন ছিল, দেখিতে দেখিতে সেখানে আরো হাজারটা সিংহাসন হইল। তারপর সকলেরই রাজার মতন বেশভূষা হইল, আর তাহারা এক একটা সিংহাসনে উঠিয়া বসিল।...

...এমন সময় মন্ত্রী মহাশয় আসিয়া উপস্থিত। তিনি এতগুলি রাজা একঠাঁই দেখিয়া একেবারে হতবুদ্ধি হইয়া গেলেন। যেদিক চান্ সেই দিকেই রাজা আর মন্ত্রী মহাশয় খালি দু'হাতে সেলাম করেন। সেদিন পেটে ভাত অল্পই পড়িয়াছিল, তাহাও হাজার রাজাকে সেলাম করিতে করিতে কখন হজম হইয়া গেল।"

উপেন্দ্রকিশোর তখন পর্য্যন্ত সরল সাধু ভাষাতেই লিখিতেন। কিছুদিন পরে তিনি কথ্যভাষা অবলম্বন করেন। মুকুলে প্রকাশিত রচনাকে "টুনটুনির বই"তে স্থান দিবার সময় কথ্য ভাষায় রূপান্তরিত করিয়া লইয়াছেন, গল্পের ধরণও খানিকটা বদলাইয়া গিয়াছে। উপেন্দ্রকিশোর নিজের স্বাভাবিক শক্তিতে ক্রমে ক্রমে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন।

সাংবাদিকের ভঙ্গিতে তিনি নানা বিষয়বস্তু লইয়া লিখিতেন, এ কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। কিন্তু এগুলি মধ্যেও তাঁহার কৃতিত্বের চিহ্ন সর্ব্বত্র বিরাজিত। উপেন্দ্রকিশোরের বহুমুখী অধ্যয়ন,—তাঁহার মনের সদাজাগ্রত কৌতূহল এবং কঠিন-গম্ভীর জিনিশ সরল ও

সরলভাবে পরিবেষণ করিবার ক্ষমতাও শিশু-সাহিত্যের ক্ষেত্রে তাঁহাকে স্মরণীয় করিয়া রাখিবে। ১৩০৫ সালের ভাদ্র সংখ্যা 'মুকুলে' তাঁহার 'ধূমকেতু'র আরম্ভ এইরূপ ঃ

"যাত্রার যেমন সং, আকাশে তেমনি ধূমকেতু। আকাশের গ্রহ-নক্ষত্রগুলির সকলেরই এক একটা নিয়মিত কাজ আছে; কিন্তু ধূমকেতুগুলিকে দেখিলে হঠাৎ মনে হইতে পারে, যে ইহাদের কোন বাঁধা কাজ নাই, খালি মাঝে মাঝে একবার লেজ পরিয়া আসিয়া, দিন কয়েক তামাসা দেখাইয়া যায়।

আমি দেখিয়াছি, যাত্রায় সং আসিলে, কোন কোন ছোট ছেলে ভঁ্যা করিয়া কাঁদিয়া ফেলে। ধূমকেতু দেখিলে কেহ কাঁদে কিনা জানি না। সেকালে অনেক লোকেরই বিশ্বাস ছিল, যে ধূমকেতু উঠিলে বড়ই ভয়ের কারণ হয়। হয় ভয়ানক মারিভয় হইবে, না হয় দুর্ভিক্ষ হইবে; আর কিছু না হইলেও অন্ততঃ একটা রাজা-টাজা কেহ মরিবে।"

এক জগদানন্দ রায় ছাড়া এমন সুন্দর ভাবে ছোটদের জন্য বিজ্ঞানের কথা আর কেহ তখন লিখিতে পারেন নাই।

ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যে উপেন্দ্রকিশোরের অধিক রচনা গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় নাই; কিন্তু এ পর্য্যন্ত যে কয়েকটি পত্র-পত্রিকার আলোচনা আমরা করিয়াছি, তাহা হইতে বোঝা যাইবে উপেন্দ্রকিশোরই সে যুগের সর্ব্বপ্রধান লেখক ছিলেন। প্রতিভার দিক হইতে বলিতেছি না, সে বিচার স্বতন্ত্র: কিন্তু বিভিন্নমুখী এত বিষয় লইয়া এমন অশ্রান্ত ভাবে শিশুদের উদ্দেশ্যে নিয়মিত লেখনী চালনা করিয়া যাওয়ার কৃতিত্ব আর কেহই রাখিতে পারেন নাই। বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ, ভৌগোলিক বৃত্তান্ত, মহৎ জীবনীর বর্ণনা, বিচিত্র বিদেশী কাহিনীর অনুবাদ, মৌলিক গল্প ও নাটিকা—সর্ব্বত্রই তিনি সমান সফলতা লাভ করিয়া গিয়াছেন।

॥ ৩ ॥

যোগীন্দ্রনাথ সরকার

বাঙালী শিশুর মনের কাছে যে লেখকটি সত্তর বৎসর ধরিয়া অম্লান মহিমায় বিরাজ করিতেছেন—তিনি যোগীন্দ্রনাথ সরকার। আজও বাঙালী অভিভাবকমাত্রেই শিশুর হাতে প্রথম ধরাইয়া দেন "হাসিখুসি"—"অ-য় অজগর আসছে তেড়ে" দিয়াই তাহার অক্ষর পরিচয় আরম্ভ হয়, "হারাধনের দশটি ছেলে"কে দিয়াই বাঙালীর ছেলে প্রথম সংখ্যা-রহস্য বুঝিতে আরম্ভ করে। "হাসিরাশি"র কৌতুক-স্নিগ্ধ কবিতাগুলি তো অক্ষয় হইয়া আছে; মাত্র শিশুরাই নয়, অনেক বৃদ্ধই তাহার অধিকাংশ কবিতা মুখস্থ বলিতে পারেন। ১৮৯০ সালে তাঁহার প্রথম বই "জ্ঞান-মুকুল" প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহার পর হইতে আজ সত্তর বৎসর পর্য্যন্ত তাঁহার জনপ্রিয়তা হ্রাস হওয়া দূরে থাক, উত্তরোত্তর যেন বাড়িয়াই চলিয়াছে। পাঁচ হইতে দশ বারো বৎসর পর্য্যন্ত ছেলেমেয়েদের মনোরাজ্যে যোগীন্দ্রনাথ একচ্ছত্র সম্রাট হইয়া বসিয়া আছেন। তাঁহার কবিতা ও ছড়া হইতে ব্যক্তির অধিকার লুপ্ত হইয়া গিয়াছে, এখন তাহা সমগ্র বাঙালী জাতির সম্পদে পরিণত হইয়াছে। মৌলিক রচনা ও সম্পাদনা-সংকলন ইত্যাদি ধরিয়া বর্ত্তমানে তাঁহার চুয়াল্লিশখানি বইয়ের সন্ধান পাইতেছি, পরম বিস্ময়ের সহিত বলিতে হয়, ইহাদের প্রায় সব কয়টিই এখন পর্য্যন্ত সমানে প্রচারিত হইয়া আসিতেছে। এত অধিক সংখ্যক গ্রন্থের এমন সুদীর্ঘকাল ধরিয়া অবিচ্ছিন্ন জনপ্রিয়তা,—বাংলা দেশের আর কোনো শিশু-সাহিত্যিকই এ সৌভাগ্য লাভ করিতে পারিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না।

যোগীন্দ্রনাথের কবি-জীবনের উন্মেষ দেখিতে পাই ১৮৮৬ সালে প্রকাশিত ভিখারীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় সংকলিত 'কবিতা-কণিকা'য়।

তখন তিনি নিতান্তই বালক। তাহার পর 'সাথী', 'সখা ও সাথী' পত্রিকায় তাঁহার ক্রমবিকাশ ঘটিতে থাকে এবং শিবনাথ শাস্ত্রীর 'মুকুল' তাঁহাকে সম্পূর্ণ পরিস্ফুট করিয়া তোলে।

প্রথম দিকে যোগীন্দ্রনাথ তৎকালীন প্রচলিত সংস্কার অনুযায়ী বিদ্যালয়-পাঠ্যতার দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই গ্রন্থ রচনার পরিকল্পনা করেন। আনুমানিক ১৮৯০ সালে প্রকাশিত হয় তাঁহার প্রথম গ্রন্থ **"জ্ঞানমুকুল"**। ১৮৯৩ সালে ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছিল। বইখানি বর্তমানে বিলুপ্ত, দেখিবার সৌভাগ্য ঘটে নাই। তবে মাঘ, ১৩০০ সানে 'সাথী' পত্রিকায় ইহার যে সমালোচনা দেখিতেছি, তাহা হইতেই ইহার উদ্দেশ্য ও উৎকর্ষের পরিচয় মিলিবে:

"গল্পচ্ছলে সুন্দর সুন্দর চিত্রের সাহায্যে, সকল বিষয় শিক্ষা দিতে পারিলে, শিক্ষা অতিশয় সহজ হয়, এবং তাহার ফলও আশানুরূপ হয়। জ্ঞানমুকুল পুস্তকখানির দ্বারা সেই উদ্দেশ্য সাধিত হইবে আশা করা যায়।......গ্রন্থকার সে বিষয়ের যত্নের ত্রুটি করেন নাই। সহজ ভাষায় গল্প, নানাবিধ নীতিকথা, বিজ্ঞানের কথা প্রভৃতি পুস্তকে লেখা হইয়াছে এবং বালক-বালিকার মনোরঞ্জনের জন্য অনেকগুলি অতি সুন্দর চিত্রও দেওয়া হইয়াছে। বালক-বালিকারা ইহাতে শিক্ষা ও আমোদ উভয়ই পাইবে।"

"জ্ঞানমুকুল" সমাদৃত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। তবে এ জাতীয় অনেকগুলি বই-ই তখন বাজারে চলিতেছিল বলিয়া ইহাতে যোগীন্দ্রনাথ তৃপ্তিলাভ করেন নাই। "গৃহপাঠ্য ও পুরস্কার প্রদান যোগ্য সচিত্র" বাংলা পুস্তকের অভাব দেখিয়া তিনি ইহার পরেই তাঁহার সুপরিচিত **'হাসি ও খেলা'** (জানুয়ারী ১৮৯১) প্রণয়ন করেন। নিজের রচনা ছাড়াও ইহাতে তিনি প্রমদাচরণ সেন, উপেন্দ্রকিশোর, নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য, রাজকৃষ্ণ রায় এবং যোগীন্দ্রনাথ বসুর কয়েকটি লেখার সংকলন করিয়াছিলেন। যোগীন্দ্রনাথের বিশিষ্ট শিশু-

সাহিত্যের সূত্রপাতও এই বইখানি হইতেই। ছড়ায়, সহজ গল্পে, সাত ভাই চম্পার কাহিনীতে আর প্রচুর চিত্রের সন্নিবেশে বইখানি শিশুদের মন তৎক্ষণাৎ হরণ করিয়া লইয়াছিল।

"সাথী" (মাঘ, ১৩০০) ইহার সমালোচনা প্রসঙ্গে বলিতেছেন ঃ "একখানি নূতন ধরণের গৃহপাঠ্য পুস্তক। বালক বালিকাদের শিক্ষা ও মনোরঞ্জনের জন্য ইংরাজীতে অনেক পুস্তক আছে, কিন্তু বাংলায় তাহার যথেষ্ট অভাব। সে অভাব দূর করিবার জন্য যোগীন্দ্রবাবু যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়াছেন। পুস্তকখানির লেখা, ছাপা, ছবি ও বাঁধাই অতি সুন্দর হইয়াছে। পুস্তকখানি যে বালক-বালিকাদের মনোরঞ্জন করিতে সমর্থ হইবে তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।"

নীতি উপদেশের প্রত্যেক্ষ প্রভাব হইতেই মুক্ত, নয়নমনলোভন এই বইখানিই শিশু-সাহিত্যের যেন স্বাধীনতা আনিয়া দিল। ইহার সাফল্যের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া ক্রমে প্রকাশিত হইল **রাঙাছবি** (১৮৯৬), **হাসিখুসি,** (১৮৯৭) এবং **খেলার সাথী** (১৮৯৮)। ইহা ছাড়াও **খুকুমণির ছড়া** (১৮৯৯) নামে বাংলা দেশের ছড়ার একটি সযত্ন সংকলনও তিনি প্রকাশ করেন।

যোগীন্দ্রনাথের এই বইগুলির পরিচয় দিবার কোনো প্রয়োজন নাই—শিশুদের অপরিহার্য্য সঙ্গী হইয়া বাঙালীর ঘরে ঘরে ইহারা অবস্থান করিতেছে।

যোগীন্দ্রনাথের রচনায় লেখকের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য বলিতে এমন কিছুই নাই। ইহারা সরল এবং সহজ। এত সহজ, যে মনে হয় এগুলির মধ্যে লেখকের অস্তিত্বই নাই ; শিশুর হাসি—মায়ের সোহাগ, গৃহপালিত মিনি বেড়াল ও ভুলো কুকুর, খাঁচার টিয়া পাখী, ইহারা আপনা-আপনিই এগুলির মধ্যে ফুটিয়া উঠিয়াছে—লেখককে যেন কিছুই করিতে হয় নাই। যোগীন্দ্রনাথের ছড়া কখন যে বাঙালী মায়ের মুখে আসিয়া স্থান করিয়া নিয়াছে, কখন যে 'বনের দুষ্টু শিয়াল শিবু' আমাদের চিরপরিচিত হইয়া গিয়াছে, কখন যে টুনী পাখীর গল্পটি

তাহার অবিকৃত ভাষাটি পর্য্যন্ত লইয়া সন্ধ্যাবেলার গল্পের আসরে ঢুকিয়া পড়িয়াছে—তাহা যেন কেহ অনুভবও করিতে পারে নাই। যোগীন্দ্রনাথকে গ্রহণ করিতে হয় নাই—তিনি আমাদের মধ্যে সঞ্চারিত হইয়া গিয়াছেন। ইহার জন্যই তাঁহার শিশু-সাহিত্য অমর হইয়া বাঙালীর ঘরে বিরাজ করিতেছে। রবীন্দ্রনাথ দুঃখ করিয়া বলিয়াছেন :

"সহজ কথায় লিখতে আমায় কহ যে—
সহজ কথা যায় না লেখা সহজে!"

এই দুরূহ কাজটি যোগীন্দ্রনাথ অন্ততঃ সম্ভব করিয়াছিলেন।

অনেকগুলি বইয়ের ছবি দেখিয়া বোঝা যায় সেগুলি বিদেশী। নানা বিদেশী ছবি অবলম্বন করিয়া ছোট ছোট গল্প কবিতা লেখার রেওয়াজ 'বালকবন্ধু' হইতে 'মুকুল' পর্য্যন্ত সমস্ত পত্র-পত্রিকাতেই দেখিতে পাই। এক মুকুলের পাতা খুলিলেই তাহার প্রচুর দৃষ্টান্ত মিলিবে। যোগীন্দ্রনাথ তাঁহার বইগুলিতে এই সব ছবি লইয়াছেন, তাহার সহিত নিজের রচনা জুড়িয়া দিয়াছেন। ফল ইহাই হইয়াছে যে লেখায় ও ছবিতে আশ্চর্য্য জোড় বাঁধিয়াছে—একটিকে ছাড়িয়া অন্যটিকে ভাবিবার পর্য্যন্ত উপায় নাই। যেমন মুকুল প্রথম বৎসরের ভাদ্র সংখ্যায় 'শিয়ালের যুক্তি' নামে শিবনাথ শাস্ত্রীর যে গল্পটি বাহির হইয়াছে, "রাঙাছবি"র "দুষ্টু শিবু" কবিতায় তাহার ছবিটিই দেওয়া হইয়াছে। অথচ ছবিটি আজ যোগীন্দ্রনাথের কবিতারই অচ্ছেদ্য অঙ্গ—উহার উপর আর কাহারও অধিকার নাই।

পাঁচ হইতে দশ বৎসর পর্য্যন্ত শিশুদের জন্য সাহিত্য-সৃষ্টিতে যোগীন্দ্রনাথ আজও অপ্রতিদ্বন্দ্বী। বলিতে গেলে এই বিশেষ বয়সের জন্য বিশিষ্ট শিশু সাহিত্য রচনার তিনি পথিনির্দ্দেশক। সত্তর বৎসর ধরিয়া যে জনপ্রিয়তা তাঁহার বইগুলি ভোগ করিয়া আসিতেছে আরো বহু বৎসর ধরিয়া সেই প্রীতি তাহারা লাভ করিয়া চলিবে, ইহাতে সম্ভবতঃ সংশয় নাই।

॥ ৪ ॥

নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

"গোকুলে মধু ফুরায়ে গেল আঁধার আজি কুঞ্জবনের" কবি নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য বাংলা সাহিত্যে সুপরিচিত। উচ্চ শ্রেণীর কবি হিসাবেই নবকৃষ্ণ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন—কিন্তু শিশু-সাহিত্যও তাঁহার দানে বিশেষ ভাবে সমৃদ্ধ হইয়াছে। তাঁহার বহু কবিতা আজও শিশুপাঠ্য গ্রন্থকে অলঙ্কৃত করে তাঁহার 'টুকটুকে রামায়ণ' (১৯১০) এদিক হইতে একটি বিশিষ্ট সৃষ্টি বলিয়া চিহ্নিত হইতে পারে।

শিশু-সাহিত্যের সহিত তাঁহার যোগ "সখা" পত্রিকা হইতেই। পত্রিকাটির শেষ চারি বৎসর বস্তুতঃ তিনিই সম্পাদনা করিয়াছিলেন—পূর্ব্বেই সে কথা বলিয়াছি। সখার পাতাতেই 'মজার পড়া' কবিতায় তাঁহার নিজস্ব বক্তব্যটি ফুটিয়া উঠিয়াছে ঃ

"খেলার সময় দৌড়ে খেল, বারণ তাতে নাই।
চলতে গিয়ে পড়বে ট'লে, দেখতে নাহি চাই ॥
বরং তুমি পড়তে যদি ভালবাস বড়,
বই নে এস, কাছে ব'স 'দশ রস' পড় ॥
নূতন পড়া পড়বে যদি, মাসিমাকে ডেকে,
গড়গড়িয়ে দেখাও প'ড়ে, 'বড় গাছ'টা থেকে ॥"

(মার্চ্চ—১৮৮৭)

যোগীন্দ্রনাথের মতো নবকৃষ্ণেরও পূর্ণশক্তির বিকাশ ঘটিয়াছে 'মুকুলে' আসিয়া। যোগীন্দ্রনাথের মতোই তিনি এই পত্রিকায় প্রচুর কবিতা লিখিয়াছেন। একটি বিশিষ্ট কবি মনের পরিচয় তাঁহার রচনাগুলির মধ্যে পরিস্ফুট। যোগীন্দ্রনাথের ন্যায় তাঁহার লেখায় লেখকের আত্ম-বিলুপ্তি ঘটে নাই, স্বাতন্ত্র্যের স্বাক্ষরে তাহা উজ্জ্বল হইয়া ফুটিয়াছে।

মূলতঃ তিনি যে উচ্চ পর্য্যায়ের কবি, তাঁহার রচনায় সে কথা কোথাও গোপন থাকে নাই।

"বাঙ্গালির ছবি" তাঁহার প্রথম বই। রচনার শেষে তারিখঃ ১লা আশ্বিন, শক ১৮০৭। ছদ্ম নামে লেখাঃ "শ্রীযুক্ত আমার অঙ্কিত"। বারো পাতার নক্‌সা জাতীয় চটি বইটি খণ্ড কাব্য। বিষয়বস্তু বাঙালীর শারদীয় দুর্গোৎসব। সকৌতুক ভঙ্গিতে বাঙালীর ঘরে পূজার আমোদ-প্রমোদের বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে। 'সাহিত্য-সাধক চরিতমালায়' ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ইহাকে "শিশুপাঠ্য কবিতাসমষ্টি" বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু তথ্যটি ভুল। ইহা সম্পূর্ণ কাব্য, কবিতাসমষ্টি নয় এবং শিশুপাঠ্যও নয়। তবে বইটি ছড়ার ঢংয়ে লেখা, ইহার কিছু কিছু অংশ সংশোধিত আকারে নবকৃষ্ণের পরবর্ত্তী শিশু-গ্রন্থ "রং-চং"-এ স্থান পাইয়াছে। বইখানির নানা জায়গা হইতে ছোটরাও কিছু আনন্দ পাইতে পারেঃ

"বর্ষা গেলো আকাশ ধু'য়ে ফর্সা হ'লো দিক।
কেঁদে কেটে, হেসে ধরা উঠ্‌লো যেন ঠিক॥
দুখটি ঘুচে গেলো দেখে বুক্‌টি সুখে ভরা।
সুনীল-গগন আর্সি নিয়ে মুখ্‌টি দেখে ধরা॥
ভোরের বেলা কিরণ-মালা হাস্‌লে আকাশ-গায়
ফুলের সনে ফুটিয়ে ওঠে, পাখীর সনে গায়—"

(১ম পৃষ্ঠা)

ইহার পর প্রকাশিত হয় তাঁহার **"শিশুরঞ্জন রামায়ণ"** (২৬শে পৌষ, শক ১৮১২, জানুয়ারী ১৮৯১)। বিজ্ঞাপনে লেখক জানাইয়াছেনঃ "এ দেশের বালক-বালিকাগণ সকলেই রামায়ণের গল্প শুনিতে ভালবাসে। রামায়ণের ইতিহাস যেরূপ মনোহর, নীতিও সেইরূপ প্রীতিকর। এই নিমিত্ত ইহার স্থূল বিবরণটি লইয়া এই ক্ষুদ্র কবিতা পুস্তকখানি লিখিত হইল।"

বইখানিকে স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র অভিনন্দন জানাইয়া লিখিয়াছিলেনঃ

"এখনকার শিশুরা রুশিয়ার পিটর বা স্পেনের দ্বিতীয় ফিলিপের ইতিহাস বেশ জানে, কিন্তু দশরথ বা জনক রাজার নাম শুনিলে আকাশ হইতে পড়ে। যাহারা বিদ্যালয়ের পুস্তক নির্ব্বাচন করেন, তাঁহারা তাহাতে ক্ষতিবোধ করেন না। না করুন, কিন্তু রামায়ণে যে উচ্চনীতি আছে, তাহার শিক্ষায় যে বালকেরা বঞ্চিত হয়, ইহা দুঃখের বিষয় বটে। ভরসা করি, তোমার ক্ষুদ্র গ্রন্থ হইতে সে অভাব মোচন হইবে।"

বইখানি যে স্কুলপাঠ্য হইয়াছিল এবং গৃহে গৃহে অভ্যর্থনা লাভ করিয়াছিল, তাহার প্রমাণ ১৮৯৪ সালে ইহার চতুর্থ সংস্করণের আবির্ভাব। সহজ ভাষায় অথচ প্রয়োজনমত সংস্কৃত শব্দ ব্যবহারে লেখক ইহাতে সুন্দর গাম্ভীর্য্য আনিয়া অতি ক্ষুদ্র আয়তনের মধ্যে রামায়ণের কাহিনীটি উপস্থিত করিয়াছেন। কৃত্তিবাসের সহিত ঐতিহ্যগত সংযোগ রাখিয়া পয়ার ও ত্রিপদীই ইহাতে ব্যবহৃত হইয়াছে। পরে লেখক ভাষা আরো কিছু সরল করিয়াছিলেন। আমরা প্রথম সংস্করণ হইতে কয়েক পংক্তি উদ্ধার করিলাম :

"দুর্জ্জয় ভার্গববীর হলে পরাজিত।
রামের বীরত্বে সবে হ'ল চমকিত॥
ল'য়ে চারিপুত্র আর পুত্রবধূগণ।
অযোধ্যায় দশরথ দিলা দরশন॥
অযোধ্যার রাজভক্ত সুখী প্রজা সব।
আরম্ভিলা ঘরে ঘরে আনন্দ উৎসব।
সুন্দর সরযূতীরে অযোধ্যা নগর।
পূর্ণকুম্ভ আম্রসারে শোভিল সুন্দর।" (পৃঃ ১১-১২)

১৯১০ সালে শিশুদের আবৃত্তিযোগ্য নানা সরস ও সুন্দর ছন্দে তাঁহার শিশু-সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ দান—"টুকটুকে রামায়ণ" প্রকাশিত হয়। কিন্তু ইহার সূচনা এই "শিশুরঞ্জন রামায়ণে"ই প্রথম ঘটিয়াছিল।

১৩০৫ সালে তাঁহার **"ছেলেখেলা"** প্রকাশিত হয়। লেখক হিসাবে তিনি যোগীন্দ্রনাথেরই সমকালীন—লেখায় দুইজনের মধ্যে সাদৃশ্যও কিছু আছে, কিন্তু যে কথা বলিয়াছি, কবি নবকৃষ্ণ তাঁহার লেখায় একটা নিজত্বের স্পষ্ট চিহ্ন রাখিয়াছেন। যোগীন্দ্রনাথের মতো তিনি অতি সরল নন, ভাষায় মুন্সীয়ানা আছে, কল্পনার তির্য্যকতাও লক্ষ্য করিতে পারা যায়। 'ছেলেখেলা' সুপরিচিত গ্রন্থ, তবু ইহা হইতে দুই একটি নিদর্শন দিলাম।

"উত্তর থেকে বইছে বাতাস শীত মাখান তায়।
ঠোঁট কাঁপ্‌চে বুক কাঁপ্‌চে, দিচ্ছে কাঁটা গায়॥
গায়ে গরম হাত দে, মামা চেপে ধর-না।
সূর্য্যিমামা, সূর্য্যিমামা রোদ কর-না॥

সূর্য্যিমামা সূর্য্যিমামা রোদ কর-না।
ভাগ্‌নে তোমার শীতে মরে, কোলে কর-না॥
শিশির জলে ভিজে গেছে বনে ফুলের কলি।
শীতে আকুল, কাঁপচে বনের ছোট পাখীগুলি॥
গায়ে গায়ে শুয়ে আছে ছাগলছানা দুটি।
রোদ উঠলে চরতে তবে যাবে গুটি গুটি॥" (সূর্য্যিমামা)

ইহার মধ্যে কবি মনের ঝঙ্কার অনুভব করা যায়—একটি স্বতন্ত্র ব্যঞ্জনার সন্ধান মেলে। লঘু রচনাতেও তাঁহার সুন্দর হাত খুলিত:

"যার যা মনে যুক্তি এলো বল্লে তখন তা,
কিন্তু তাতে সব ইঁদুরের হলো না এক রা।
চশমা চোখে একটি ইঁদুর বল্লে তখন উঠে,
'কুনোর গলায় ঘণ্টা বাঁধো গোলটি যাবে মিটে।
নড়লেই টুং-টাং-টুং উঠবে বেজে বুকে,
শুনলেই তা সুরুৎ করে পড়বো খালে ঢুকে।"
(ইঁদুরের পরামর্শ)

আধুনিক বাংলা শিশু-সাহিত্য যাঁহাদের হাতে গড়িয়া উঠিয়াছে, নবকৃষ্ণ নিঃসন্দেহে তাঁহাদেরই একজন। যোগীন্দ্রনাথ সরকারের পাশাপাশিই তাঁহাকে আমরা তাঁহাকে শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করিব।

প্রমদাচরণ সেন

"সখা" প্রসঙ্গে প্রমদাচরণ সেনের **সম্বন্ধে** কিছু আলোচনা আমরা করিয়াছি। এই চিরদরিদ্র ও চিরনির্ভীক, আদর্শবাদী মানুষটি তাঁহার জীবনের সূচনা পর্ব্বেই পরম শোকাবহ অকাল-মৃত্যুর মধ্যে হারাইয়া গিয়াছেন। সুতরাং বাংলার শিশু-সাহিত্য বলিতে গেলে তাঁহার নিকট হইতে কিছুই পায় নাই। সখার পাতায় তাঁহার প্রবন্ধ, কবিতা, গল্প, ইত্যাদি প্রচুর ছড়াইয়া আছে, সেগুলিরও কোনো উপযুক্ত সংকলন হয় নাই। তাহা সত্ত্বেও শিশু-পত্রিকা এবং শিশু-সাহিত্যের জন্য তিনিই যে সর্ব্বপ্রথম একটি পরিপূর্ণ আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছিলেন, সে কথা কিছুতেই ভুলিয়া যাইবার নয়।

প্রমদাচরণের মাত্র তিন খানি বই প্রকাশিত হইয়াছিল। **'মহৎ জীবনের আখ্যায়িকাবলী'** (প্রথম খণ্ড ১২৮৯ সাল), **'চিন্তাশতক'** (১২৯১) এবং **'সাথী'**। প্রথম দুইখানি প্রকাশ করিয়াছিলেন সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ। 'সাথী'র সন্ধান পাই নাই।

"মহৎজীবনের আখ্যায়িকাবলী"(Anecdotes from Eminent Lives) দুইখণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছিল এবং সচিত্রও ছিল। একটি ভাগ থিওডোর পার্কার, অপরটি ভগিনী ডোরা। লেখা দুইটি 'তত্ত্ব-কৌমুদী' ও 'বামাবোধিনী' হইতে পুনর্মুদ্রিত। চরম দারিদ্র্যের মধ্যেও লেখক ঘোষণা করিয়াছেন : "এই গ্রন্থলব্ধ উপস্বত্বের কিয়দংশ কোনরূপ দেশহিতকব অনুষ্ঠানে ব্যয়িত হইবে।"

রচনা শুচিতা ও আন্তরিকতায় উজ্জ্বল—তরুণ পাঠকদের হাতে সযত্নে উপহার দিবার মতো বই। শ্রদ্ধেয় জনের জীবনচরিত রচনার সম্পূর্ণ উপযোগী আদর্শ ভাষা। সামান্য তুলিয়া দিলাম :

"কিন্তু কোন্ এক নির্জ্জন স্থানে কোন্ পুষ্পটি প্রস্ফুটিত হইয়াছে, গন্ধে চারিদিক আমোদিত হইতেছে—পৃথিবী অনুসন্ধান করিতেছে না; তাহার অস্তিত্বেরও সংবাদ কেহ লয় না। প্রায় তিন বৎসর গত হইল ইংলণ্ডের অন্তর্গত স্ট্যাফোর্ড প্রদেশে একজন ভদ্রমহিলা রোগশয্যায় শয়ান ছিলেন। তাঁহার অধিকদিন বাঁচিবার কোন আশা ছিল না, তথাপি তাঁহার প্রশান্ত মুখমণ্ডলে কিছুমাত্র ক্লেশের বা ভয়ের চিহ্ন লক্ষিত হয় নাই। তিনি কে যে, প্রাতঃসূর্য্য সমুদিত হইতে না হইতে তাঁহাকে দেখিবার জন্য আবালবৃদ্ধবণিতা ছুটিয়া আসিত এবং তিনি কেমন আছেন জানিতে পারিলে পরম কৃতার্থ হইত?" (ভগিনী ডোরা।)

সাধারণ ব্রহ্মসমাজের পুস্তক প্রচার বিভাগ হইতে প্রকাশিত ছোট বই **"চিন্তাশতকে"** লেখকের নাম নাই। ১৮৮৫ সালে 'সখা'য় শিবনাথ শাস্ত্রী প্রমদাচরণের উপরে যে প্রবন্ধ লিখিয়াছেন এবং প্রমদাচণের যে ছোট জীবনীটি প্রকাশিত হইয়াছিল তাহা হইতেই জানিতে পারি, প্রমদাচরণই ইহার লেখক। ইহাতে একশোটি ছোট ছোট প্রসঙ্গ বিবৃত হইয়াছে। ব্রাহ্ম-সমাজভুক্তদের উদ্দেশ্যে এবং সাধারণ ভাবে কিছু নীতি শিক্ষা দিবার প্রেরণাতেই বইখানি রচিত। ইহাতে প্রমদাচরণের ধার্ম্মিকতা এবং চিত্তের শুচিতা প্রকাশিত হইয়াছে। বালকদের লক্ষ্য করিয়া বইখানি লেখা হয় নাই, ইহার সমস্ত প্রসঙ্গ যে তাহাদের বোধগম্য হইবে তা-ও নয়; কিন্তু সৎচিন্তা ও চরিত্র-গঠনের আদর্শের দিকে লক্ষ্য রাখিলে "চিন্তাশতক" স্বচ্ছন্দেই তাহাদের হাতে তুলিয়া দেওয়া যায়।

চিন্তাশতক হইতে একটি সুন্দর প্রসঙ্গ এইরূপ :

২৬শ। সূর্য্য আকাশে উদিত হইল। কেবল গুটিকতক ফুলকে প্রস্ফুটিত করিতে অথবা কয়েকটি বৃক্ষকে সজীব করিতে নহে, বস্তুতঃ সমস্ত পৃথিবীর আনন্দ বিধান করিতেই সূর্য্য উদিত হইল। দেবদারু আপনার উচ্চ মস্তক নাড়িয়া বলিল, 'সূর্য্য, তুমি আমারই"। মৃত্তিকার

উপরি ভাগে প্রস্ফুটিত বন্যফুল, ঈষৎ হাসিয়া, মৃদুগন্ধ বিস্তার করিয়া বলিল, 'সূর্য্য, তুমি আমারই'। এবং সহস্র ক্ষেত্র মধ্য হইতে শস্যরাজি প্রাতঃসমীরণে কম্পিত হইয়া এক তানে বলিয়া উঠিল, 'সূর্য্য তুমি আমারই'।

ঈশ্বরও তেমনি, ধর্ম্মজগতের গুটীকতক মহাপুরুষের জন্য নয়, পরন্তু সমস্ত জীবন হইয়া বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে পরিপূর্ণ করিয়া রহিয়াছেন। এই পৃথ্বীতলে এমন ক্ষুদ্র, এমন নীচ জীব নাই, যে বালকের নির্ভরের সহিত মুখ তুলিয়া বলিতে পারে না, 'পরম পিতা তুমি আমারই।'

রবীন্দ্রনাথের 'কণিকা'র এই কবিতাটি ইহার দ্বারাই প্রভাবিত কিনা কে বলিবে ঃ

উদার চরিতাণাম

প্রাচীরের ছিদ্রে এক নাম-গোত্রহীন
ফুটিয়াছে ছোট ফুল অতিশয় দীন।
ধিক ধিক করে তারে কাননে সবাই—
সূর্য্য উঠে বলে তারে ভালো আছ ভাই?

'চিন্তাশতক' পড়িতে বসিয়া শেখ সাদীর বুস্তাঁর কথা মনে পড়িয়া যায়। ভাবের গভীরতা আর আন্তরিকতার দিক দিয়া এই সাধক কবির সহিত প্রমদাচরণের মিল আছে। বিকশিত হইবার আগেই প্রমদাচরণ ঝরিয়া গিয়াছেন—সে ক্ষতির বেদনা কেবল আমাদের শিশু-সাহিত্যেরই নয়, সমগ্র বাংলা-সাহিত্যেরও বটে।

॥ ৬ ॥

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

"নন্দন-নিকুঞ্জ বনে রঞ্জনার ধারা
জন্ম আগে তাহার জলে তোমার স্নান সারা।
অঞ্জন সে কী অভিনব
লাগায়ে দিল নয়নে তব
সৃষ্টিকরা দৃষ্টি তাই পেয়েছে আঁখিতারা।"

এই আশীর্ব্বাণী রবীন্দ্রনাথ দিয়াছিলেন শিল্পাচার্য্য নন্দলাল বসুকে। কিন্তু শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথ সম্বন্ধেও আমরা ইহারই পুনরুক্তি করিতে পারি। যথার্থই নন্দন বন হইতে রঞ্জনায় স্নান করিয়া অবনীন্দ্রনাথ আসিয়াছিলেন। রূপ-সৃষ্টির মায়াকাজল চোখে পরিয়া লেখায় ও রেখায় তাঁহার সৃষ্টিকে তিনি অমর করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন।

ভারতীয় চিত্রশিল্পের নবজাগরণ ঘটাইয়াছেন অবনীন্দ্রনাথ— অরিয়েণ্টাল আর্টকে তুলিয়া ধরিয়াছেন পৃথিবীর সম্মুখে, নন্দিত হইয়াছেন শিল্পগুরু নামে। চিত্রকলার ক্ষেত্রে তিনি যুগস্রষ্টা। শিশু-সাহিত্যের ক্ষেত্রেও তিনি এক আশ্চর্য্য ব্যক্তিত্ব। তাঁহার নিপুণ তুলির রেখায় রেখায়, সংযত বর্ণের বিন্যাসে ও কল্পনার মৌলিকতায় যেমন অভিনব রসলোক রচিত হইয়াছে, অনুরূপভাবে শিশু-সাহিত্যেও কলমের মুখে তিনি যে ছবি আঁকিয়াছেন সে ছবির কোন তুলনা নাই। অবনীন্দ্রনাথের শিশু-সাহিত্য বাংলা দেশের জল-মাটি-আকাশকে বিচিত্র বর্ণে প্রকাশ করিয়াছে, এ দেশের প্রতিটি ধ্বনি তাঁহার মনে সুর জাগাইয়াছে—রূপকথার স্বপ্নলোকের সহিত বাস্তবের মিলন ঘটাইয়াছে।

"আপন কথা"র ভূমিকায় অবনীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, "আমার ভাব ছোট ছেলেদের সঙ্গে—তাদেরই দিলাম এই লেখার খাতা।······ যারা শুধু শুনতে চায় আপন কথা, থেকে থেকে যারা কাছে এসে বলে, 'গল্প বলো।' সেই শিশুর জগতের সত্যিকারের রাজা রাণী, বাদ্‌শা বেগম তাদেরই জন্যে আমার এই লেখা পাতা ক'খানা।"

'আপন কথাই' বটে। শিশুর মনের কথা—তাহাদের জগতের 'সত্যিকার' পরিচয় এমন আর কার লেখায় ফুটিয়াছে! বুড়ো আংলায় সকৌতুকে নিজের পরিচয় দিয়াছেন—"কোন্ ঠাকুর ? ওবিন ঠাকুর—ছবি লেখে।" ছবিই লিখিয়াছেন তিনি—লিখিতে লিখিতে ছবি আঁকিয়াছেন। জোড়াসাঁকোর বাড়ীর দক্ষিণের বারান্দায় বসিয়া—'কাটুম-কুটুম' গড়িয়াছেন আর শিশুর চোখে শিল্পীর মায়াঞ্জন মাখিয়া লিখিয়াছেন, "ক্ষীরের পুতুল", "বুড়ো আংলা", "খাতাঞ্চির খাতা" ; "ভূতপত্রীর দেশে।"

এই মন আর কল্পনা না থাকিলে যাত্রার অর্কেষ্ট্রার মধ্য হইতে এমন গান কে আবিষ্কার করিতে পারিত ?

"পালকের বগ দেখানো, বালকের মাথার টুপি,
মোগলের কেষ্টচূড়ো দু গালে রোঁয়ার থুপি।
শ্রীরাধার অধিক শোভা গোঁফের আড়ে ঝুটোমোতি,
সখীদের মনোলোভা—মোজার উপর পীতো-ধোটি।"

(খাতাঞ্চির-খাতা)

অবনীন্দ্রনাথের শিশু-সাহিত্য কেবল বাংলা দেশেরই গৌরব বৃদ্ধি করে নাই, তাঁহার মতো একজন লেখককে পাইলে পৃথিবীর যে কোনো দেশই ধন্য হইত। কয়েকটি বইয়ের কাহিনী পরিকল্পনা তাঁহার নিজস্ব নয়—যেমন 'বুড়ো আংলা' লইয়াছেন সেল্‌মা লাগেরলফের' "Adventures of Nils" হইতে, 'খাতাঞ্চার খাতা' ব্যারীর "Peter Pan" দ্বারা স্পষ্ট প্রভাবিত। কিন্তু এগুলিকে বাংলাদেশের প্রাণরসে অভিষিক্ত করিয়া সম্পূর্ণ নতুন ভাবে তিনি

গড়িয়া তুলিয়াছেন, Tom Thumb-এর বিদেশী কাঠামোটির ওপর বাঙালী কুম্ভকার বাংলার মাটি ও রং দিয়া সাজাইয়া দিয়াছেন।

অবনীন্দ্রনাথ জানাইয়াছেন, জ্ঞানদানন্দিনীর 'বালক' এবং তৎকালীন ঠাকুর বাড়ীর পরিবেশ তাঁহার লেখকসত্তাকে প্রথম জাগাইয়া তুলিয়াছিল, কিন্তু তখনও 'বালকের' পাতায় তিনি প্রবেশ করেন নাই। তাঁহার লেখকরূপে আত্মপ্রকাশ ঘটিল একেবারে উনিশ শতকের শেষের দিকে আসিয়া। 'শকুন্তলা' প্রকাশিত হইল ১৩০২ সালে, 'ক্ষীরের পুতুল' দেখা দিল ১৩০৩-এ। ঠাকুর বাড়ীর সাহিত্য-তীর্থেই অবনীন্দ্রনাথের দীক্ষা হইয়াছিল একথা সত্য—কিন্তু নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে অচিরাৎ তিনি সকলকে ছাপাইয়া উঠিয়াছিলেন।

মাত্র ২৯ পৃষ্ঠার ছোট বই 'শকুন্তলা' (বর্ত্তমান সিগনেট সংস্করণে ছবি-ছাপার সৌকর্য্যে পত্রসংখ্যা বাড়িয়াছে) কী সৌন্দর্য্য লইয়া যে দেখা দিয়াছিল তাহা বলিবার নয়। সেকালে এমন ভাষা লিখিবার শক্তিই আর কাহারো ছিল না। একমাত্র রবীন্দ্রনাথ হয়তো পারিতেন —কিন্তু ছবির রঙের সঙ্গে রেখার এমন মেল-বন্ধন তিনিও ঘটাইতে পারিতেন কিনা সন্দেহ। লেখকের নিজের আঁকা ছবি ইহাকে সমৃদ্ধ করিয়াছিল, ইণ্ডিয়ান আর্ট কটেজ হইতে বিশেষ যত্নে প্রস্তর ফলকে ইহার প্রথম সংস্করণ ছাপিয়াছিলেন দেবেন্দ্রনাথ ধর।

মহাকবি কালিদাসের 'শকুন্তলা' নাটককেই লেখক আখ্যান-বস্তুরূপে নির্ব্বাচন করিয়াছেন, কিন্তু প্রেমোপজীবী অমর নাটক-খানিকে তিনি রূপকথায় পরিণত করিয়া দিয়াছেন।

মহর্ষি কণ্বের আশ্রমে বর্ণনা এই :

"বনে বনে হোমের কাঠ কুড়িয়ে বেড়াত, কালো গাই ধ'লো গাই মাঠে চরাতে যেত। সবুজ মাঠ ছিল তা'তে গাই বাছুর চরে বেড়াত, বনে ছায়া ছিল তা'তে রাখাল ঋষিরা খেলে বেড়াত। তা'দের ঘর গড়বার বালি ছিল, ময়ুর গড়বার মাটি ছিল, বেণু বাঁশের বাঁশি ছিল, বটপাতার ভেলা ছিল, আর ছিল খেলবার পাখী, বনের হরিণ, গাছের

ময়ুর আর—মা গৌতমীর মুখে দেব দানবের যুদ্ধ কথা, তাতঃ কণ্বের মুখে মধুর সামবেদ গান।

সকলি ছিল, ছিল না কেবল—আঁধার ঘরের মানিক—ছোট মেয়ে শকুন্তলা। একদিন নিসুতি রাতে অপ্সরী মেনকা তার রূপের ডালি—দুধের বাছা—শকুন্তলা মেয়েকে সেই তপোবনে ফেলে রেখে গেল। বনের পাখীরা তাকে ডানায় ঢেকে বুকে করে রেখে দিলে।" (প্রথম মুদ্রণ, পৃঃ-২-৩)

এক কথায়, সমস্ত রচনাটিই যেন সারি সারি ছবি দিয়া গড়িয়া তোলা, কবিতা দিয়া গাঁথা।

অবনীন্দ্রনাথের দ্বিতীয় গ্রন্থ "ক্ষীরের পুতুলে" তাঁহার শক্তি আরো উজ্জ্বল হইয়াছে। গল্পটি মৌলিক। বিদেশী রূপকথা "Puss-in-Boots" এর একটি ক্ষীণ ছায়া যেন আছে বলিয়া মনে হয়, কিন্তু তাহাতে লেখকের মৌলিকত্ব নষ্ট হয় না। বাংলা দেশের পরিচিত রূপকথা বুদ্ধু ভূতুমও ইহাতে মিশিয়া আছে, কিন্তু রং-তুলি-কাগজ যেমন শিল্পীর কৃতিত্বে হস্তক্ষেপ করে না—তেমনি "ক্ষীরের পুতুলের" সমস্ত সম্মানই লেখকের প্রাপ্য।

রূপকথার পদ্ধতিতেই গল্পটি বিন্যস্ত। কেমন করিয়া অভাগিনী দুয়োরানী তাঁহার পোষা বানরটির কৌশলে স্বামীর আদর ফিরিয়া পাইলেন এবং মা ষষ্ঠীর কৃপায় সোনার চাঁদ রাজকুমার লাভ করিলেন, তাহাই অনবদ্য ভঙ্গিতে বলা হইয়াছে। 'ক্ষীরের পুতুল'কে পৃথিবীর শিশু-সাহিত্যের একখানা শ্রেষ্ঠ বই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কবি ও চিত্রশিল্পীর সহিত বাঙালী মায়ের স্নেহমধুর কণ্ঠস্বর মিশিয়া ইহাতে যে ত্রিবেণী রচিত হইয়াছে, তাহা অবনীন্দ্রনাথের প্রতিভার পক্ষেই সম্ভব ছিল।

'ক্ষীরের পুতুলের' ঢংটি যেন বাঙালি মা-দিদিমার মুখে ব্রত কথা বলিবার মতো। দ্রুত ভঙ্গিতে কথার পর কথা, ছবির পর ছবি —পড়িতে পড়িতে ভাবানুষঙ্গে বাংলা দেশের শিশিরস্নাত, পুষ্পগন্ধী,

পাখি-ডাকা একটি উষার অনুভূতি মনের মধ্যে ছড়াইয়া দেয়। ইহার সহিত ছেলে-ভুলানো ছড়ার চিত্রকল্পগুলিকে যথেচ্ছ ব্যবহার করা হইয়াছে, যেন ভোরের আকাশে লেখক একটির পর একটি রঙিন মেঘ ভাসাইয়া দিয়াছেন। লিখিতে লিখিতে যিনি ছবি আঁকিতে পারেন—সেই শিল্পীর হাতে মা-ষষ্ঠীর ব্রতকথা নূতন ভাবে শিল্পিত হইয়া উঠিয়াছে।

সমস্ত বইখানিই উদ্ধৃত করিবার প্রলোভন জাগে। আজ হইতে প্রায় আশি বছর আগে অবনীন্দ্রনাথ বাংলা শিশু-সাহিত্যকে কোথায় উত্তীর্ণ করিয়া দিয়াছিলেন, তাহা এই বই হইতেই বোঝা যাইবে ঃ

"ষষ্ঠীঠাকরুণের কথায় মাসি-পিসি মায়া করলেন, দেশের লোক ঘুমিয়ে পড়ল। মাঠের মাঝে রাখাল, ঘরের মাঝে খোকা, খোকার পাশে খোকার মা, খেলাঘরে খোকার দিদি ঘুমিয়ে পড়ল। ষষ্ঠীতলায় রাজার লোকজন, পাঠশালায় গাঁয়ের ছেলেপিলে ঘুমিয়ে পড়ল। রাজার মন্ত্রী হুঁকোর নল মুখে ঘুমিয়ে পড়লেন, গাঁয়ের গুরু বেত হাতে ঢুলে পড়লেন। দিগ্‌নগরে দিনে দুপুরে রাত এল মাসি-পিসি সবার চোখে ঘুম দিলেন—জেগে রইল গাঁয়ের মাঝে রাস্তার শেয়াল কুকুর, দিঘির ধারে রাজার হাতি ঘোড়া, বনের মাঝে বনের পাখী, গাছের ডালে রানীর বানর। আর জেগে রইল ষষ্ঠীদাস বনের বেড়াল, জলের বেড়াল, গাছের বেড়াল, ঘরের বেড়াল ষষ্ঠী তখন ডুলি খুলে ক্ষীরের ছেলে হাতে নিলেন। ক্ষীরের গন্ধে গাছ থেকে কাঠবেড়াল নেমে এল, বন থেকে বন বেড়াল ছুটে এল, জল থেকে উদ্‌বেড়াল উঠে এল, কুনোবেড়াল কোণ ছেড়ে ষষ্ঠীতলায় চলে এল"।

বটতলায় ষষ্ঠীর ছেলেদের যে বর্ণনা ছেলে ভুলানো ছড়ায় চিত্রকল্পগুলির সাহায্যে লেখক রচনা করিয়াছিলেন তাহা বাংলা-সাহিত্যে স্থায়ী সম্পদ হইয়া থাকিবে। কী অসামান্য শিল্পদৃষ্টি এবং কল্পনা

শক্তি থাকিলে এই অংশটি রচনা করা সম্ভব—না পড়িলে তাহা অনুমানও করা যায় না:

"ঝুরঝুরে বালির মাঝে চিক্‌চিকে জল, তারি ধারে একপাল ছেলে দোলায় চেপে ছ-পণ কড়ি গুণতে গুণতে মাছ ধরতে এসেছে; কারো পায়ে মাছের কাঁটা ফুটেছে, কারো চাঁদমুখে রোদ পড়েছে। জেলেদের ছেলে জাল মুড়ি দিয়ে ঘুম দিচ্ছে—এমন সময় টাপুর টুপুর বিষ্টি এল, নদীতে বান এল; অমনি সেই ছেলের পাল, সেই কাঠের দোলা, সেই ছ-পণ কড়ি ফেলে, কোন্ পাড়ায় কোন্ ঘরের কোণে ফিরে গেল। পথের মাঝে তাদের মাছগুলো চিলে কেড়ে নিলে, কোলা ব্যাঙে ছিপগুলো টেনে নিলে, খোকাবাবুরা ক্ষেপ্ত হয়ে ঘরে এলেন, মা তপ্ত দুধ জুড়িয়ে খেতে দিলেন। আর সেই চিক্‌চিকে জলের ধারে ঝুরঝুরে বালির চরে শিবঠাকুর এসে নৌকো বাঁধলেন, তাঁর সঙ্গে তিন কন্যে—এক কন্যে রাঁধলেন বাড়লেন, এক কন্যে খেলেন আর এক কন্যে না খেয়ে বাপের বাড়ি গেলেন। বানর তাঁর সঙ্গে বাপের বাড়ির দেশে গেল। সেখানে জলের ঘাটে মেয়েগুলি নাইতে এসেছে, কালো কালো চুলগুলি ঝাড়তে লেগেছে। ঘাটের দুপাশে দুই রুই কাতলা ভেসে উঠল, তার একটি গুরুঠাকুর নিলেন, আর একটি নায়ে ভরা দিয়ে টিয়ে আসছিল সে নিলে। তাই দেখে ভোঁদর টিয়েকে এক হাতে নিয়ে আর মাছকে এক হাতে নাচতে আরম্ভ করলে, ঘরের দুয়োরে খোকার মা খোকা বাবুকে নাচিয়ে নাচিয়ে বললেন—ওরে ভোঁদড় ফিরে চা, খোকার নাচন দেখে যা"।[১]

পরে, দক্ষিণারঞ্জনের ঠাকুরমার ঝুলি প্রকাশিত হইয়া বাঙালীর হৃদয়দ্বার খুলিয়া দিয়াছিল। মনে হয়, অবনীন্দ্রনাথের 'ক্ষীরের পুতুল'ই তাঁহার কল্পনায় সোনার কাঠি রূপার কাঠির স্পর্শ বুলাইয়া তাঁহাকে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল।

১। ১৩০১ সালে রবীন্দ্রনাথের "ছেলে-ভুলানো ছড়া" প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়। অবনীন্দ্রনাথ সেটির দ্বারা বিশেষ প্রভাবিত হইয়াছিলেন।

অবনীন্দ্রনাথের পরবর্ত্তী বইগুলিকে লইয়া আমরা আলোচনা করিতে পারি নাই কিন্তু তাঁহার সম্পূর্ণ পরিচয় পাইতে হইলে নালক, খাতাঞ্চির খাতা, বুড়ো আংলা, ভূত-পত্রীর দেশে কিংবা 'চাঁই দাদা, চাঁই-দিদি'র অপূর্ব্ব কাহিনীগুলি পড়িতে হয়। শেষের দিকে তাঁহার রচনা একটা বিশিষ্ট ভঙ্গি গ্রহণ করিয়া একটু obscure হইয়া উঠিয়াছিল—'ভূতপত্রীর দেশে'র সমস্ত পরিহাসটুকু গ্রহণ করিতে বয়স্কদেরও কিছু অসুবিধা হয়। ঈশপ ও কথামালার গল্প আশ্রয়ে রচিত তাঁহার 'পালাগুলিও' ঠিক একই কারণে শিশুদের পক্ষে দুরূহ হইয়া ওঠে; কিন্তু বড়দের পক্ষে অবনীন্দ্রনাথ—"the eternal source of joy।" আর তাঁহার 'রাজকাহিনী'—তাহার তো তুলনাই নাই! তাহা রাজার হাতের রাজকীয় সৃষ্টি—ভাষায় ও বর্ণনায় কর্ণেল টডের "Annals of Rajasthan" কে তিনি অসামান্য সাহিত্যে পরিণত করিয়াছেন।

বাগেশ্বরী বক্তৃতা দিতে গিয়া অবনীন্দ্রনাথ বলিয়াছিলেন "প্রত্যেক শিল্পীকে স্বপ্নধরার জাল নিজের মত করে বুনে নিতে হয় প্রথমে, তারপর বসে থাকা—বিশ্বের চলাচলের ধারে নিজের আসন নিজে বিছিয়ে—চুপটি করে নয়, সজাগ হয়ে"। সেই স্বপ্নধরার জাল পাতিবার নিপুণ কুশলী ছিলেন অবনীন্দ্রনাথ স্বয়ং। প্রথম শ্রেণীর শিল্পীর হাতে তুলি আর কলম একসঙ্গে মিলিত হইলে যে লিপি-চিত্র গড়িয়া উঠিতে পারে, তাহার একটি নিদর্শন এই ঃ

"তখন শীত গিয়ে গরম পড়তে আরম্ভ হয়েছে। গাছে গাছে আমের বোল আর কাঁচা আমের গুটি ধরেছে, পানা পুকুরের চারধার আমরুলী শাকের সবুজ পাতায় ছেয়ে গিয়েছে; আলের ধারে ধারে নতুন দুর্ব্বো, আকন্দ ফুল সবে দেখা দিয়েছে; দূরে শাল-পিয়ালের তেঁতুল-তমালের বনে নতুন পাতা লেগেছে, আর দেখতে দেখতে সমস্ত বন পুরন্ত বাড়ন্ত হয়ে উঠেছে; রোদ পাতায় পাতায় কাঁচা সোনার রঙ ধরিয়ে দিয়েছে; কুয়াশা আর মেঘ সরে গিয়ে মনে হচ্ছে যেন নীল

আকাশের কপাট হঠাৎ খুলে গেছে আর আলো আর বাতাস ছুটে বেরিয়ে এসেছে—বাইরে! রিদয়ের কুলুপ দেওয়া ঘরেও আজ দরমার ঝাঁপগুলোর ফাঁক দিয়ে রোদ উঁকি দিচ্ছে, বাতাস সরু সুরে বাঁশি দিয়ে ঢুকছে। রিদয় কিন্তু এসব দেখছে না, শুনছেও না। সে চুপটি করে বসে নষ্টামি ফন্দি আঁটছে, কিন্তু গর্ত্ত ফেলে ইঁদুর যে আজ নতুন বসন্তে শুকনো পাতায় পাতায় ছাওয়া বাদামতলায় রোদ পোহাতে বেরিয়ে গেছে, বেরাল-ছানাটা কাঁঠালতলায় কাঠবেরালির সঙ্গে ভাব করতে দৌড়েছে, গোয়াল ঘরের কপলে গাই তার নেয়াল বাছুরটাকে নিয়ে ল্যাজ তুলে ঢেঁকির মতো লাফাতে-লাফাতে মাঠের দিকে দৌড় দিলে, ঘুলঘুলি দিয়ে সেটা হৃদয় স্পষ্ট দেখলে।',
(বুড়ো আংলা)

শিল্পীর সজাগ দৃষ্টি না থাকিলে এই বর্ণনা করা সম্ভব নয়। আর শিশু-সাহিত্যস্রষ্টার হৃদয়ের যথার্থ স্বরূপটি কী হওয়া উচিত, তাহার একটি অপূর্ব্ব অভিব্যক্তি নিচের উদ্ধৃতিটি হইতে পাওয়া যাইবে :

"ছেলেমেয়েরা যদি জেগে থাকতে পারত তবে তারা দেখতে পেত, সব কচি ছেলেকে তাদের মা চাপড়ে-চাপড়ে ঘুম পাড়িয়ে আস্তে-আস্তে বুকে হাত বুলিয়ে সবার মনের মধ্যকার ছোট খাট সিন্দুকগুলি খুলে তার পরদিনের জন্য বেশ করে গুছিয়ে রাখছেন—ঠিক যেমন করে প্যাঁটরার কাপড় গোছান হয় তেমনি। সমস্ত দিন খেলায় ধুলোয় ছেলেরা যে কোথায় কি ছড়িয়ে ফেলে তা তাদের মনেও থাকে না। মা সেগুলি যত্ন করে সাছিয়ে গুজিয়ে রেখে দেন মনের সিন্দুকে, যাতে সকালে উঠে ছেলেমেয়েদের আর খুঁজতে না হয়। মনের সিন্দুকে যদি কোথাও পোকার মত দুষ্টবুদ্ধি দেখেন তো মা সেটি আস্তে-আস্তে টেনে ফেলেন; ভাল বুদ্ধিগুলিকে যত্ন করে কাগজে মুড়ে মখমলের কাপড়ের মধ্যে ঝেড়ে-ঝুড়ে পোঁটলা বেঁধে তুলে রাখেন। রোজ রোজ কত টুকিটাকি মনের সিন্দুকে ছেলেরা যে জমা করে, তা দেখে মা এক-এক সময় অবাক হয়ে

চেয়ে থাকেন। রাতের বেলায় যদি কচি ছেলেরা জেগে থাকতে পারত তবে সবই দেখতে পেত ; কিন্তু তারা কচি ছেলে কিনা, তাই যেমন মা সুর করে তাদের চাপড়ান—"খুকু ঘুমোল পাড়া জুড়োল" বলে অমনি তারা ঘুমিয়ে পড়ে। কোন কোন ছেলে 'বার্গ এল দেশে' এটুকুও শুনতে পায়। তারপর বুলবুলিতে ধান খেয়ে গেল তাও দেখে, কিন্তু তারপর যে কি কাণ্ড ঘটে খুব কম ছেলেই সেটা দেখেছে।"

(খাতাঞ্চির খাতা)

অষ্টম অধ্যায়

জাতীয় ভাবের উদ্দীপন : জীবনী-সাহিত্য : অন্যান্য

উনবিংশ শতাব্দীর শেষাংশ—বিশেষ করিয়া শেষ দুই দশক—ইংরেজ শাসন সম্পর্কে ভারতবাসীর সম্পূর্ণ মোহভঙ্গের কাল। ইলবার্ট বিল বা 'কালা-কানুনের' আন্দোলন, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কারাবাস এবং নানাদিক হইতে আমলাতান্ত্রিক শাসন ও পীড়ন দেশের মানুষকে ক্রমশঃই স্বাজাত্যবোধ ও আত্মমর্য্যাদার প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিতেছিল। ১৮৮৫ সালে বোম্বাইয়ে উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন হইবার পর এই প্রেরণা প্রবলতর হইয়া ওঠে। একটির পর একটি কংগ্রেসের অধিবেশনের মধ্য দিয়া সারা ভারতবর্ষ এক জাতীয় চেতনার সূত্রে আবদ্ধ হইয়া যায়। লর্ড এলগিন ভাইসরয় রূপে আসিয়া ইংরেজ সম্পর্কে ভারতবাসীর মনে আরও তিক্ততার সৃষ্টি করিয়া দেন। প্লেগ অ্যাক্ট্, প্রেস অ্যাক্ট্, মিউনিসিপ্যাল অ্যাক্ট্—প্রভৃতি একটির পর একটি কঠোর আইনের প্রবর্ত্তন করিয়া ইংরেজ সরকার আমলাতান্ত্রিক ঔদ্ধত্যকে জনমতের উর্দ্ধে স্থাপন করে। তাহার পর আবির্ভাব হয় লর্ড কার্জ্জনের। এই তরলচিত্ত দাম্ভিক রাজপ্রতিনিধিটি তাঁহার স্পষ্টোচ্চারিত বাঙালী এবং ভারতীয় বিদ্বেষে দেশের মনে জ্বালা ধরাইয়া দেন; তাঁহার এডুকেশন কমিশন হিন্দু-মুসলমান নির্ব্বিচারে দেশবাসীকে বিক্ষুব্ধ করিয়া তোলে, তারপর ১৯০৫ সালের বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলনে আসিয়া সেই বিক্ষোভ বজ্রগর্জ্জনে ফাটিয়া পড়ে।

১৯০২ সালে আমেদাবাদে ভারতীয় কংগ্রেসের অষ্টাদশ অধিবেশনে সুরেন্দ্রনাথ সভাপতির আসন হইতে যে দৃপ্ত ভাষণ দিয়াছিলেন, তাহা হইতেই তৎকালীন মনোভঙ্গীটির স্পষ্ট পরিচয় মিলিবে। একদিকে আমাদের গৌরবময় ঐতিহ্য—আমাদের কর্ম্মবীর, তত্ত্বগুরু, আত্মবিসর্জ্জনকারী আদর্শ মানবের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি, অন্যদিকে দুঃসহ পরশাসনের নাগপাশ হইতে মুক্তি—এই দুইটি বক্তব্যই তাঁহার ভাষণে রূপায়িত হইয়াছিল ঃ

"The triumphs of liberty are not won in a day. Liberty is a jealous Goddess exacting in her worship and claiming for her votaries prolonged and assiduous devotion. Read History.

Is there a land more worthy of service and sacrifice? Where is a land more interesting, more venereted in antiquity, more rich in its long traditions, in the wealth of religions, ethical and spiritual conceptions which have left an enduring impress on the civilisation of mankind? India is the cradle of two religions. It is the holy land of the East. Here knowledge first lit its torch....Here was developed a literature and language wich still excite the admiratian of mankind —a philosophy which pondered deep over the problems of life and evolved solution which satisfied the highest of yearnings of the loftiest minds—"[১]

স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষার সহিত জাতীয় গৌরব-চেতনার এই

১। Address of the President, 18th Session, Indian National Congress, Ahmedabad, 1902.

উদ্বোধন বাংলা দেশের সহিত শিশু-সাহিত্যেও স্বাভাবিক ভাবেই প্রতিফলিত হইয়াছিল। ১৮৮৩ সালে 'সখা' পত্রিকার আবির্ভাব হইতে শিবনাথ শাস্ত্রীর 'মুকুল' পর্য্যন্ত আমরা দেখিয়াছি, যে তৎকালীন দেশের অধিকাংশ সুসন্তানই অল্প-বিস্তর এই সমস্ত পত্রিকার সঙ্গে জড়িত ছিলেন—'সখা'র পৃষ্ঠাতে ই বিপিনচন্দ্র "সুরেন্দ্রবাবুর কারাবাস" শীর্ষক প্রবন্ধটি রচনা করিয়াছিলেন। বিপিনচন্দ্র ছাড়াও সক্রিয় রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র ও সখারাম গণেশ দেউস্কর প্রমুখ লেখকেরা এই সমস্ত পত্রিকার লেখকভুক্ত ছিলেন।

জাতীয় মর্য্যাদাবোধকে উদ্দীপিত করিবার সচেতন প্রয়াস 'সখা' হইতে 'মুকুল' অবধি সর্ব্বত্রই লক্ষণীয়। দেশের কৃতী সন্তানদের জীবনী নিয়মিত প্রচার করিয়া যাওয়া এই সমস্ত পত্রিকার একটি অত্যাবশ্যক অঙ্গ ছিল, সেই সঙ্গে প্রাচীন ভারতের গৌরব-কথাও নানাভাবে পরিকীর্ত্তিত হইত। এই শতাব্দীর শেষার্দ্ধে তাই বাংলা শিশু-সাহিত্যে একটি নূতন অধ্যায় যোজিত হইল। ইহাকে আমরা বলিতে পারি ঃ জীবনী-সাহিত্যের যুগ। প্রাচীন খনা-মৈত্রেয়ী -গার্গী-বুদ্ধ-মহাদেব; শিখ-রাজপুত-মারাঠা ইতিহাসের গৌরব কাহিনী; সাম্প্রতিক কালের বিদ্যাসাগর—রামমোহন—সুরেন্দ্রনাথ—দাদাভাই নৌরজীর কথা এবং বিদেশী ইতিহাসের ফ্লোরেন্স নাইটিঙেল, জর্জ ওয়াশিংটন, গ্যারীবল্ডী ও ম্যাট্‌সিনি প্রভৃতি অবলম্বনে জাতীয় গৌরববোধ, স্বদেশপ্রেম ও চরিত্রগঠন—এই ত্রিবিধ লক্ষ্য এই জীবনা-সাহিত্যগুলির মধ্যে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

১৮৭০ হইতে ১৯০০ সালের মধ্যে বাংলা শিশুসাহিত্যে প্রচুর জীবনী প্রকাশিত হইয়াছিল, বলিতে গেলে, একালের ইহাই সর্ব্বাধিক এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ফসল। ইহাদের সবগুলির বিস্তৃত পরিচয় দিয়া লাভ নাই—কয়েকটি বিশিষ্ট গ্রন্থের আলোচনা করিব।

জোয়ানের জীবন চরিত ঃ ১২৮৬ বঙ্গাব্দ, ১৮৭৯ সাল (সংক্ষিপ্ত)।

'ত্রিপুরার ইতিহাস' রচয়িতা শ্রীকৈলাসচন্দ্র সিংহ প্রণীত। জীবনীটির অন্তরালে যুগোপযোগী দেশপ্রেমের প্রবাহ বহিতেছে। এই ফরাসী বীরাঙ্গনার আশ্চর্য্য চরিত্রটির দ্বারা লেখক ভীরু দেশবাসীকে জাগ্রত করিতে চাহিয়াছেন। নামপত্রে উদ্ধৃত আছে ঃ

"পর দুঃখে সদা সম হৃদয় বিদরে
সহি কি যে মাতৃ দুঃখ—"
"ইচ্ছা করে এই দণ্ডে ভীমা অসি করে
নাচিতে চামুণ্ডারূপে সমর ভিতরে"—

রচনার নিদর্শন ঃ

"জোয়ান স্বর্গে গেলেন; কিন্তু তিনি নির্জীব ফরাসিদিগের হৃদয়ে যে উৎসাহ বীজ বপন করিয়াছিলেন, তাহার লয় হইল না; কালে এই বীজ মহাবৃক্ষ ও বৃক্ষে অতি সুন্দর ফল প্রসূত হইয়াছিল। তুলনায় জোয়ান মহারাষ্ট্র জাতির জীবনী শক্তির উত্তেজক শিবজী ও আবার বর্ত্তমান রাজবংশের সংস্থাপয়িতা আলংক্রোর সহিত সমাসন অধিকার করিতে পারেন। তিনি নির্জীব, হতোৎসাহ ফরাসীগণের দেহে নূতন জীবন অর্পণ করেন; একটি উন্নত মহৎ জাতিকে অধিকতর হীনতা ও অবনতির হস্ত হইতে রক্ষা করেন। এই নিদারুণ সময়ে বীরবালার আবির্ভাব না হইলে ফরাসী জাতির বর্ত্তমান অবস্থা—, তাহাদের গৌরব—আমরা দেখিতে পারিতাম কি না বলা যায় না। এই মহৎ জাতির বুদ্ধি, যত্ন ও অধ্যবসায় বলে পৃথিবীস্থ মানবগণের যে মহোপকার সাধিত হইয়াছে, সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বর্দ্ধিত হইয়াছে, কে জানে হয়তো জোয়ান না জন্মিলে সেই উপকার ও সুখে আমাদের বঞ্চিত হইতে হইত।" পৃঃ—১১২

আত্মোৎসর্গ বা প্রাতঃস্মরণীয় চরিতমালা ঃ

(সংবৎ ১৯৪২—৪৩, ১৮৮৩) ঃ যোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বিদ্যাভূষণ, এম, এ।

জন স্টুয়ার্ট মিল ও ম্যাট্‌সিনির প্রথিতনামা জীবনীকার, বিখ্যাত ঐতিহাসিক ও বাণীসাধক, 'আর্য্যদর্শন' পত্রিকার সম্পাদক যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণের এই বইখানি ১৮৮৩ সালে প্রথম প্রচারিত হয়, পরে কিঞ্চিৎ সংশোধিত আকারে পাঠ্যপুস্তক রূপে আত্মপ্রকাশ করে। 'বিজ্ঞাপন' হইতে জানা যায় 'স্কুল-সমূহের সুবিখ্যাত ইন্‌সপেক্টর পূজ্যপাদ ভূদেব মুখোপাধ্যায়' এইখানি লিখিবার জন্য লেখককে বিশেষ প্রেরণা দিয়াছিলেন।

সুরেন্দ্রনাথের উদ্ধৃত বক্তৃতাটিতে ঐতিহ্য-গৌরবের যে জ্বলন্ত ঘোষণা শুনিয়াছি, এই গ্রন্থের 'মুখবন্ধে'ও তাহারি প্রতিধ্বনি অনুরণিত হইতেছে ঃ

"আত্মোৎসর্গের লীলাস্থলী ভারতে আজ 'আত্মোৎসর্গ' নূতন কথা বলিয়া বোধ হইবে। যে ভারতে একদিন আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা আত্মোৎসর্গের দীক্ষাগুরু ছিলেন, আজ সেই ভারতে আত্মোৎসর্গ শিক্ষা দিবার জন্য বৈদেশিক মহাপুরুষগণের উজ্জ্বল চরিত্র পতিত ভারতবাসিগণের সম্মুখে ধরিতে হইল—ইহা অপেক্ষা ক্ষোভের বিষয় আর কি হইতে পারে ?"...

লেখক দেশী ও বিদেশী মহামানবদের চরিত্র উপস্থাপিত করিয়া আত্মোৎসর্গের মহিমা দেখাইয়াছেন। ইঁহাদের মধ্যে আছেন ঃ ভারতের বিশ্বামিত্র, শাক্যসিংহ, গুরুগোবিন্দ, চৈতন্য ও নানক ; অপর দিকে আছেন যীশু খৃষ্ট, ওয়ালেস্, উইলিয়ম টেল্, উইলবার্‌ফোর্‌স্ জন হাওয়ার্ড, ম্যাট্‌সিনি, গ্যারিবল্ডী ও জর্জ্জ ওয়াসিংটন।

বৈদেশিক জীবনীগুলি সম্পর্কে লেখকের মন্তব্য ঃ

"ইউরোপ ও আমেরিকা হইতে যে কয়েকটী চরিত্র রত্ন আহরণ করিয়াছি, তাদৃশ উজ্জ্বল রত্ন আধুনিক সময়ে দুষ্প্রাপ্য। রামায়ণ ও

মহাভারত পাঠে যে ফল এই মহাত্মাগণের চরিতপাঠে সেই ফল এই সকল চরিত্রের অনুকরণে মানুষ দেবতা হয়। বিশেষতঃ সুকুমারমতি বালকগণের কোমল অন্তঃকরণে স্বর্গীয় ভাব চির-অঙ্কিত করিবার এমন উপকরণ আর নাই।"—

বইখানি আদৃত হইয়াছিল। ১৮৮৫ সালে ইহার সংশোধিত দ্বিতীয় সংস্করণ বাহির হয়।

আত্মোৎসর্গের প্রথম পাঁচটি প্রসঙ্গে লেখক দারিদ্র্য ("নির্লোভ বৈরাগ্য ও আত্মত্যাগ")—মহিমা বর্ণনা করিয়াছেন। আর এই দারিদ্র্য দ্বারাই যে বর্ত্তমান দুর্গত ভারতের সম্যক উন্নতি হইবে—এ কথাই বলিয়া দেওয়া হইয়াছে। ভারতের ত্যাগ ও প্রেমের মন্ত্রে দীক্ষা লইয়া ইয়োরোপীয় কর্ম্মযোগে শিক্ষা-গ্রহণের যে বাণী সুরেন্দ্রনাথের ভাষণে নিহিত, বিবেকানন্দের জীবন-সাধনায় যাহা প্রকাশিত—সেই যুগগত বক্তব্যই প্রাতঃস্মরণীয় চরিতমালার অবলম্বন। যেমন ঃ

"তিনি নিজের রাজ্য ও রাজসিংহাসন জ্ঞাতি-হস্তে সমর্পণ করিয়া আপনি ঋষিব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন। ঘোরতর তপস্যায় তিনি জগৎ কাঁপাইয়াছিলেন। তপোবলে তিনি নূতন জগৎ সৃষ্টি করিয়াছিলেন। রাজা বিশ্বামিত্রকে কে চিনিত? কিন্তু রাজর্ষি বিশ্বামিত্র জগতে পূজিত। ত্যাগ-মাহাত্ম্যে বিশ্বামিত্র অপূর্ব্ব জগৎ সৃষ্টি করিয়াছিলেন। তপোবনে তিনি যে শক্তিলাভ করিয়াছিলেন, রাজশক্তি তাহার নিকট অতি তুচ্ছ।" (বিশ্বামিত্র, পৃঃ ১১, দ্বিতীয় সং)।

ইহা যেমন ভারতীয় ভাবধারার অভিব্যক্তি, অন্যদিকে তাঁহার রচনায় সুরেন্দ্রনাথের "Liberty"র আহ্বান ঃ

"ভ্রাতৃগণ! আর কেন? অস্ত্র গ্রহণ করুন। ইতালীর স্বাধীনতা-সূর্য্য দাসত্ব মেঘে আচ্ছন্ন হইয়া আছে। আপনাদের বায়ব্য-অস্ত্রে তাহা অবিলম্বে অপসারিত করুন। যে ব্যক্তি অস্ত্র-গ্রহণক্ষম হইয়াও অস্ত্র-গ্রহণে বিরত থাকিবে, সেই সেই ব্যক্তি জাতীয় বিশ্বাসহন্তা বলিয়া দণ্ডিত হইবে। যে দিন ইতালীর বিচ্ছিন্ন পুত্রকন্যা-

গণ একত্রে মিলিত হইবে, সে দিন অধীনতার তুর্ভর শৃঙ্খল তাঁহাদের চরণ হইতে স্খলিত হইবে, সেই দিন ইতালী আবার পূর্ব্ব গৌরবে প্রতিষ্ঠাপিত হইবে" (গ্যারিবল্ডী, পৃঃ ৮৬)।

এই পর্য্যায়ের গ্রন্থগুলির মধ্যে আত্মোৎসর্গ অতি উৎকৃষ্ট রচনা ; লেখকের অগাধ পাণ্ডিত্য, দেশপ্রেম ও আন্তরিকতা ইহার প্রতিটি প্রসঙ্গে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

আর্য্যকীর্ত্তি ঃ

রজনীকান্ত গুপ্তের এই গ্রন্থখানি ইহার পরেই শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ-যোগ্য। সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস রচয়িতা স্বনামধন্য গ্রন্থকার জীবনী সাহিত্য রচনাতেও তুল্যমূল্য কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। তাঁহার 'চরিত-কথা' (নব-চরিত নামে ১৮৮০ সালে প্রথম প্রকাশিত), 'বীরমহিমা' (১২৯২) এবং 'প্রতিভা' (১৩০২) সর্ব্ব বয়সের নরনারীর পাঠযোগ্য এবং একাধারে শিক্ষা ও স্বাজাত্যবোধের প্রেরণাদায়ক।

রজনীকান্ত 'আর্য্যকীর্ত্তি' বিশেষ ভাবে বালক-বালিকাদের জন্যই রচনা করিয়াছিলেন। ছোট ছোট বই, ১৮৮৩ হইতে ১৮৮৫ সালের মধ্যে মোট পাঁচটি খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছিল। এক বছরের মধ্যেই প্রথম খণ্ডটি তুইটি সংস্করণের গৌরব অর্জ্জন করিয়াছিল।

"বিজ্ঞাপনে" যুগচেতনার অভিব্যক্তি এইরূপ ঃ

"বৈদেশিক সভ্যতা-স্রোতে আমাদের সমাজে অনেক বৈদেশিক ভাব ও বৈদেশিক রীতি নীতি আসিয়া প্রবিষ্ট হইয়াছে। পাঠশালার ছেলেরা এখন বিদেশের কথা ও বিদেশী লোকের জীবন-চরিত পড়িয়াই নীতিশিক্ষা করে। ইহাতে তাহাদের কোমল-হৃদয়ে স্বদেশ-হিতৈষণা বা স্বজাতি-প্রেমের আবির্ভাব হয় না।···স্বদেশের তুঃখে—স্বদেশের বেদনায় তাহাদের মনে তুঃখ বা বেদনার আবির্ভাব হয় না ! সমাজের এই শোচনীয় অবস্থার মধ্যে 'আর্য্যকীর্ত্তি' প্রকাশিত হইল। ইহাতে ক্রমশঃ আর্য্যহিন্দুগণের কীর্ত্তি-কলাপের কাহিনী বিবৃত হইবে "—

কুম্ভ, প্রতাপ সিংহ, বীরবালক বাদল, ঝাঁসীর বীরাঙ্গনা রাণী লক্ষ্মী বাই, শক্তিরূপা দুর্গাবতী প্রভৃতির কাহিনী ওজস্বিনী-ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে—উদ্দেশ্য, দেশাত্মবোধের বিকাশ-সাধন। বাংলা-সাহিত্যে আর্য্যকীর্ত্তি সুপরিচিত গ্রন্থ। লেখক তাঁহার সাধু প্রেরণা কিভাবে তরুণ পাঠক-পাঠিকাদের মধ্যে সঞ্চার করিয়া দিয়াছিলেন, তাহার সামান্য নিদর্শন এই :

"যদি বৈদেশিক সভ্যতা-স্রোত ভারতের এক প্রান্ত হইতে আর এক প্রান্তে গড়াইয়া না পড়িত, ভারতের সন্তানগণ যদি আপনাদের জাতীয় ভাব হইতে বিচ্যুত না হইত, তাহা হইলে বোধ হয়, আজও ভারতবর্ষের এই প্রাচীন আর্য্য কীর্ত্তির অপূর্ব্ব আড়ম্বর দেখা যাইত এবং আজও এই অপূর্ব্ব দানশীলতার অপার মহিমায় ভারতের উত্তর ও দক্ষিণ, পূর্ব্ব ও পশ্চিম এক হইয়া একই আহ্লাদ ও আমোদের তরঙ্গে দুলিতে থাকিত। ভারতের দুরদৃষ্টবশতঃ এ অপূর্ব্ব দৃশ্য চিরদিনের জন্য বিলুপ্ত হইয়াছে। আজ কয়জন ভারতবাসী ইহার জন্য নীরবে নির্জ্জনে অশ্রুপাত করিয়া থাকেন? কয়জনের হৃদয় এ অতীত স্মৃতির তীব্র দংশনে কাতর হইয়া পড়ে? কে ইহার উত্তর দিবে? প্রতি-ধ্বনি বিষণ্ণ মুখে জিজ্ঞাসা করিতেছে, কে উত্তর দিবে?"

(তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ ২৩)

"আর্য্যকীর্ত্তি" প্রচুর খ্যাতি লাভ করিয়াছিল। আজও বাংলা-সাহিত্যের প্রতিটি পাঠক এই বইখানিকে স্মরণ করিয়া অনুভব করেন—তদানীন্তন তরুণ-চিত্তে ইহা কি ভাবে দেশাত্মবোধ জাগ্রত করিতে সহায়তা করিয়াছিল।

আর্য্যচরিত : বীরেশ্বর পাঁড়ে। একাধিক খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছিল। আর্য্যকীর্ত্তির ন্যায় ইহাও স্বাদেশিকতার মন্ত্রে অনুপ্রাণিত। অনেকগুলি সংস্করণ হইয়াছিল। প্রথম বারের প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছিল অনুমানিক ১৮৮৩-৮৪ সালে।

ইহার আলোচিত চরিতাবলী হইল ঃ বাল্মীকি, বেদব্যাস, কালিদাস, শাক্যসিংহ, শঙ্করাচার্য্য, চাণক্য ও বিজয় সিংহের সংক্ষিপ্ত কথা। "ভরসা করি বিদ্যালয়ের বালকদিগকে এই সমস্ত বৃত্তান্ত ভক্তিভাবে পাঠ করাইয়া সকলেই তাহাদিগকে সদ্গুণের পক্ষপাতী করিতে যত্ন করিবেন।"

সাধু উদ্দেশ্য লইয়া সুরচিত গ্রন্থ। ...মাদর হইবার সঙ্গত কারণ ছিল। ইহার "বিজয় সিংহের সংক্ষিপ্ত কথা"র কিছু বিশেষত্ব আছে— লেখক ইতিহাসের অনুপ্রেরণা দ্বারা ভীরু দুর্ব্বল অপযশ-চিহ্নিত বাঙালী জাতিকে আত্মগৌরবে উদ্দীপ্ত করিতে চাহিয়াছেন ঃ

"অনেক লোকের সংস্কার এই যে, বাঙ্গালী জাতি নিতান্ত আধুনিক ও চির দুর্ব্বল। বিজয় সিংহের বৃত্তান্ত পাঠে সেই ভ্রান্ত সংস্কার বিদূরিত হইবে বলিয়া আর্য্যচরিতে তাঁহার বিষয় বর্ণিত হইল। ইহার দ্বারা জীবনচরিতপাঠের সম্যক ফল লাভ না হইলেও অন্ততঃ ইহা জানিতে পারা যায় যে, বাঙ্গালীদিগের বাহুবল ছিল ও তাঁহারা বিদেশীর রাজ্য অধিকার করিয়া তথায় আপনাদিগের আধিপত্য বিস্তার করিতে সক্ষম হইতেন।" (প্রথম ভাগ, ১০ম সং, পৃঃ ৭৫)

অমরকীর্ত্তি অথবা ফাদার দামিয়েনের জীবন ঃ

১২৯৭ সালে দেওঘর উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মধুসূদনের জীবনীরচক যোগীন্দ্রনাথ বসু এবং ঋষি রাজনারায়ণ বসুর পুত্র "সুরভির" প্রাক্তন সম্পাদক যোগীন্দ্রনাথ বসু একযোগে "অমরকীর্ত্তি" রচনা করেন। ইহার উদ্দেশ্য, তরুণদের মধ্যে আত্ম-ত্যাগ ও সেবা ধর্ম্মের মহিমা প্রচার করা। ফাদার দামিয়েন নামক ক্রীশ্চান সন্ন্যাসী ছিলেন সেবাব্রতী—আর্ত্তের পরিচর্য্যাই ছিল তাঁহার জীবন-ব্রত। এই মহাপুরুষ প্রধান ভাবে সর্ব্বজনঘৃণিত গলিত কুষ্ঠ রোগীর সেবা ধর্ম্মই বাছিয়া হইয়াছিলেন, ফলে শেষে এই কুষ্ঠেই তিনি লোকান্তরিত হন। দুই যোগীন্দ্রনাথ সুন্দর গম্ভীর

ভাষায় এই আদর্শ মহামানবের জীবন-কাহিনীটি বিবৃত করিয়াছেন এবং জানা যায়, ফাদার দামিয়েনের অনুসরণে তাঁহারাও দেওঘরে একটি কুষ্ঠাশ্রম স্থাপনের প্রয়াস পাইতেছেন। বইখানির শীর্ষ বাণী ছিল এই ঃ

"To love the lovely in a pure manner is religion, but to love the unlovely is higher religion".

রচনা এই রকম ঃ

"আশ্রমে প্রবেশ করিয়াই দামিয়েন স্বীয় স্বভাবসিদ্ধ উদ্যম ও অনুরাগের সহিত নবাবলম্বিত ধর্ম্মজীবনের নানা কর্ত্তব্য কার্য্য সম্পাদন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। সাংসারিক সকল বাসনা পরিত্যাগ পূর্ব্বক ইন্দ্রিয়দিগকে বশীভূত করিয়া ক্যাথলিক ধর্ম্মসম্প্রদায় অনুমোদিত বিবিধ ধর্ম্মক্রিয়ায় নিযুক্ত থাকিয়া তিনি দিনে দিনে আশ্রমের অধ্যক্ষগণের অনুরাগভাজন হইয়া উঠিতে লাগিলেন।" (পৃঃ ২২)

'সখা ও সাথী' পত্রিকা বইখানির উচ্চ প্রশংসা করিয়াছিল।

চরিতমালা ঃ শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন রচিত। দুই খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছিল। প্রথম ১৩০০ ও দ্বিতীয় ১৩০২ সালে প্রকাশিত হইয়াছিল। ১৩০১, ১৩০২ ও ১৩০৩ সালে প্রথম খণ্ডের তিনটি সংস্করণ হইয়াছিল, তাহা হইতেই ইহার প্রচার অনুমান করা যায়। স্কুলপাঠ্য ছিল বলিয়াই এত সমাদর হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়।

রচনা সর্ব্বতোভাবে বিদ্যালয়ের ছাত্রদের উপযোগী সরল ও স্বচ্ছন্দ। উদ্দেশ্য ঃ

"বিদেশী মহানুভাব লোকের জীবন-বৃত্তান্ত পাঠ করা অপেক্ষা স্বদেশীয় লোকের জীবন চরিতপাঠে সুকুমারমতি বালকদিগের লেখাপড়ায় সবিশেষ অনুরাগ জন্মিতে ও উৎসাহ বৃদ্ধি পাইতে পারে, এতদভিপ্রায়েই এই চরিতমালা নামক পুস্তক লেখা হইয়াছে"। (বিজ্ঞাপন)

লক্ষ্য করিবার মতো, লেখক মাত্র বাঙালী কৃতী সন্তানদের

আলোচনাই ইহাতে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। যথা, রঘুনাথ শিরোমণি, জগদীশ তর্কালঙ্কার, রাধাকান্ত দেব, ভারতচন্দ্র, বিদ্যাসাগর, তারানাথ, তর্কবাচস্পতি, শম্ভুনাথ পণ্ডিত ও কৃষ্ণদাস পাল ইত্যাদি।

রচনার নমুনা :

"দেখ, শম্ভুনাথ সামান্য ষোল টাকা বেতনের চাকরি আরম্ভ করিয়া, কেবল নিজের যত্ন ও পরিশ্রমে বিদ্যা উপার্জ্জন করিয়া দেশের মধ্যে একজন প্রধান লোক হইয়াছিলেন। তিনি যে নিজেই সমুন্নত হইয়াছিলেন, এরূপ নহে ; নিজের যত্নে ও পরিশ্রমে স্বদেশীয়দিগেরও উন্নতির দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া দিয়া গিয়াছেন।"

(শম্ভুনাথ পণ্ডিত, প্রথম ভাগ)

অন্যত্র :

"দেখ, দুর্গাচরণের পিতা সঙ্গতিসম্পন্ন লোক ছিলেন না ; এ জন্য পুত্রকে কলেজে রীতিমত বেতন দিয়া লেখাপড়া শিখাইতে পারেন নাই। তৎকালে এদেশীয় কোনও চিকিৎসকই তাঁহার সমকক্ষ ছিলেন না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।"

(দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ঐ)

কলিকাতায় যে ছেলে মেয়েরা আজ আজ ডাক্তার দুর্গাচরণ অথবা শম্ভুনাথ পণ্ডিতের নামাঙ্কিত পথ দিয়া চলে, অথচ তাঁহাদের সম্বন্ধে কিছুই জানে না, এই বইখানি পড়িলে তাহারা উপকৃত হইবে।

স্বর্গীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮৯৩) ও **বিদ্যাসাগর ছাত্রজীবন** (১৮৯৬)।

বিদ্যাসাগরের জীবন তখন দেশের ছাত্র ও জনসাধারণের সমভাবে আদর্শস্থান ছিল। প্রথম জীবনীটি ১৩০০ সালের ১৩ই শ্রাবণ স্বর্গীয় "বিদ্যাসাগর মহাশয়ের স্মরণার্থে বিজ্ঞান গৃহে বিদ্যাসাগর পুস্তকালয় ও ঝামাপুকুর পাঠাগারের সভ্যগণের যত্নে" যে অধিবেশন হয় তাহাতে পাঠ করিয়াছিলেন রজনীকান্ত গুপ্ত। পরে রচনাটি গ্রন্থাকারে

প্রকাশিত হয়। ইহা অতি সারগর্ভ উৎকৃষ্ট রচনা। বিদ্যাসাগর প্রসঙ্গে আমরা ইহা হইতে উদ্ধৃত করিয়াছি।

দ্বিতীয় বইখানি রচনা করেন বিদ্যাসাগরের বিখ্যাত জীবনী প্রণেতা চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। চণ্ডীচরণের কৃতিত্ব ইহাতেও প্রকাশ পাইয়াছে। রচনার উদ্দেশ্য সম্পর্কে ভূমিকায় লেখক বলিয়াছেন :

"বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বহুবিস্তৃত জীবন চরিত প্রকাশ করিয়াও আমার মনের খেদ মেটে নাই। সেই অনন্যসাধারণ গুণসম্পন্ন মহাপুরুষের বাল্য জীবনী ও ছাত্রাবস্থা সেরূপ উপদেশপ্রদ এবং যেরূপ বিচিত্র ঘটনাপূর্ণ বলিয়া বোধ হয়, স্বদেশে বিদেশে সেরূপ বহুবিধ বিচিত্রপূর্ণ জীবনযাত্রা বিরল বলিয়াই আমার বিশ্বাস। তাই বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিদ্যালয় চরিত সুকুমারমতি বালকদের পাঠোপযোগী করিয়া প্রকাশ করিলাম।"

চণ্ডীচরণের স্বভাবসিদ্ধ প্রাঞ্জল ভাষায় বইটি রচিত হইয়াছে :

"ঈশ্বরচন্দ্র দেখিতে গৌরবর্ণ পুরুষ ছিলেন না, কিন্তু তাঁহার কি এক আশ্চর্য্য মোহিনী শক্তি ছিল যে, যিনি একবার তাঁহাকে দেখিতেন তিনি আর তাঁহাতে (ঈশ্বরচন্দ্রে) আকৃষ্ট না হইয়া থাকিতে পারিতেন না। সে সময়ে সংস্কৃত কলেজে যাঁহারা অধ্যাপক ছিলেন, তাঁহাদের প্রত্যেকেই তাঁহাকে পুত্রনির্ব্বিশেষে স্নেহ করিতেন ও কল্যাণ কামনা করিতেন।

গঙ্গাধর তর্কবাগীশ, জয়গোপাল তর্কালঙ্কার, প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ, সুপ্রসিদ্ধ রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ, হরনাথ তর্কভূষণ, শম্ভুচন্দ্র বাচস্পতি, সুপ্রসিদ্ধ জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন প্রভৃতি এক বাক্যে তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিয়াছেন"। (পৃঃ—৬৭)

বইখানি বিদ্যালয়ে পাঠ্য হইবার জন্যই রচিত হইয়াছিল—
—"Biographical Reader for students preparing for the Upper Primary Examination and also for the Junior Classes of the Entrance School."

সীতা ঃ (১৮৯৪)

অবিনাশচন্দ্র দাস এম্, এ, বি, এল্। "ছাত্রদের জন্য বিশেষ সংগ্রহ"। 'বিজ্ঞাপন' হইতে জানা যায়, 'সীতা' প্রচারিত হইলে শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টর মহোদয় ইহাকে "নর্ম্মাল স্কুলের প্রথম বার্ষিক শ্রেণীর পাঠ্যরূপে", পরে "কলিকাতা সেণ্ট্রাল টেক্স্ট্ বুক কমিটির সভ্য মহাশয়েরা ইহাকে মধ্য বাংলা ও মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয় সমূহের প্রথম ও দ্বিতীয়পাঠ্যরূপে" মনোনীত করেন।

সীতা দেবীর পুণ্য জীবনচরিত সংক্ষেপে সুললিত ভাষায় বর্ণনা করা হইয়াছে। কেবল রামায়ণ নয়, মধুসূদনের "মেঘনাদ বধ" কাব্য হইতেও লেখক কিছু উপকরণ গ্রহণ করিয়াছিলেন মনে হয়। রচনার নিদর্শন ঃ

"সরমা সীতার অন্যতম হিতাকাঙ্ক্ষিণী সখী ছিলেন। রাবণ সরমাকে সীতার, রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। সরমা এই নিমিত্ত নিয়তই সীতা সন্নিধানে অবস্থান করিতেন। রাঘব-বণিতা তাঁহাকেই বিশ্বাস করিয়া তাঁহাকেই আপন দুঃখ কাহিনী বর্ণনা করিতেন। সরমার হৃদয় স্ত্রীজনোচিত কোমলতায় পরিপূর্ণ ছিল; সীতার দুঃখে সরমা অশ্রু মোচন করিতেন। রামচন্দ্রের সসৈন্যে লঙ্কায় গমন অবধি রাবণ কিরূপ মন্ত্রণা৷ করিতেছে সরমা তাহা অবগত হইয়া সীতাকে জ্ঞাপন করিতেন এবং তাঁহাকে নানাপ্রকারে প্রফুল্ল রাখিবার চেষ্টা করিতেন। দেবী সরমা মন্দভাগিনী সীতার অন্ধকারময় জীবনের একমাত্র আলোকস্বরূপ ছিলেন। সীতা এই প্রিয় সখীর সহবাসে ক্ষণকালের নিমিত্তও দুঃখজ্বালা বিস্মৃত হইতে সমর্থ হইতেন"। (দশম অধ্যায়, ১১৮ পৃঃ)

লেখকের হাতে সাহিত্যের কলম ছিল। এই অবিনাশচন্দ্র দাসই "পলাশ বন" নামক একখানি উচ্চ শ্রেণীর উপন্যাস লিখিয়া প্রচুর খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন।

অহল্যা বাই :

দেওঘর বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক যোগীন্দ্রনাথ বসু ইহার রচয়িতা। প্রথম মুদ্রণ দেখি নাই, ১৩০৭ সালে "সখা ও সাথী"তে ইহার সমালোচনা বাহির হইয়াছিল, অনুমান হয় উহারই কাছাকাছি সময়ে বইখানি প্রকাশিত হয়। "যোগীন্দ্রনাথ বহু পরিশ্রমে অহল্যার জীবনের আদর্শ রচনা করিয়া আমাদের দক্ষে ধরিয়াছেন, পুস্তকখানি সকলেরই পড়া কর্ত্তব্য।"

মহারাষ্ট্রের প্রাতঃস্মরণীয়া রাণী অহল্যাবাইয়ের চরিত-কথা ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে। 'নীলমণি বসাকের উৎকৃষ্ট গ্রন্থ "নবনারী"তে অহল্যা বাইয়ের জীবনী পূর্ব্বে সংক্ষেপে লিখিত হইয়াছিল, এখানে লেখক তাহাই বিস্তৃতভাবে উপস্থিত করিয়াছেন।

রচনার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে লেখক বলিয়াছিলেন: "অহল্যার জীবনবৃত্তান্ত আলোচনা করিয়া যদি একটীও বঙ্গসন্তান মহারাষ্ট্রীয় জাতির প্রতি অনুরক্ত ও শ্রদ্ধাবান হন এবং একটীও বঙ্গমহিলা তাঁহার অন্তর্নিহিত শক্তি উপলব্ধি পূর্ব্বক, আত্মোন্নতির চর্চ্চা করেন, তাহা হইলে আমার উদ্যম সার্থক হইবে।"—

নীলমণি বসাকের "নবনারী" রচনার কাল এবং "অহল্যাবাই" রচনার সময়ের মধ্যে আকাশ-পাতাল পার্থক্য। যোগীন্দ্রনাথ বাছিয়া বাছিয়া অহল্যার জীবন চরিত কেন লিখিয়াছেন এবং মারাঠা জাতির প্রতি বাঙালীকে কেন আকৃষ্ট করিতে চাহিয়াছিলেন, তাহার কারণ সমকালীন রাজনীতির মধ্যেই নিহিত। মহারাষ্ট্রে তখন আমলাতান্ত্রিক ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে সুপ্ত সিংহের জাগরণ ঘটিয়াছে। লোকমান্য টিলকের অধিনায়কত্বে হিন্দু জাতীয়তাবোধের উদ্বোধন ঘটিয়াছে— ১৩০২ (১৮৯৫) সালে ঐতিহাসিক গৌরববোধের সহিত রাজনৈতিক চেতনার মিলনে "শিবাজী উৎসব" প্রবর্ত্তিত হইতেছে। মহারাষ্ট্রীয় সখারাম গণেশ দেউস্কর বাঙালীর দেশপ্রেমের সহিত মহারাষ্ট্রের

শৌর্য্য-গৌরবের সেতুবন্ধন রচনা করিয়াছেন এবং "অহল্যাবাই" রচনার নেপথ্যে তাহারই প্রেরণা রহিয়াছে। যোগীন্দ্রনাথ পরে "শিবাজী মহাকাব্য" লিখিয়া নিজের বক্তব্যকে স্পষ্টতর করিয়া তুলিয়াছিলেন।

উপক্রমণিকা হইতে লেখকের মনোভাব উদ্ধৃত হইল: "কেবল মহারাষ্ট্রীয় জাতি নহে, একদিন তাঁহার (শিবাজীর) নামে সমগ্র হিন্দুজাতিই সঞ্জীবনী শক্তি লাভ করিয়াছিল এবং এখনও তাহা লক্ষ লক্ষ হিন্দু সন্তানকে স্বদেশ-বাৎসল্য ও স্বজাতি-প্রেম সম্বন্ধে উৎসাহ দান করিতেছে। পুরুষকার বলে মানুষ কিরূপ আত্মোন্নতি করিতে পারে, শিবাজীর জীবন তাহার অন্যতম উৎকৃষ্ট প্রমাণ ছিল"। (পৃঃ ৪)

শিষ্ট ও গম্ভীর ভাষায় বইখানি লেখা। অহল্যা বাইয়ের উন্নত চরিত্র সুন্দর ভাবে ফুটাইয়া তোলা হইয়াছে। যথা:

"অহল্যার কোন কর্ম্মচারী বণিক-পত্নীর নিকট তিনলক্ষ মুদ্রা উৎকোচ প্রার্থনা করিয়া, তাহাকে ভয় প্রদর্শন পূর্ব্বক বলিলেন, যে উৎকোচ প্রদান না করিলে বণিকের পরিত্যক্ত সমস্ত সম্পত্তি রাজকোষ-ভুক্ত হইবে। বণিক-পত্নী আত্মীয়গণের পরামর্শে দত্তকপুত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু উৎপীড়ক কর্ম্মচারী সেই বালককে বণিকের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী বলিয়া স্বীকার করিলেন না। বণিক-পত্নী তখন নিরুপায়ে অহল্যার শরণাপন্না হইলেন। অহল্যা সমস্ত ঘটনা শ্রবণ করিয়া, অত্যাচারী কর্ম্মচারীকে তৎক্ষণাৎ দূরীভূত করিবার আদেশ দিলেন এবং বণিক-পত্নী যে বালকটিকে দত্তকপুত্র রূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাকে মাতৃস্নেহে ক্রোড়ে লইয়া বস্ত্র, অলঙ্কার ও সম্মানসূচক শিবিকা প্রদানপূর্ব্বক বিদায় করিলেন—" (পৃঃ ৭৩)

বইটির অনেকগুলি সংস্করণ হইয়াছিল।

সংক্ষিপ্ত জীবনী-সংগ্রহ: ১৮৯৭ সালে মন্মথনাথ চৌধুরী রচনা

করেন। গীতার "যদ্যদাচরতি শ্রেষ্ঠঃ"—শ্লোকটি নামপত্রে উদ্ধৃত হইয়াছে।

লেখকের উদ্দেশ্য ভূমিকায় এইভাবে বলিয়া দেওয়া হইয়াছে ঃ

"সুকুমারমতি বালকদিগের হৃদয়ে সৎ, অসৎ, শুভ, অশুভ, হিত, অহিত ইত্যাদি বিষয়ে সম্যক বিবেক উৎপাদনের নিমিত্ত উহাদিগকে গল্পচ্ছলে নীতি শিখাইবার প্রথা অতি প্রাচীন কাল হইতেই প্রবর্ত্তিত দেখা যায়। প্রাচীন সময়ে সাধারণতঃ পশুপক্ষীর উপকথাচ্ছলে নীতি উপদেশ প্রদান হইত। কিন্তু অধুনা সমাজহিতৈষী সদাশয় পণ্ডিত-মণ্ডলী মানব চরিত্র অবলম্বন করিয়া শিশুশিক্ষোপযোগী পুস্তক সকল রচনা শ্রেয়স্কর বিবেচনা করেন—" অতএব এই জন্য বালকদের "নীতি-জ্ঞান" শিক্ষা দিবার মানসে লেখক এটি সংকলন করিয়াছেন।

ইহাতে রামমোহন, রামগোপাল ঘোষ, দ্বারকানাথ মিত্র, জন ব্রাইট, বিদ্যাসাগর, হেয়ার, কৃষ্ণমোহন, কাশীনাথ ত্রিলোক তৈলং, প্রভৃতি কুড়িটি জীবনী আছে। রচনার নিদর্শন ঃ

"যে বালকেরা মনে করে যে বিদ্যা কেবল অর্থ উপার্জ্জনের জন্য এবং বড় মানুষের ছেলের লেখাপড়া শিক্ষার কোন আবশ্যকতা নাই" তাহাদিগের মন দিয়া রাধাকান্ত দেবের জীবনী পাঠ করা উচিত। রাধাকান্তের কিছুরই অভাব ছিল না—তথাপি তিনি যথেষ্ট বিদ্যা উপার্জ্জন করিয়া স্বদেশের সর্ব্বত্র যশস্বী ও প্রতিভাশালী হইয়াছিলেন। অতএব কি ধনী, কি নির্ধন সকলেরই বিদ্যানুশীলন কর্ত্তব্য"। (পৃঃ ৮৩, রাধাকান্তদেব)

অন্যত্র ঃ

"১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে জিজিভয়ের দেহান্ত হয়। জিজিভয় বাস্তবিকই ভারতবাসী পার্শীদিগের উন্নতির মূলে ছিলেন, তিনি যে নিজেই কেবল বড়লোক হইয়াছিলেন এমত নহে ; নিজের যত্নে ও পরিশ্রমে স্বজাতির উন্নতির সোপান নির্ম্মাণ করিয়া গিয়াছেন। তিনি যশস্বী, প্রতিষ্ঠাবান সত্যনিষ্ঠ, স্বদেশপ্রেমিক এবং চিন্তাশীল হইয়া স্বদেশ এবং স্বজাতির

কল্যাণ সাধন দ্বারা ভারতের গৌরব বৃদ্ধি করিরাছেন"। (জেমসেটজী জিজিভয়, পৃ ৭৯)।

মানসিক এবং ব্যবহারিক উন্নতির আদর্শ এই চরিত্রগুলির মাধ্যমে বালকদের সম্মুখে তুলিয়া ধরা হইয়াছে।

মহাপুরুষ চরিত বা জর্জ ওয়াশিংটনের জীবন বৃত্তান্ত : (১৮৯৮) হুগলী নর্ম্মাল বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ঈশানচন্দ্র ঘোষ গ্রন্থটি রচনা করেন।

বাংলা দেশের নবজাগ্রত জাতীয়তাবাদ তখন বিদেশের বিভিন্ন স্বদেশ-প্রেমিকেদের জীবনী রচনা ও পাঠের দ্বারা উদ্দীপনা লাভ করিতেছিল। বিশেষ করিয়া ওয়াশিংটন, গ্যারিবল্‌ডী ও ম্যাট্‌সিনির বীরত্ব তখন সর্ব্বত্র পূজিত হইতেছিল। এই গ্রন্থখানিও সেই প্রেরণা হইতেই লেখা। এই যুগপুরুষের অধিনায়কত্বে আমেরিকা নূতন করিয়া জাগিতেছে—ইহাই বইখানিতে বলা হইয়াছে। ৯৬ পৃষ্ঠার সংক্ষিপ্ত জীবনীটি সুলিখিত।

মুখবন্ধে হেমচন্দ্রের বিখ্যাত উদ্ধৃতি দিয়া আরম্ভ :

"হেথা আমেরিকা নব অভ্যুদয়
······নূতন করিয়া গড়িতে চায়—"

হাজী মহম্মদ মহসীন : অমরচন্দ্র দত্ত। ১৩০৭ সালে ইহার প্রথম মুদ্রণ—১৩১৮ সালে তৃতীয় সংস্করণ হইয়াছিল।

হুগলীর পরম পুণ্যাত্মা দানবীর হাজি মহম্মদ মহসীনের একটি সশ্রদ্ধ জীবনী। ধর্ম্মপ্রাণ মহসীনের মধ্যে হিন্দু-মুসলিম ঐক্য রচিত হইয়া যে একটি অখণ্ড কল্যাণ-চেতনা রূপ পরিগ্রহ করিয়াছিল, ৪০ পৃষ্ঠার বইখানিতে তাহাই সুন্দর ভাবে পরিবেষিত হইয়াছে। ইহার মধ্যেও সে যুগের একটি বিশিষ্ট মনোভাব প্রতিফলিত হইয়াছে, একথা বলা পারে।

কিছু অংশ উদ্ধৃত করিলাম :

"মহম্মদ মহসীনের জীবনে একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য বিষয় এই,

তাঁহার হিন্দুভাব অতিশয় প্রবল ছিল। তাঁহার অধিকাংশ কর্ম্মচারী হিন্দু ছিলেন। তিনি নিরামিষ আহার করিতেন। মুণ্ডিত-শ্মশ্রু মহসীন যখন হিন্দু কর্ম্মচারিগণ বেষ্টিত হইয়া তাঁহার প্রিয় গায়ক যশোহর নিবাসী ভোলানাথ সিংহের গান শুনিতে বসিতেন, তখন তাঁহাকে হিন্দু বলিয়া ভ্রম জন্মিত। তিনি এদিকে মুসলমানের মুসলমান। মহসীন তাঁহার হিন্দু ও মুসলমান কর্ম্মচারীদিগকে এক প্রেমসূত্রে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। বর্ত্তমান সময়ে দেশ যে ভাবে চাহে, তাঁহাতে তাহাই ছিল। মহসীন সময়ের বহু অগ্রবর্ত্তী হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন—।" (তৃতীয় সং, ৩৮ পৃঃ)

বৌদ্ধ যুগে ভারতমহিলা বা বিশাখার উপাখ্যান (১৯০০)

প্রখ্যাত পালিভাষাবিদ্ এবং বৌদ্ধধর্ম্মের গবেষক চারুচন্দ্র বসু কর্ত্তৃক মূল পালি হইতে এই অপূর্ব্ব জীবনীটি অনূদিত হইয়াছিল।

জাতীয়-চেতনার বিকাশের সহিত নারী-শক্তিরও উদ্বোধন ঘটানো লেখকের উদ্দেশ্য ছিল। "ভূমিকা"য় লেখক জানাইয়াছেন "বিশাখার উপাখ্যানের মধ্যে আমরা বৌদ্ধযুগের রমণীকুলের একটি সুস্পষ্ট ছবি দেখিতে পাই, আব বুঝিতে পারি, প্রাচীন ভারতের ব্রহ্মবাদিনী গার্গী, মৈত্রেয়ী, বা মধ্যভারতের লীলাবতী, খনা, উভয়-ভারতীর ন্যায় বৌদ্ধ যুগের যশোধরা, গৌতমী, ও বিশাখা রমণীকুলের গৌরবস্থল। বিশাখা বুদ্ধদেবের প্রধানা গৃহস্থ উপাসিকা॥ বৌদ্ধ ধর্ম্ম কর্ম্মবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। ······তিনি কর্ম্মযোগীদের দৃষ্টান্ত স্থল। তাঁহার যাহা কিছু ধন জন, ঐশ্বর্য্য সকলই ধর্ম্মের নিমিত্ত দান করিতে কুণ্ঠিত হন নাই।

·········বিশাখার জীবনের তেজস্বিতা আমাদের চক্ষে কিছু নূতন বলিয়া প্রতীয়মান হইতে পারে, কিন্তু ইহা তাঁহার নিজস্ব নহে, বৌদ্ধ ধর্ম্মের শিক্ষার ফল। বৌদ্ধ ধর্ম্মে পরাধীনতার লেশমাত্র নাই। চিত্তের স্বাধীনতা এই ধর্ম্মের প্রধান লক্ষণ।

'বিশাখা অসাধারণ শক্তিশালী নারী ছিলেন। কোশলপতি

তাঁহাকে পঞ্চহস্তী সমতুল্যবলিষ্ঠা শুনিয়া পরীক্ষা করিতে অভিলাষী হইলেন। একদিন যখন উপদেশ শুনিয়া মঠ হইতে বিশাখা গৃহে প্রত্যাগমন করিতেছিলেন, কোশলপতি তাহার অভিমুখে একটি হস্তী ছাড়িয়া দিলেন। করীন্দ্র শুঁড় তুলিয়া তাঁহার দিকে ধাবিত হইল। পাঁচশত সহচরীদের মধ্যে কেহ পালাইল, কেহ তাহাদের কর্ত্রীর পশ্চাতে আসিয়া আশ্রয় লইল। বিশাখা তাহাদের জিজ্ঞাসা করিলেন, "ব্যাপার কি?" তাহারা বলিল—"নরপতি আপনার ভীম পরাক্রম পরীক্ষার্থ একটি মস্ত হস্তী ছাড়িয়া দিয়াছেন।" বিশাখা রাজার প্রেরিত হস্তী দেখিয়া ভাবিলেন, "পালাইয়া কি হইবে? উহাকে কেমন করিয়া ধরিব ইহাই ভাবিবার বিষয়।" সজোরে ধরিলে পাছে করীন্দ্র পঞ্চত্ব লাভ করে এই ভয়ে দুইটি অঙ্গুলীর দ্বারা শুঁড় ধরিয়া ছাড়িয়া দিলেন। হস্তী পুনঃ-বাধাপ্রদান বা স্থিরপদে দণ্ডায়মান থাকিতে সমর্থ না হইয়া একেবারে রাজসভায় গিয়া পড়িল। দর্শকবৃন্দ "সাধু-সাধু" বলিয়া আনন্দ ধ্বনি করিয়া উঠিল এবং সহচরীসহ বিশাখা নিরাপদে গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন।' (পৃঃ ২৭)

এই বিবরণের সত্যাসত্য সম্পর্কে প্রশ্ন তুলিয়া লাভ নাই। ইহাকে জীবনীও বলা যায় না—উপাখ্যানই ইহার যথাযোগ্য অভিধা। কিন্তু শক্তিরূপিণী নারী সম্পর্কে যে শ্রদ্ধাবোধ ইহাতে অভিব্যক্ত হইয়াছে তাহাই ইহার মর্ম্মকথা এবং তাহাতেই ইহার সার্থকতা।

জীবনী-সাহিত্য রচনার একটি ধারা পূর্ব্বপরই চলিয়া আসিতেছিল বটে, কিন্তু এই শতাব্দীর শেষাংশে জীবনী রচনার এই প্রবণতা যে একটি বিশিষ্ট তাৎপর্য্য বহন করিতেছে সে কথা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। সর্ব্বভারতীয় রাজনৈতিক জাগরণে বাংলা দেশ সে দিন নেতৃত্ব করিয়াছিল—শিশুর চরিত্রে মহান আদর্শ সঞ্চার, সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধাবোধ এবং দেশভক্তি প্রতিষ্ঠা করিবার উদ্দেশ্যই এই রচনাগুলির মধ্যে প্রকট হইয়া উঠিয়াছিল। ১৯০৫ সালে বঙ্গ ভঙ্গ আন্দোলনের

পর এই **জীবনী-সাহিত্য** আরো ব্যাপকরূপ লইয়া প্রকাশিত হইয়াছিল—সাহিত্যের পাঠক তাহা সহজেই লক্ষ্য করিবেন।

এইগুলি ছাড়াও কিছু আগে পরে যে সব জীবনী রচিত হইয়াছিল তাহাদের মধ্যে ১৮৬০ সালে ব্রহ্মমোহন মল্লিকের **"রণজিৎ সিংহের জীবন বৃত্তান্ত"**, ১৮৬৫ সালে কানাইলাল পাইনের **"ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল"**, চন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের **"বীরাঙ্গনা উপাখ্যান"** ১২৭৮, (খনা, মৈত্রেয়ী, লীলাবতী ইত্যাদির কাহিনী), ১৮৮৩ সালে শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের **"সুরেন্দ্রনাথের জীবনী"**, ১২৯৪ সালে মহেন্দ্রনাথ রায়ের **"প্রাচীন আর্য্যনারীগণের বৃত্তান্ত"**, ১৮৯৮ সালে সতীশ মুখোপাধ্যায়ের **"রামগোপাল ঘোষ"**, ১৩০৩ সালে মোজাম্মেল হকের **"মহর্ষি মনসুর"**, দুর্গাদাস লাহিড়ীর **"আদর্শ চরিত"** (**কৃষ্ণমোহন**—১৮৮৫), ১৮৮৭ সালে শরৎকুমার রায়ের **"গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়"** ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

ইহার অনেকগুলিই আবালবৃদ্ধবণিতা সকলের জন্যই রচিত, কতকগুলি বিশেষভাবে স্কুলপাঠ্য বলিয়া চিহ্নিত। এই স্কুলপাঠ্য বইগুলি সম্পর্কে আর একজন শ্রদ্ধেয় ব্যক্তির নাম স্মরণীয়—তিনি ভূদেব মুখোপাধ্যায়। শিক্ষা-বিভাগের উচ্চস্থানে অধিষ্ঠিত থাকিয়া স্বজাতিবৎসল ও আদর্শনিষ্ঠ ভূদেব বহু লেখককে এই সমস্ত জীবনী রচনার প্রেরণা দিয়াছিলেন, লেখকেরা কৃতজ্ঞচিত্তে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে তাহা বার বার স্বীকার করিয়াছেন।

॥ ২ ॥

কবিতা-গ্রন্থের প্রসার

মধুসূদন ও "নীতিগর্ভ কাব্য"

মহাকবি মাইকেল মধুসূদন ফ্রান্সের ভার্সাই নগরীতে অবস্থান করিবার সময় "চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলীর" সঙ্গে তিনটি উপদেশ-গর্ভ কবিতা রচনা করেন : "ময়ূর ও গৌরী," "কাক ও শৃগাল" এবং "রসাল ও স্বর্ণ-লতিকা।"

১২৭৩ (১৮৬৬) সালে চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলীর প্রথম মুদ্রণে ইহারা সংযুক্ত ছিল। পরে এগুলিকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেওয়া হয়।

ভার্সাই হইতে ফিরিবার পর জীবনের শেষ পর্ব্বে রোগে এবং অর্থাভাবে পীড়িত মধুসূদন স্কুলপাঠ্য হইবে এই প্রত্যাশায় আনুমানিক ১৮৬৯-৭০ সালে এই পর্য্যায়ের আরো কয়টি কবিতা রচনা করেন। এগুলি যথাক্রমে "অশ্ব ও কুরঙ্গ", "দেব দৃষ্টি", "সদা ও গদা," "কুক্কুট ও মণি", "সূর্য্য ও মৈনাকগিরি", "মেঘ ও চাতক," "পীড়িত সিংহ ও অন্যান্য পশু" এবং "সিংহ ও মশক"। ইহাদের কয়েকটি মৌলিক, বাকীগুলি ঈশপের নীতি গল্পের উপর ভিত্তি করিয়া রচিত। ইহাদের মধ্যে 'দেবদৃষ্টি' একটু স্বতন্ত্র—কবির কল্পনা "সুধাংশুর অংশুরূপে নয়ন কিরণ" কবিতাটির উপর বর্ষণ করিয়াছে।

'নীতিগর্ভ কবিতা'গুলি মধুসূদনের আপন বৈশিষ্ট্যে চিহ্নিত, তাঁহার নিজস্ব ভাষার ঐশ্বর্য্য এবং ছন্দের বৈচিত্র্য ইহাদের উচ্চাঙ্গের কাব্য-সৃষ্টিতে পর্য্যবসিত করিয়াছে—বালক-পাঠ্য কবিতার প্রচলিত পদ্ধতির অনুবর্ত্তন ইহাদের মধ্যে নাই। 'রসাল ও স্বর্ণলতিকা,' 'সিংহ ও মশক', 'সদা ও গদা' সবিশেষ পরিচিত। মেঘনাদ বধ' রচয়িতার দীপ্ত প্রতিভা ইহাদের মধ্যেও উদ্ভাসিত :

"রজনী তারার মেলা সর্ব্বত্র ভাঙ্গিল ;
কর-জালে দশদিক্ হাসি উজলিল।
উঠিতে লাগিলা ভানু নীল নভস্তলে ;
দ্বিতীয়-তপনরূপে নীলসিন্ধু জলে
মৈনাক ভাসিল।
কহিল গম্ভীরে শৈল দেব দিবাকরে,—
দেখি তব ধীর গতি দুঃখে আঁখি ঝরে,
পাও যদি কষ্ট, এস, পৃষ্ঠাসন দিব।
যেখানে উঠিতে চাও সবলে তুলিব।
কহিলা হাসিয়া ভানু ;—তুমি শিষ্টমতি
দৈববলে বলী আমি, দৈববলে গতি।" (সূর্য্য ও মৈনাকগিরি)

ইহাতে মাত্র উপদেশ দানেরই প্রয়াস নাই, গম্ভীর-মন্দ্রিত ভাষা এবং বর্ণনার সৌন্দর্য্য বিস্তৃততর ব্যঞ্জনা বহিয়া আনে। যে উদ্দেশ্য কবিতাগুলি লেখা, সেদিক হইতে যে তেমন সমাদর ইহারা পায় নাই তাহা বাংলা দেশের দুর্ভাগ্যই বলিতে হইবে। "কুক্কুট ও মণি" শীর্ষক উৎকৃষ্ট কবিতাটি এখানে উদ্ধৃত করিলাম :

খুঁড়িতে খুঁড়িতে ক্ষুদ কুক্কুট পাইল
একটি রতন
বণিকে সে ব্যগ্রে জিজ্ঞাসিল ;—
"ঠোঁটের বলে না টুটে এ বস্তু কেমন" ?
বণিক কহিল ;—"ভাই
এ হেন অমূল্য রত্ন, বুঝি দুটি নাই।"
হাসিল কুক্কুট শুনি—"তণ্ডুলের কণা
বহু মূল্যতর জানি ; কি আছে তুলনা" ?
"নহে দোষ তোর, মূঢ়, দৈব এ ছলনা,
জ্ঞানশূন্য করিল গোঁসাই।—"
এই কয়ে বণিক ফিরিল।

মূর্খ যে, বিদ্যার মূল্য কভু কি সে জানে,
নরকুলে পশু বলি লোকে তারে মানে;—
এই উপদেশ কবি দিলা এই ভাগে।

কিন্তু স্কুল-পাঠ্যতার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া অন্যান্য যাঁহারা শিশু-কবিতা রচনা করিতেছিলেন, মধুসূদনের মতো কল্পনার ঐশ্চর্য্য বা অভিনববস্তু নির্ম্মাণের প্রজ্ঞা তাঁহাদের প্রায়শঃ ছিলনা। তাঁহারা মদনমোহন তর্কালঙ্কার, কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার ও যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায়কেই অনুসরণ করিয়াছিলেন। "সখা" হইতে বিভিন্ন পত্রিকার মাধ্যমে শিক্ষা-নিরপেক্ষ ভাবেও সে শিশু-কবিতা রবীন্দ্রনাথ, নবকৃষ্ণ, যোগীন্দ্রনাথ, বিজয়কুমার সেন ও গিরীন্দ্রমোহিনী প্রভৃতির হাতে গড়িয়া উঠিতেছিল, তাহার পূর্ণ অভিব্যক্তি আমরা বিংশ শতাব্দীতে আসিয়াই পাই। যদুগোপাল শিশু-কবিতায় সে ধারা প্রবর্ত্তন করিয়া যান ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে তাহাই অনুসরণ করিয়া অনেকগুলি বই লেখা হইয়াছিল। তাহাদের সবগুলি পাইবার উপায় নাই—শিশুদের বই তাহাদেরই হাতে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হইয়া বিস্তৃতির মধ্যে চির-বিলীন হইয়াছে। যথাসাধ্য চেষ্টায় যেগুলির সন্ধান পাওয়া যায় তাহাদের কিছু পরিচয় দিব।

পদ্যমালাঃ ১২৭৭ সালে, অগ্রহায়ণ মাসে (১৮৭০) লব্ধকীর্ত্তি নাট্যকার মনোমোহন বসুর এই বইখানির প্রথম ভাগ এবং সম্ভবতঃ অল্প কিছুদিন পরে ইহার দ্বিতীয় ভাগ প্রকাশিত হয়। প্রথম ভাগের "বিজ্ঞাপনে" গ্রন্থকার জানাইয়াছেন, "শৈশবে গদ্যাপেক্ষা পদ্যানুরক্তিই অধিক তেজস্বিনী।......অতএব গদ্যের সঙ্গে পদ্য কৌশলেও যদি সুকুমারমতি কুমারকুমারীগণের কোমল মনোবৃত্তির স্ফূর্ত্তি করিয়া দেওয়া যায় তবে তাহাদের প্রবৃত্তিমূল ও সদুপায়কেই অবলম্বন করা হয়;—সুতরাং ফলাধিক্য পক্ষেও সন্দেহ থাকে না।"

শিক্ষা বিভাগের অনুমোদন পাইয়া "পদ্যমালা" সবিশেষ আদৃত

হইয়াছিল। তিন মাসের মধ্যে প্রথম মুদ্রণ নিঃশেষিত হইয়া যায় এবং ১২৭৭ সালের চৈত্র মাসেই ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। বস্তুতঃ যদু গোপালের পদ্যপাঠের পরে মনোমোহন বসুর 'পদ্যমালা''-ই সুদীর্ঘকালব্যাপী বিপুল প্রচার লাভ করিয়াছে। ১৩৩৩ সালে ইহার নব-পঞ্চাশৎ সংস্করণ পর্য্যন্ত দেখিয়াছি, আরো কতকগুলি সংস্করণ হইয়াছিল জানি না। "পদ্যমালা"র অনেক কবিতাই এখনও নিয়মত ভাবে শিশুদের পাঠ্যপুস্তকে স্থান পায়। "কি খাব, মা"? "খেলা", "বর্ষা", "শরৎ" প্রভৃতি বহু পরিচিত। মনোমোহন বসু ছিলেন যেমন প্রথম শ্রেণীর নাট্যকার তেমনি সুকবি।

তাঁহার শরৎ কবিতা হইতে কয়েকটি পংক্তি ঃ

"যখন দেখিবে ভাই আকাশেতে মেঘ নাই
মাঝে মাঝে ডাক শুধু আছে,
চারিদিক পরিষ্কার সকল ধবলাকার,
ধরা নব শোভা ধরিয়াছে ;
যখন নির্ম্মল রবি ধরিয়ে প্রবল ছবি,
দিনে দিনে তেজ করিতেছে,
বিমল ধবল চাঁদ পাতিয়া শোভার ফাঁদ
আমাদের মন হরিতেছে।
যখন পুকুরে জল সুনির্ম্মল ঢল ঢল
ধারে দাগ রেখে কমিতেছে
তখন জানিবে মনে সুখ দিতে জীবগণে
সুখের শরৎ আসিয়াছে।''

ছোটদের জন্য এমন সুন্দর ভাষায় "শরতের" প্রত্যক্ষ ছবি খুব বেশী দেখিতে পাওয়া যায় না। নাট্যকাররূপেই নয়, শিশু-সাহিত্যেও মনোমোহন বসু একটি বিশিষ্ট দান রাখিয়া গিয়াছেন।

কবিতা কলাপ ঃ (১২৭৯) ১৮৭৩ সাল। রচয়িতা গোবিন্দপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। ভাষা ও ছন্দের উপর লেখকের অধিকার ছিল

ষোলো পাতার এই চটি বইখানিতে লেখক কয়েকটি নীতিমুখ্য কবিতা পরিবেষণ করিয়াছেন—দেশপ্রেম উদ্বুদ্ধ করিয়া তোলাই তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল বলিয়া মনে হয়। যেমন :

মনোহর মুগ্ধকর একতা রতন
যাহারে পরিলে গলে,
আনন্দ সাগর জলে
অনিবার কলেবর দেয় সন্তরণ।
ভুবনে কি আছে ধন ইহার মতন।

……বলবীর্য্য যশোধনে দেশ দীপ্ত হয়
শত মুখে ইতিহাসে
তার গুণ সদা ভাষে
গরিমা মহিমা যেন সীমাবদ্ধ রয়।
কেবল একতাগুণে জানিও নিশ্চয়—"

(একতা,—পৃ ১-২)

'জনৈক বিলাপ' কবিতায় লেখকের মুখবন্ধ এইরূপ : যবনেরা ভারতবর্ষ অধিকার করিয়া হিন্দুদের উপর নানামত অত্যাচার ও উপদ্রব করিলে, এক ব্যক্তি এইরূপ বিলাপ করিয়াছিল।"

"ধিক আর্য্যপুত্র বীর কুলাঙ্গার
এই কি তোমার বীর ব্যবহার,
হ'য়ে আর্য্যপুত্র—অবনীর সার
নাশিতে ভারত করেছ মন।"

শিশুদের জন্য দেশাত্মবোধমূলক প্রথম কাব্য বোধ করি এইটিই এবং এদিক হইতে ইহার কিছু ঐতিহাসিক মূল্য আছে।

কবিতাকল্পলতা : (প্রথম ভাগ--১৮৭২) দীনবন্ধু সেন। লেখকের উদ্দেশ্য ভূমিকায় নিবেদিত :

"গদ্য অপেক্ষা পদ্য পড়িতে বালক বালিকারা, অধিক ভালবাসে।

তাহারা এমনি পদ্যপ্রিয় যে ভালমন্দ যত কবিতা দেখিতে পায়, তাহারা তত্তাবৎ একেবারে কণ্ঠস্থ করিয়া ফেলে। সুতরাং সুশিক্ষাদায়িনী সারবতী অত্যুৎকৃষ্ট কবিতামালা গুম্ফন করত তাহাদের গলদেশে দোলায়মান করিয়া দেওয়া অতি আবশ্যক।" (ভূমিকা)

অতএব "কোন দূরদর্শী ডেপুটী ইনস্পেকটর মহাশয়ের আদর্শে" লেখক এই কাব্যটি "গুম্ফন" করিয়াছেন। ভারতচন্দ্র, ঈশ্বর গুপ্ত, রঙ্গলাল, মহাভারত, বামাবোধিনী পত্রিকা, কবি রহস্য—সর্ব্বত্র হইতে অতি বিচিত্র সংকলন। রসসাগর কৃষ্ণকান্ত ভাদুড়ীর 'সমস্যা-পূরণ' পর্য্যন্ত বাদ যায় নাই। 'নিশিবটের ভূত' কবিতাটি (২২ পৃঃ) ভূত-ভয় নিবারণের পক্ষে অনুকূল হইতে পারে।

সর্ব্বাপেক্ষা কৌতুককর, লেখক স্বনামে "অ্যাক্রস্‌টিক" রচনা কারয়াছেন। এই উপাদেয় বস্তুটি তুলিয়া দিলাম:

চিত্রালঙ্কার।

শ্রী দীন বন্‌ধু সেন
দী নতায় বলিলেন,
ন বীন যুবক দলে
ব সিয়া অতি বিরলে
ন বনব পদ্যচয়,
ধু পবৎ গন্ধময়;
সে বন করুন সুখে
ন তুবা রচুন মুখে। (পৃঃ ১৮)

এই "গুম্ফিত" বস্তুটি যাহাদের "গলদেশে দোলায়মান" হইয়াছিল, তাহাদের শ্বাসরোধ করিয়াছিল বলিয়া আশঙ্কা হইতেছে।

পদ্যলতা: ১২৮৩ (১৮৭৬) সাল। লেখক পবনচন্দ্র মারিক। "বিদ্যালয়ে সুকুমারমতি শিশুদের পাঠ্যগ্রন্থ বহুল পরিমাণে প্রচারিত হয় নাই দেখিয়া" লেখকের "পরমবন্ধু শিমূলিয়া হিন্দু বিদ্যালয়ের শিক্ষক"

হরিনাথ মুখোপাধ্যায়ের প্রেরণায় বইখানি রচিত হয়। উপদেশাত্মক কবিতার সংগ্রহ। যথা :

আলস্য

গোপাল ও তাহার মাতা

আলস্যের পরবশ হয়ে যাদুধন,
যখন, তখন তুমি কর না যাপন।
সময় অমূল্য ধন বিগত হইলে,
ফিরে নাহি আসে বাছা বহুধন দিলে।
কালের সদ্ব্যবহার করে যেই জন,
পরিশেষে নানা সুখে কাটায় জীবন।
তুমি বাছা কুড়ে, যদি হও নিরন্তর
শেষেতে পাইবে তুমি যন্ত্রণা বিস্তর॥ (পৃঃ ২৫)

শিশু কবিতা : ১২৮৮ (১৮৮১) সাল। সুপরিচিত কবি ও নাট্যকার রাজকৃষ্ণ রায় তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী দুই ভাগ "কবিতা কৌমুদী"র অনুসরণে রচনা করেন। লেখকের উদ্দেশ্য :

"অল্পশিক্ষার অব্যবহিত পরেই যে প্রকার সরল পদ্যপুস্তক ইহাদের পক্ষে শিক্ষোপযোগী হওয়া উচিত, তাহা আদৌ হয় না। প্রায় কঠিন শব্দাত্মক ও কঠিন ভাবসমন্বিত পদ্য পুস্তকই তাহাদের ভাগ্যে পড়িয়া যায়। ......অপেক্ষাকৃত ন্যূন বয়স্কদিগের পক্ষে অধিকাংশ স্থলেই 'ঔষধ গিলার মত' বিরক্তিকর হইয়া দাঁড়ায়। যাহাতে তাহা না হয়, তাহাই এই শিশু কবিতার আদর্শ।" (বিজ্ঞাপন)

বই, কলম, সেলেট, পাঠশালা, হাতী, ঘোড়া, শেয়াল, বাঘ, এই সব লইয়া যুক্তাক্ষরবর্জ্জিত কবিতার সংগ্রহ। অত্যন্ত সহজ মৌখিক ভাষার ভঙ্গিতে লেখা—সুশিক্ষা দানই উদ্দেশ্য। জীব জন্তু ও পাখীর কয়েকটি ছোট ছোট ছবিও ছিল।

একটি কবিতার নমুনা :

কুকুর

একদিন সকাল বেলায়
একটা কুকুর যেতেছিল।
হারাধন নামে এক ছেলে
ঢিল ছুঁড়ে তায় মেরেছিল॥
তাই সে কুকুর রেগে উঠে
ছুটে গিয়ে কামড় মারিল।
হারাধন চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে
যাতনায় কাঁদিতে লাগিল॥
কুকুরের কামড়ের বিষে
দিন কয় পরে হারাধন।
কুকুরের মত ডাক ছেড়ে
অকালেতে ছাড়িল জীবন॥
এই হেতু, বলি শিশুগণ,
হয়ে থেকো খুব সাবধান।
ঢিল-টিল মের না কুকুরে
কামড়ায়ে নাশিবে পরাণ॥ (পৃঃ ১৯-২০)

কবিতা আদৌ হইয়াছে কিনা সন্দেহ, তবে লেখকের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়া থাকিবে।

পদ্যশিক্ষা (১৮৮২) প্রথম ভাগ, লেখক মোজাম্মেল হক। "বালক বালিকাদিগের শিক্ষার্থে নীতিগর্ভ সরল পদ্য পাঠ্যাবলী"। মোজাম্মেল হক সুলেখক ছিলেন। গদ্য পদ্য উভয়ই তাঁহার হাতে সুন্দর হইত। 'সত্যসুখ' কবিতাটির কয়েকটি পংক্তি :

"ভোগ অনুরাগ ভরে, রাজ্য অধিকার তরে
চিত না বাসনা করে মম,
কুবেরের ধনরাশি, তাও নহি অভিলাষী
ধনেতে বাড়ায় মনে তম।

কিন্তু প্রভু দয়াময়, দিয়া দীনে পদাশ্রয়
এই কর অখিলের পতি,
কুকথা না মুখে বলি, ভ্রমে না কুপথে চলি,
থাকে যেন তোমাতেই মতি ॥ (পৃঃ৩০)

কবিতা-কণিকা : (১৮৮৬) ভিখারীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রথম ভাগ। দ্বিতীয় ভাগের সন্ধান পাই নাই। "বালক বালিকাদের জন্য প্রকাশিত।" ভিখারীচরণের নিজস্ব এবং অন্যদের কয়েকটি কবিতা একত্র সংকলিত করিয়া বইখানি প্রকাশিত হয়। যোগীন্দ্রনাথ সরকারের চারিটি কবিতা ইহাতে আছে। যোগীন্দ্রনাথ ছাড়া শ্রীসরল কুমার এবং প্যারীমোহন দাসের কবিতাও রহিয়াছে। বইখানি বৈশিষ্ট্যহীন।

বিদেশী বিষয় লইয়া যোগীন্দ্রনাথ সরকারের রচিত "চোরের দুর্দ্দশা" নামক দীর্ঘ কবিতার অংশ বিশেষ এইরূপ :

(১)

লণ্ডন নগর হতে কিছু পথ দূরে
সন্তান সন্ততি আদি পরিবার সনে,
মনের আনন্দে সদা পবিত্র পরাণে
বিখ্যাত বণিক এক সুখে বাস করে।

(২)

নাহিক কষ্টের লেশ পরম হরষে
সর্ব্বদা ঈশ্বরে মন করিয়া অর্পণ।
দূরে রাখি হিংসা আদি পাপ প্রলোভন,
যাপেন জীবন তাঁরা নিশীথে দিবসে—" ইত্যাদি

পভ্তসার : ১২৯৩ অর্থাৎ ১৮৮৬ সালে 'হেলেনা কাব্য' ও 'মিত্র কাব্যে'র পরিচিত কবি আনন্দচন্দ্র মিত্র বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের জন্য এটি রচনা করেন। লেখকের উদ্দেশ্য ছিল ত্রিবিধ। (১) "বালক বালিকাদিগকে বাঙ্গালা কবিতার প্রকৃতি ও সৌন্দর্য্য প্রদর্শন," (২) "গল্পচ্ছলে নীতিশিক্ষা দান" এবং (৩) "সময়োপযোগী শিক্ষাদান।" আনন্দচন্দ্র **'গভ্তসার'** নামে আর একখানি বিশুদ্ধ টেক্‌স্‌ট্‌ বই লিখিয়াছিলেন।

নানা ছন্দের কয়েকটি সাধারণ স্তরের কবিতা—ইহাদের মধ্যে 'পশু-সভা' কিঞ্চিৎ উল্লেখযোগ্য। গড়ের মাঠে পশুগণের একটি মহতী সভার প্রতীককে অবলম্বন করিয়া বক্তৃতা সর্ব্বস্ব দেশপ্রেমিকদের ব্যঙ্গ করা হইয়াছে এবং যথার্থ দেশপ্রেমের বাণী শোনান হইয়াছে। **'সন্ধ্যা-বর্ণন'** কবিতার কিছু অংশ :

"দিন গেল সন্ধ্যা হলো ফুরাইল বেলা,
আইল যামিনী পরি প্রদীপ-মেখলা ;
কুঞ্চিত কমলকুল হলো একে একে ;
ভ্রমরেরা গেল ঘরে গুন্‌ গুন্‌ ডেকে ;
রাখাল চলিল ঘরে বাজাইয়া বেণু ;
মধুর সস্নেহ ভাষে খেদাইয়া ধেনু ;
উঠিল স্তুতির ধ্বনি ভজন মন্দিরে,
ভকত কীর্ত্তন করে মৃদুল গম্ভীরে"—(পৃঃ ৩৪-৩৫)

কৃত্তিবাসের রামায়ণ ও কাশীদাসী মহাভারত হইতেও দুইটি প্রসঙ্গ ইহাতে উদ্ধৃত হইয়াছে।

হিতদীপ (অর্থাৎ বালক-বালিকাদের শিক্ষার্থ হিতগর্ভ উপদেশাবলী) : রচয়িতা ও প্রকাশক আহিরীটোলা বঙ্গবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক গুরুনাথ সেন। ১২৯৪ (১৮৮৭)।

কয়েকটি নীতিগর্ভ কবিতার সমষ্টি। পূর্ব্ববর্ত্তী সমজাতীয় গ্রন্থ-গুলির সহিত বিশেষ কোনো পার্থক্য নাই। লেখকের ছন্দ এবং ভাষার উপর অধিকার ছিল। ২৮ পাতায় 'আত্মগুণ প্রশংসা' শীর্ষক কবিতার কয়েকটি পংক্তি:

"কুসুম সৌরভ কভু কুসুমে না বলে,
সরসী বিমল কভু বলে নিজ জলে?
নিজরূপ অপরূপ বলে কি কখন
চপলা-শোভন ঘন চারু-দরশন?
সুধাময় সুধাকর কিরণ-নিকর
নিশানাথ বলে তারে ভুবন ভিতর?"

কবিতা-মুকুল: ১২৯৬ (১৮৮৯) সাল।

লেখক তারিণীচরণ সেন 'সখা' পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, এবং 'সখা'র চিত্তবাণী ইহাতেও প্রযুক্ত হইয়াছেঃ "Child is the father of Man"। যুক্তাক্ষর বর্জ্জিত কবিতার বই—"অল্পবয়স্ক কোমলমতি বালক বালিকাদিগের নীতিপূর্ণ পদ্য পাঠে অনুরাগ বৃদ্ধি পাইবে, এই উদ্দেশ্যে মুকুলের প্রচার।······অতি সরল ভাষায় নীতিপূর্ণ কবিতায় লিখিত হইয়াছে।" বইখানিতে রসিকলাল দেরও দুইটি কবিতা আছে।

লেখক স্বদেশ-প্রেমাত্মক "ভারত কোকিল" কাব্য লিখিয়া সেকালে কিছু যশোলাভ করিয়াছিলেন। "কবিতা-মুকুলের" রচনাও মোটের উপর মন্দ নয়:

মাতা। ওই যে মাথার পরে সোনার বরণ,
শোভিছে সুগোল যাদু, থালার মতন,
"সুধাকর" নাম ওর মানসমোহন,
নিশীথে উজ্জ্বল কর করে বিতরণ,
শোভিছে যা ছোট ছোট ফুলের মতন,
"তারাদল" তাহাদের নাম বাছাধন।

শি। দাও না আমায় মাগো একটি উহার,
হাতে করি খেলিব মা। সুখে অনিবার—"
(নিশিতে চাঁদ দেখিয়া—শিশু ও তাহার মাতা)

শিক্ষামূলক, প্রকৃতি ও জীবজন্তুবিষয়ক কবিতাই ইহাতে স্থান পাইয়াছে।

নীতি-গাথা—জগচ্চন্দ্র সেন: ১৮৯৩ সালে ইহার প্রথম দুই খণ্ড এবং ১৮৯৪ সালে তৃতীয় খণ্ড প্রকাশিত হয়। সুকবি জগচ্চন্দ্র সুন্দর ভাবে ছোট ছোট কাহিনী ও খণ্ড কবিতার সাহায্যে নীতি শিক্ষা দিয়াছেন। বই তিনখানি সবিশেষ উল্লেখযোগ্য বলিয়া মনে করি। প্রকাশিত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই ইহা দেশের মনস্বীবৃন্দের দ্বারা বিপুলভাবে সংবর্দ্ধিত হইয়াছিল। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা ছাড়াও রাজনারায়ণ বসু, রজনীকান্ত গুপ্ত ও হীরেন্দ্রনাথ দত্ত ইহার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়াছিলেন। উচ্চাঙ্গের কবিত্ব শক্তির সহিত সৎ উদ্দেশ্য মিলিত হইয়া কবিতাগুলি মূল্যবান শিশু-পাঠ্যে পরিণত হইয়াছে ইহার দ্বিতীয় ভাগ হইতে একটি সুন্দর ক্ষুদ্র কবিতা তুলিয়া দিলাম:

সাহস।

কে পারে লভিতে মণি মুক্তা অগণন
না ডুবিলে রত্নাকরে জীবনে কখন?
কে পারে ফণীর মণি করিতে সঞ্চয়
না ছাড়িলে আকস্মিক মরণের ভয়?
কে পারে গোলাপ ফুল করিতে চয়ন
না সহি কণ্টক ব্যথা, মক্ষিকা-দংশন?
কে পারে জগতে কীর্ত্তি রাখিতে মহান্
সিদ্ধি-লাভে বিসর্জ্জন না দিলে পরাণ?
(পৃঃ ২৩-২৪)

সমসাময়িক কালে বিদ্যালয়ের জন্য যে সমস্ত শিশু-কবিতাগ্রন্থ রচিত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে "নীতি-গাথা" শ্রেষ্ঠ পর্য্যায়ের রচনা বলিয়া মনে হয়।

পদ্যসার : (১৮৯৫—৯৫)

দুই ভাগে প্রকাশ করেন প্রখ্যাত পণ্ডিতবর তারাকুমার কবিরত্ন। নিজে কিছু লিখিয়াছেন, ঈশ্বর গুপ্ত, কাশীরামের মহাভারত, মানকুমারীর 'কাব্য কুসুমাঞ্জলি' হইতে কয়েকটি কবিতাও ইহার দ্বিতীয় ভাগে সংকলিত দেখিতেছি। প্রথম ভাগ পাই নাই।

নীতিশিক্ষা দানের উদ্দেশ্যে সংকলিত হইলেও স্বদেশিকতাই ইহার নেপথ্যে নিহিত। লেখক জানাইয়াছেন: "যে নীতি যে দেশে যে আকারে প্রস্ফুটিত হয়, তাহা সেই দেশে সেই আকারে যেমন মধুর ও হৃদয়গ্রাহী হইয়া থাকে অন্য কোন আকারে তেমন হয় না। তাই স্বদেশীয় আকারে কয়েকটি নীতি প্রদর্শন করিলাম।" (ভূমিকা)

তারাকুমারের কবিত্বশক্তি ছিল। তাঁহার 'উদ্যোগ ও অধ্যবসায়ের আরম্ভ এই রকম :

"নিদ্রা, তন্দ্রা, ভয়, অলসতা আর রোষ,
কার্য্যে বৃথা কালব্যাজ—এই ছয় দোষ—
অবশ্যই পরিত্যাগ করিবে সে জন,
এ ভবে লভিতে লক্ষ্মী আছে যার মন।"

(পৃঃ ৬, দ্বিতীয় ভাগ)

কবিতা-কলাপ : (১৩০১) (১৮৯৫) জগচ্চন্দ্র সরকার। "নীতিমূলক কবিতার সমষ্টি।"

লেখক নানা সংস্কৃত ছন্দ অবলম্বন করিয়া নীতিকথা শুনাইতে চাহিয়াছিলেন। খুব সম্ভব ভারতচন্দ্রের কাছ হইতেই এই ব্যাপারে প্রেরণা পাইয়া ছিলেন। ছন্দের ভারে কবিতাগুলি পীড়িত হইয়াছে—পাঠকেরা কতখানি আনন্দ পাইয়াছিল বলা শক্ত। যেমন "তোটকের" নিদর্শন :

বল বালক দীপ দিয়া দিবসে
তমসে নিশি কে হরষে হরষে।
অনল পশিলে পুড়ি যায় কি না
নর বাঁচি রহে কভু বারি বিনা।…
মণি কে বলনা ফেলি পদ দলয়ে
সুখ মানি শিরপরি কাঁচ লয়ে—” (পৃঃ ৫১)

ছন্দ শিক্ষার দিক দিয়া ‘কবিতা কলাপের’ কিছু মূল্য থাকিতে পারে।

কবিতা কোরকঃ (১৩০৫) রাজকৃষ্ণ পাঁড়ে সংকলন করেন—“বঙ্গ বিদ্যালয়ের তৃতীয় শ্রেণীর পাঠোপযোগী” রূপে। পরিচিত কবিদের কবিতার সংগ্রহ এবং বৈশিষ্ট্যহীন। লেখকদিগের মধ্যে ঈশ্বর গুপ্ত, দ্বারকানাথ অধিকারী, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায়, হরিশ্চন্দ্র মিত্র ও আনন্দচন্দ্র মিত্র প্রভৃতি আছেন।

কবিতা প্রসঙ্গঃ যোগীন্দ্রনাথ বসু, ১৩০৩ (১৮৯৬)।

মাইকেল জীবন চরিতকার কবি যোগীন্দ্রনাথ বসুর এই অতি উৎকৃষ্ট কবিতা গ্রন্থখানি সমসাময়িক কালের একটি প্রধান সৃষ্টি। আদর্শবাদী শিক্ষক যোগীন্দ্রনাথের বক্তব্য এইঃ “ভাষা শিক্ষার সঙ্গে বালক বালিকাগণের হৃদয়ে যাহাতে সদ্ভাব উদ্দীপিত হয়, তাহা লক্ষ্য রাখিয়া কবিতা প্রসঙ্গ রচিত হইল।…জীব প্রেম, স্বার্থত্যাগ এবং ভগবানের প্রতি ভক্তিই সকল শিক্ষার সার এবং সকল শাস্ত্রের চরম লক্ষ্য। এই লক্ষ্য ভ্রষ্ট হইয়া অধ্যয়ন বা অধ্যাপনা করিলে মঙ্গল লাভের আশা নাই ভাবিয়া, প্রায় সকল কবিতাতেই তদনুকূল ভাব ব্যক্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছি”।

এই সদুদ্দেশ্য অত্যন্ত যোগ্যতার সহিত যোগীন্দ্রনাথ পালন করিয়াছেন। “ইহার অধিকাংশ কবিতা ভারতীয় ঐতিহাসিক, পৌরাণিক বা মহাপুরুষ বিশেষের চরিতমূলক ঘটনা অবলম্বনে

লিখিত।” জাতীয়তার মন্ত্রে অনুপ্রাণিত সুকবি গ্রন্থকারের বর্ণনা, ভাষা ও বিষয়বস্তু সবই উচ্চ শ্রেণীর—নীতি-প্রধান হইলেও উনিশ শতকের শিশু-সাহিত্যে এটিকে একটি বিশিষ্ট অবদান বলিয়া লক্ষ্য করা উচিত। লেখক ইহাতে আর একটি নূতন জিনিষ আনিয়া দিয়াছেন—‘দধীচের তনুত্যাগ’ ছোট একটি কাব্য-নাট্যের আকারে পরিবেষিত হইয়াছে। ছাত্রেরা সমষ্টিগত ভাবে এটি সুন্দর আবৃত্তি করিতে পারে। তাঁহার বিখ্যাত কবিতা “গুরু শিষ্যের সংকল্প”, “চিত্রদর্শন” (“দেখ বৎস! সম্মুখেতে প্রসারিত তব ভারতের মানচিত্র”) প্রভৃতিও এই গ্রন্থেরই অন্তর্ভুক্ত। দেশের সমস্ত শ্রেষ্ঠ সুসন্তান—সমস্ত সাময়িক পত্র একযোগে যোগীন্দ্রনাথকে বইখানির জন্য অকুণ্ঠ প্রশংসা জানাইয়াছিলেন।

‘কবিতা প্রসঙ্গ’ আজ বিস্মৃত—কিন্তু বিংশ শতাব্দীর অন্ততঃ দ্বিতীয়—তৃতীয় দশক পর্য্যন্তও ইহার খ্যাতি অম্লান ছিল। ‘মহা-প্রস্থান’, ‘মাতৃস্নেহ’, ‘একনাথ স্বামী’, ‘আত্মোৎসর্গ’, ‘দধীচের তনুত্যাগ’, বা চিত্রদর্শন’ আজও স্মরণযোগ্য। নূতন ধরণের বলিয়া তাঁহার দধীচের তনুত্যাগ হইতে সামান্য উদ্ধৃত করিলাম :

শাতাতপ। কোথা তুমি যাবে তাত?—
দধীচ। (শাতাতপকে ক্রোড়ে করিয়া)
অই বৎস! অই দূর দেশে।
শাতাতপ। আমি সঙ্গে যাব।
দধীচ। না-না বৎস, দুর্গম সে দেশ,
শিশু তুমি পারিবে না যেতে।
শাতাতপ। কোলে তুমি নিও মোরে, এই যে সেদিন
কাঁটা ফুটেছিল পায়, কোলে নিলে তুমি,
হাত ধরে ধীরে ধীরে যাব তব সাথে।
(শাতাতপকে ক্রোড় হইতে নামাইয়া)

দধীচ।　　বুঝিলাম, মানবের প্রাণ
শিশু তরে কেন কাঁদে এত।
কি অমৃত ঢালে যেন হৃদে
বালকের মধুর কথায়।
কিন্তু, আর বৃথা বাক্যব্যয়ে
কাজ নাই, বসি ধ্যান-যোগে ,
নিমেষেতে হইবেক শেষ,
সংসারের এ মোহ-বন্ধন।
গৃহমুখ প্রবাসীর প্রায়
প্রাণ মম হতেছে ব্যাকুল
প্রবেশিতে সেই পুণ্যলোকে।
কি আনন্দ উথলিছে হৃদে,
ছায়া সম ভাসিছে নয়নে,
নিত্যানন্দ, নিত্য জ্যোতির্ম্ময়
যেন কোন অপূর্ব্ব প্রদেশ !

(পৃঃ ১০১—১০২, তৃতীয় সং)

নীতিকণা : নারায়ণচন্দ্র বিদ্যারত্ন (১৮৯৬)।

বিদ্যাসাগরের পুত্র নারায়ণচন্দ্র পিতার কীর্ত্তির মর্য্যাদা রক্ষা করিতে পারেন নাই। কিন্তু উত্তরাধিকার সূত্রে তিনিও যে যৎকিঞ্চিৎ সাহিত্যিক-প্রবণতা লাভ করিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ এই ছোট বইখানি। "ইংরাজী পদ্যগ্রন্থ অবলম্বনে নীতিকণা লিখিত" হইয়াছিল এবং ইহা তাঁহার "এই বিষয়ে প্রথম উদ্যম।" পরবর্ত্তী কোন উদ্যম তিনি করিয়াছিলেন কি না জানা যায় না। লেখক 'বিজ্ঞাপনে' ঠিকানা দিয়াছেন, 'কলিকাতা, বিদ্যাসাগর বাটী'।

কবিতাগুলি ইংরাজী হইতে চলনসই জাতীয় অনুবাদ। যেমন :

সুবাসনা

আমার নয়ন যেন নিমীলিত রয়
হেরিতে সে বস্তু যাহা দর্শনীয় নয়।
অশ্রাব্যে শুনিতে যেন আমার শ্রবণ,
সতত বধির ভাব করয়ে ধারণ।
উপহাস ছলে যেন আমার বসনা
কহিতে অলীক কথা না করে বাসনা—ইত্যাদি।

(পৃঃ ১৭)

চিত্ত-বিকাশ—হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৩০৫ (১৮৯৮)। বৃত্র-সংহারের কবি হেমচন্দ্রের শেষ জীবন গভীর দুঃখময়। মৃত্যুর কয়েক বৎসর পূর্ব্বে চক্ষে ছানি পড়িয়া তিনি অন্ধ হইয়া যান এবং নানা শোকে দুঃখে জর্জ্জরিত হইয়া পড়েন। এই সময় কাশীধাম হইতে তাঁহার শেষ কাব্যগ্রন্থ চিত্ত-বিকাশ প্রকাশিত হয়। ব্যাধিগ্রস্ত কাতর কবি বিজ্ঞাপনে বলিয়াছেন:

"শরীর সুস্থ এবং মনের সুখ না থাকিলে কোন চিন্তার কার্য্য হয় না, বিশেষতঃ গ্রন্থ প্রণয়ন অথবা কবিতা রচনা করিতে হইলে ঐ দুইটি নিতান্ত প্রয়োজনীয়। দুর্ভাগ্যক্রমে আমার ঐ দুইটিরই অভাব হইয়াছে।" তথাপি মানসিক যন্ত্রণার মধ্যে মগ্ন না থাকিয়া হেমচন্দ্র এই কাব্যটি রচনা করিয়াছেন এবং "বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের কিছু উপকারে আসিতে পারে এই ভাবিয়া" বইখানি মুদ্রিত করিয়াছেন।

চিত্ত-বিকাশে হেমচন্দ্রের প্রতিভার দীপ্তি স্বভাবতঃই মলিন। কিন্তু তাঁর সুগভীর আন্তরিকতায় প্রায় প্রতিটি কবিতাই মর্ম্মস্পর্শী। নিজের দুঃখ-বেদনার সকরুণ প্রতিফলন ইহাতে পড়িয়াছে। অন্ধত্বের যন্ত্রণায় আতুর কবি ঈশ্বরকে প্রশ্ন করিয়াছেন:

"প্রতি দিন অংশুমালী, সহস্র কিরণ ঢালি,
পুলকিত করিবে সকলে
আমারি রজনী শেষ হবে নাকি? হে ভবেশ!
জানিব না দিবা কারে বলে।

আর না সুধার সিন্ধু, আকাশে দেখিব ইন্দু,
প্রভাতে শিশির-বিন্দু জ্বলে
শিশির বসন্ত কাল, আসে যাবে চিরকাল
আমি না দেখিব কোন কালে।"
(বিভু কি দশা হবে আমার? পৃঃ ৩-৪)

কিন্তু তাঁহার চিত্তের স্বাভাবিক সততা ও সৌন্দর্য্যবোধ এ বেদনা হইতে তাঁহাকে উত্তীর্ণও করিয়া দিয়াছে। 'আলোক', **'ফুল,'** **'খদ্যোত'**, 'প্রজাপতি,' ও 'কল্পনা' প্রভৃতি কবিতায় তিনি ঈশ্বরের মহিমা ও সৌন্দর্য্যের জয়গান গাহিয়াছেন। অপেক্ষাকৃত পরিণত-মন বালকেরা চিত্ত-বিকাশ হইতে আনন্দ ও প্রেরণা লাভ করিবে। তাঁহার 'ভালবাসা, কবিতা হইতে তিনটি সুন্দর স্তবক তুলিয়া দিতেছি :

"কতজনে কতবার সোদর অধিক
জড়ায়েছি হৃদয়েতে ভাবিয়া প্রেমিক,
বৃশ্চিক দংশন হয়ে ফিরিয়াছি শেষে,
কেঁদেছি রজনী দিবা যাতনার ক্লেশে।
কতবার কতজনে কণ্ঠের ভূষণ
করিয়া রেখেছি বুকে ভাবিয়া রতন,
ছিঁড়িয়া ফেলেছি শেষে বুঝিয়া স্বপন,
করেছি কতই তপ্ত অশ্রু বিসর্জ্জন।
ভালবাসা বলি যারে পরানে ধেয়াই,
সে ভালবাসারে হায় কোথা গেলে পাই,
পরাণের বিনিময়ে পরাণ বিকাই,
এ ভালবাসা কি তবে পৃথিবীতে নাই?" (পৃঃ-৫১)

আদর্শ কবিতাঃ যোগীন্দ্রনাথ বসু, ১৮৯৯।

'কবিতা প্রসঙ্গে'র সাফল্যে অনুপ্রাণিত হইয়া, ইহার তিন বৎসর পরে, ১৩০৬ অর্থাৎ ১৮৯৯ সালে যোগীন্দ্রনাথ বসু এই কাব্যটি রচনা

করেন। 'কবিতা-প্রসঙ্গের' ন্যায় ইহাও প্রচুর সুখ্যাতি পাইয়াছিল মনে হয়। আদর্শবাদী শিক্ষক এবং সুপণ্ডিত যোগানাথের সহজ কবিত্বশক্তি ও মনস্বিতার পরিচয় ইহাতেও লভ্য। "যে সকল মানসিক ভাব লইয়া, উত্তর কালে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হয়, বাল্যকাল হইতেই তাহাদিগের সংগঠন ও পরিবর্দ্ধন অত্যাবশ্যক।" লেখক সেই দিকেই লক্ষ্য রাখিয়াছেন।

কবিতাগুলি সুরচিত, উচ্চ শ্রেণীর বই। 'পুণ্যবানের উক্তি' হইতে কয়েকটি পংক্তি ঃ

"যখন যে দিকে আমি ফিরাই নয়ন,
সুধাময় যেন সব করি দরশন।
শশাঙ্ক, তপনে হেরি সুধা-ধারা ঝরে
বরষণ করে সুধা তারকা-নিকরে।
সমীর হিল্লোলে হেরি সুধা-ধারা বয়,
বিহগ-সঙ্গীতে শুনি সুধা উথলয়।
কুসুম ঢালিছে সুধা, সুধাময় ফল,
সুধাতে গঠিত হেরি আকাশ ভূতল।
নিজে সুধাময় যিনি, এ রাজ্য তাঁহার,
দিয়াছেন মোরে তাঁর সুধার ভাণ্ডার।" (পৃঃ ৪৩-৪৪)

ইহাতে আর একটি বিশিষ্ট রচনা আছে, সেটি সম্পর্কে দৃষ্টি আকর্ষণ করা প্রয়োজন মনে করি। ১৮৯১ সালে নবকৃষ্ণের 'শিশুরঞ্জন রামায়ণ' প্রকাশিত হইয়াছিল। "আদর্শ কবিতা"-তেও 'পূর্ব্বার্দ্ধ' ও 'উত্তরার্দ্ধ' এই দুইভাগে বিভক্ত করিয়া 'রামায়ণ কথা' পয়ার ছন্দে বিবৃত হইয়াছে। শিশুদের জন্য এত সংক্ষেপে অথচ এমন মনোরমভাবে 'রামায়ণ' রচনার কৃতিত্ব নবকৃষ্ণও অর্জ্জন করিতে পারেন নাই। ইহার সমাপ্তিটি এইরকম ঃ

"রামসীতা গুণ আমি কি বর্ণিতে পারি,
রামসম নাহি নর—সীতাসমা নারী।

শ্রীরাম-সীতার গুণ গায়ি ঋষিবর,
হয়েছেন ধরাধামে বাল্মীকি অমর।
অমৃত-মধুর এই সীতা-রাম-লীলা,
শুনিলে পাষাণ গলে জলে ভাসে শিলা।
সাঙ্গ হলো রামায়ণ-গীত সুধাময়,
আনন্দে সকলে বল সীতা-রাম জয়।" (পৃঃ ৩৭-৩৮)

আধুনিক কালের তরুণ-পাঠকদের জন্যও এই বিস্মৃত অথচ অত্যুৎকৃষ্ট রচনাটি পুনর্মুদ্রিত হওয়া উচিত।

যোগীন্দ্রনাথ 'মুকুল', 'সন্দেশ' ও 'শিশু' প্রভৃতি পত্রিকাতেও কয়েকটি ভালো কবিতা রচনা করিয়াছিলেন।

যে-সমস্ত কবিতা-গ্রন্থের পরিচয় দেওয়া হইল, তাহারা ছাড়াও আরো অনেকগুলির সন্ধান পাইয়াছি। যেমন কালীচরণ কবিরত্নের 'কবিতা-কোরক' (তারিখ নাই), হরিশচন্দ্র মিত্রের 'কবিতা-কৌমুদী' (তিন ভাগ, ১৮৭৩-৮০), চিরঞ্জীব শর্ম্মার 'বাল্যসখা' (১৮৮০ ?), মহেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কাব্যমঞ্জরী' (১৮৮৪), রসিকলাল দের 'শিশুহার' (১৮৯৪), 'সচিত্র কবিতাকুসুম' (১৮৯৪), গোবিন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নীতিকুসুমাঞ্জলি' (১৮৯৯) ইত্যাদি। একই ধরণের বলিয়া ক্লান্তিকর পুনরুক্তির ভয়ে ইহাদের পরিচয় আর দেওয়া হইল না। গোবিন্দচন্দ্র রায় 'কৃত্তিবাসী রামায়ণ' হইতে নির্ব্বাচন করিয়া ভ্রাতৃত্বের আদর্শমূলক 'রাম-লক্ষ্মণ' (১৮৯৫) নামে যে সংকলনটি করিয়াছিলেন, সেটিও বেশ সুন্দর বই।

মুখ্যতঃ স্কুলপাঠ্য হইলেও এই সব কবিতা সংগ্রহগুলি উপেক্ষা করিবার মতো নয়। মধুসূদন দত্ত, যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায়, মনোমোহন বসু, জগচ্চন্দ্র সেন, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও যোগীন্দ্রনাথ বসুর মতো প্রতিভাবানদের কৃতিত্বে ইহাদের মধ্যে এমন কতগুলি উৎকৃষ্ট কবিতার সন্ধান পাওয়া যায়, যেগুলি বিংশ-শতাব্দীর নবীন কবিদিগকে বিশেষভাবেই অনুপ্রাণিত করিয়াছে।

॥ ৩ ॥

অন্যান্য

জীবনী ও কবিতা; রবীন্দ্রনাথ, উপেন্দ্রকিশোর, প্রমদাচরণ, অবীন্দ্রনাথ, 'সখা' প্রমুখ পত্রিকাচতুষ্টয়ের লেখকবৃন্দের ছাড়াও অন্যান্য যে সমস্ত বই এই সময়ে লেখা হইতেছিল তাহার প্রায়শঃই টেক্সট-বুকগন্ধী। যেগুলি পাঠ্য হয় নাই সেগুলিও নীতি-নির্ভর, অর্থাৎ উপপাঠ্যতার পর্য্যায়ভুক্ত। তবু ইহাদের যে কয়েকটির কিছু বৈশিষ্ট্য আছে তাহাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিলাম।

কার্ত্তিক গণেশের ঝগড়া :

শ্রীশশিভূষণ ভট্টাচার্য্য রচিত—১২৮০ সালে দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছিল। ২৩ পৃষ্ঠার চটি বই। দুর্গার সপুত্র মর্ত্তে আগমনকে ভিত্তি করিয়া একটি উপদেশপূর্ণ বালপাঠ্য।

"শরৎকালে আশ্বিন মাসে দেবীপক্ষে গিরিরাজ স্বীয় দুহিতা ভগবতীকে আনিবার নিমিত্ত কৈলাস পর্বতে উপনীত হইলেন। কার্ত্তিক মাতামহকে আসিতে দেখিয়া আহ্লাদে আটখানা হইয়া দৌড়িয়া গণেশের নিকট গিয়া কহিলেন—"গণেশদাদা, আজ মাকে নিতে এসেছে। আমি মার সঙ্গে মামার বাড়ী যাব।"

ইহার পর নাটকের আকারে সংলাপ যোজনা করা হইয়াছে। দুই ভায়ের কলহ, পরে মাতার সহিত মর্ত্তে আগমন, মাতুলালয়ে প্রচুর ভক্ষণ এবং বিজয়ায় আপন ঘরে প্রত্যাবর্ত্তন।

বিদায়ক্ষণে :

"ভগবতী আপন অঞ্চলপ্রান্ত দিয়া সকাতরা জননীর অশ্রুজল মোচন করিয়া দিয়া কহিলেন, মা! দুঃখ করিবেন না। আমি আবার

আরবার আসিব। এই বলিয়া শুভক্ষণে কৈলাসের প্রতি যাত্রা করিলেন। অগ্রে পশুপতি, তাহার পিছে লক্ষ্মী সরস্বতী, তৎপশ্চাৎ নন্দী-ভিরিঙ্গী সকলেই নির্ব্বিঘ্নে কৈলাসে উপনীত হইয়া পরম সুখে বাস করিতে লাগিলেন। এদিকে জগতের লোকেরা কোলাকুলি করতঃ আনন্দপূর্ব্বক সিদ্ধি সরবৎ পান করিতে লাগিল"।

বাঙালীর অতি পরিচিত বিষয়বস্তু লইয়া রচিত বইখানি বৈশিষ্ট্য-বর্জ্জিত হইলেও পড়িতে মন্দ লাগে না।

চিঙ্গিড়ি মৎস্যের আশ্চর্য্য গল্পঃ অর্থাৎ ইতিহাসছলে বর্ণন। শ্রীমহেশচন্দ্র দাস দে প্রণীত। ১২৮১ সাল (১৮৭৪)।

১৬ পাতার ছোট বই। কিন্তু গল্পটি ভারী সুন্দর—লেখকের শিশু-সাহিত্যিকসুলভ বিশিষ্ট কল্পনাশক্তি ছিল মনে হয়। গল্পটি এই ঃ "কোন পল্লিগ্রামে এক কৃষক বাস করিতেন। তাহার কোন সন্তানাদি ছিল না। কেবলমাত্র সহধর্ম্মিণী ছিল। কৃষক প্রতিদিন প্রাতে গমন করিয়া লাঙ্গল চষিত, মধ্যাহ্নকালে আসিয়া ভোজন করিত, এক দিবস প্রাতে উঠিয়া গমন করিতে ছিল, দৈবাৎ বিল হইতে কতকগুলি মৎস্য ধারণ করিয়া পুনর্ব্বার গৃহে আসিয়া রমণীকে কহিল, প্রিয়ে, দেখ কতগুলি মৎস্য ধরিয়া আনিয়াছি বলিয়া ভূমে নিক্ষেপ করিল, তাহার মধ্যে ছদ্মবেশী এক চিঙ্গিড়ি মৎস্য ছিল—"

এই চিঙ্গিড়ি মনুষ্যভাষায় কথা বলিয়া পরে কৃষাণীকে চমৎকৃত করে এবং কৃষকের জন্য মধ্যাহ্নের আহার লইয়া ক্ষেতে রওনা হয়। কৃষকের ক্ষেত ভাঙিয়া এক রাজা মৃগয়ায় যাইতেছিলেন—চিঙ্গিড়ি তাঁহাকে গালাগাল দেয়; ক্রুদ্ধ রাজা কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া কৃষকের একটি হালের বলদ লইয়া প্রস্থান করেন। ওদিকে কৃষককে এক কুম্ভীর খাইয়া ফেলিয়াছে—পুকুরের নিকটবর্ত্তী এক ভেকের নিকট সংবাদটি জানিয়া চিংড়ী কুম্ভীরের পেট হইতে পিতা কৃষককে উদ্ধার করে এবং উক্ত রাজার সহিত যুদ্ধ করিতে অগ্রসর হয়। সাপ, বাঘ, বিছা, প্রভৃতি তাহার সৈন্য হয়। রাজা যুদ্ধে হারিয়া নতি

স্বীকার করেন এবং চিংড়ীর সহিত নিজ কন্যার বিবাহ দেন। পরে জানিতে পারা যায়, চিংড়ী একজন ছদ্মবেশী রাজপুত্র— মুনির শাপে তাহার এই দুর্গতি ঘটিয়াছিল।

রচনায় নিপুণতা নাই; কিন্তু গল্পে মুনশীয়ানা আছে। বিশুদ্ধ আনন্দমুখ্য শিশু-সাহিত্য সৃষ্টির দিক হই'ত এই ছোট বইখানির মূল্য স্বীকার্য্য। নীতিপ্রাণ গম্ভীর-গভীর তরুণ-পাঠ্য গ্রন্থসমূহের মধ্যে এই বইখানি একটি সুন্দর ব্যতিক্রম—বাংলা দেশের রূপকথা সাহিত্যের সহিত ইহার একটি অন্তরের যোগ আছে।

উপন্যাস-মুক্তাবলী (১২৮২-১৮৭৫): শশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

লেখক শাদীর গোলেস্তাঁ ও বুস্তাঁ, ইংরাজী আখ্যান, প্রাচীন সংস্কৃত গল্প ইত্যাদি হইতে ছোট ছোট কাহিনী বাংলায় অনুবাদ করিয়াছিলেন। বালক এবং বয়স্কেরা সমভাবে এই বই পড়িতে পারেন। এক আধটি প্রসঙ্গে সতীত্ব মহিমা প্রভৃতি বর্ণিত হইয়াছে, কিন্তু তৎকালে বালকপাঠ্য সাহিত্যের বিস্তৃত পরিধি স্মরণে রাখিয়া সেগুলিকে উপেক্ষা করা যাইতে পারে।

শশিভূষণ সহজ পরিষ্কার বাংলা গদ্য লিখিতেন। "উপন্যাস মুক্তাবলী"র দুইটি গল্প উদ্ধৃত করিলাম .

এক লেখক ও অপর এক ব্যক্তির বিবরণ:

কোন ব্যক্তি এক লেখকের নিকট গমন করত বলিল, মহাশয়! আমাকে একখানি পত্র লিখিয়া দিতে হইবে; লেখক বলিলেন আমার পায়ে অত্যন্ত বেদনা হইয়াছে অতএব আমি পত্র লিখিতে পারিব না। তখন সেই ব্যক্তি বলিল সে কি মহাশয়। আমি আপনাকে তো কোন স্থানে যাইতে বলি নাই, কেবল একখানি পত্র লিখিয়া দিতে বলিয়াছি অতএব আপনার পায়ে বেদনা হওয়ায় লিখিবার প্রতিবন্ধক কি? লেখক বলিলেন, আরে বাপু জান না, আমি পত্র লিখিয়া দিলে আমাকেই যাইয়া উহা পাঠ করিয়া শুনাইতে হয়, কারণ আর কেহ আমার হস্তাক্ষর পড়িতে পারে না। (পৃঃ ১৮)

এক উকিল ও তাহার কুরূপা কন্যার বিবরণ ঃ

এক উকিলের একটি কুরূপা কন্যা হইয়াছিল। তাহার বিবাহের সময় হইলে তাহার পিতা তাহাকে একটি সৎপাত্রে সম্প্রদান করণেচ্ছু হইয়া বিস্তর অর্থব্যয় করিতে স্বীকার হইলেন; কিন্তু কেহই তাহার পাণিগ্রহণ করিতে সম্মত না হওয়ায় অবশেষে উকিল মহাশয় একজন অন্ধের সহিত তাহার বিবাহ দিতে বাধ্য হইলেন। তাহার কিছুদিন পরে তথায় একজন বিচক্ষণ চিকিৎসক আসিয়া নেত্ররোগ আরোগ্য করণে বিশেষ ক্ষমতা প্রদর্শন করায় কেহ উকিল মহাশয়কে তাঁহার জামাতার চক্ষু চিকিৎসা করিতে বলায় উকিল মহাশয় বলিলেন, ওহে, তুমি বোঝ না এখন যদি আমার জামাতা দেখিতে পায় তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমার কন্যাকে কুৎসিত দেখিয়া তাহাকে একেবারে পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিবে। অতএব কুরূপা স্ত্রীলোকের অন্ধ স্বামী হওয়া উচিত। (পৃঃ ২৩)

নীতি-সংগ্রহ, সংবৎ ১৯৩৮ (১৮৭৯) লেখক বজ্রযোগিনী (ঢাকা) গ্রামের কালীকিশোর বসু।

বিজ্ঞাপনে গ্রন্থকারের নিবেদন—"সদুপদেশপূর্ণ জ্ঞানোদ্দীপক গ্রন্থের কোন অভাব নাই; কিন্তু তন্মধ্যে বালক, বালিকা, যুবক, যুবতী সকলের পক্ষেই ফলপ্রদ নীতিপূর্ণ, অথচ অল্প মূল্যের কোন একখান পুস্তক দৃষ্ট হয় না। এ নিমিত্ত মহাভারত অবলম্বনে অন্যান্য নানাবিধ গ্রন্থ হইতে নীতি উপদেশ সংগৃহীত করিয়া" বইখানি রচিত।

ইহাতে অভিমন্যুমহিষী উত্তরা এবং তাঁহার পুত্র মহারাজ পরীক্ষিতের প্রসঙ্গ আশ্রয় করিয়া সর্ব্বাঙ্গীণ নীতি উপদেশের ডালি সাজানো হইয়াছে। গম্ভীর তত্ত্বমূলক বই, বালক-বালিকাদের জন্য বহু স্থানই বর্জ্জনীয়। নিষ্প্রাণ কঠিন ভাষা, তত্ত্বজ্ঞান লাভের জন্য দৃঢ়সংকল্প হইয়া না বসিলে শেষ পর্য্যন্ত অগ্রসর হওয়া কঠিন। পাঠকের মন কতখানি আকর্ষণ করিয়াছিল অনুমান করা সম্ভব নয়। ভাষা এই রকম ঃ

"এই পৃথিবীস্থ মানবগণের প্রত্যেকের পক্ষেই সমস্ত মাঙ্গলিক কর্ম্মে দান্ত জিতেন্দ্রিয় ও বাগ্মীপ্রবর, শীলবান ব্যক্তিকে পৌরহিত্যে (পৌর?) পদে নির্ব্বাচন করা কর্ত্তব্য। যাহার অর্জ্জনস্পৃহা ও জুগোপিষা বৃত্তি অতি প্রবল ও ন্যায়পরতা বৃত্তি অতিক্ষীণ তাহাকে ভৃত্যরূপে নিযুক্ত করিবে না। (পৃঃ ৬০)

বহুরূপি সারমেয় (১৮৮০)

একখানিও উক্ত 'কার্ত্তিক গণেশের ঝগড়া'র লেখক শশিভূষণ ভট্টাচার্য্য প্রণীত বলিয়া মনে হয়। খাগড়া অরুণোদয় যন্ত্রে ১২৮০ সালে ছাপা হয়। এটিও লণ্ডনের ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরীতে আছে।[১] বিজ্ঞাপন এইরূপ:

"অপরিণামদর্শি ক্ষুদ্রজনসুলভ দুরাশা কি বলবতী। অনিচ্ছুক হইলেও অবজ্ঞা ও উপহাসাস্পদে নিক্ষেপ করে। আমি তত্তাবৎ ভয় পরিহারপূর্ব্বক অনধিকারচর্চ্চায় প্রবৃত্ত হইয়াছি, সুতরাং গুণীজন সন্নিধানে উপেক্ষিত ও উপহাসিত হইব সন্দেহ কি? তবে "কর্ম্মণা বাধ্যতে বুদ্ধিঃ" এই সাহসে বহুরূপি-সারমেয় নামে এই ক্ষুদ্রতর গ্রন্থখানি প্রণয়ন করিলাম। গল্পটি কৌতুক ও তাৎপর্য্যগর্ভ।..."

লেখক চোঁয়া স্কুলের শিক্ষক ছিলেন। অতএব কৌতুক গল্পের অন্তরালে নীতি পরিবেষণই তাঁহার লক্ষ্য ছিল। গল্পটি 'পঞ্চ-তন্ত্রের' "পুনর্মূষিকো ভবঃ" কাহিনীরই হেরফের মাত্র—এখানে কেবল ইঁদুরকে কুকুরে পরিণত করা হইয়াছে। পথের কুকুর মুনির কৃপায় বানর, শূকর, বরাহ, হস্তী—পরিশেষে রাজরাণী হইল। তাহাতেও সুখ হইল না। শেষে কুকুর মুনির নিকট গিয়া আবেদন করিল: "আমি এ পর্য্যন্ত অনেক দশাস্বাদ করিলাম কিন্তু সকল স্বাদই দিল্লীর লাড্ডুর ন্যায় পূর্ব্বাপর অনুতাপপ্রদ মাত্র"। ৫৩ পাতার বই। গল্প অপেক্ষা উপদেশ বর্ষণের দিকেই শিক্ষক গ্রন্থকর্ত্তার প্রবণতা। গল্পের গতি পণ্ডিতী ভাষার আক্রমণে মন্থর। যথা: "এইকালে প্রবর নামধেয়ী

১। ডক্‌টর তারাপদ মুখোপাধ্যায়ের সৌজন্যে সংগৃহীত

পরম পবিত্র অজিনবাসপবিধীত তপঃপরাকাষ্ঠা, জরাজীর্ণ শিথিলেন্দ্রিয়, শঙ্করসঙ্কাশ তেজঃপুঞ্জ কলেবর, আবক্ষলম্বিত শ্মশ্রুরাজী বিরাজিত, পলিতপিঙ্গলজটাজাল পৃষ্ঠোপরি দোদুল্যমান"—

সাহিত্য পাঠ : ১২৮৭ (১৮৮০)। নিমাইচরণ সিংহ সংকলিত।

"সাহিত্য পাঠ বিবিধ ইংরাজি গ্রন্থাদি হইতে সংকলিত হইয়াছে। যাহাতে বালকদিগের নীতি-উপদেশের সঙ্গে সঙ্গে ভাষা ও কিয়ৎ পরিমাণ ইতিহাসাদির জ্ঞান এবং আমোদ লাভ হইতে পারে, এমন সব বিষয়ই ইহাতে সন্নিবেশিত করিবার চেষ্টা করিয়াছি।" পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন ইহার আদ্যোপান্ত সংশোধন করিয়া দেন এবং ভূদেব মুখোপাধ্যায় "ইহার কোন কোন বিষয় দেখিয়া প্রচারার্থ অনুমোদন" করেন।

নাম দেখিয়া বিশুদ্ধ টেক্সট্ বুক বলিয়া সন্দেহ হইতে পারে, কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে। ইহা একখানি উৎকৃষ্ট ধরণের উপপাঠ্য। ছোট ছোট উপদেশাত্মক প্রসঙ্গ আছে; মহৎ জীবনী আছে (যেমন কারাসংস্কারক জন হাওয়ার্ড, জুলিয়াস সিজার), বিভিন্ন স্থানের বিবরণ আছে (যেমন দিল্লী, রাজগৃহ, ভুবনেশ্বর), 'ব্যাঘ্র' নামে বাঘের সম্পর্কে সুদীর্ঘ নিবন্ধ আছে।

রচনাগুলি পড়িতে সাহিত্য পাঠেরই আনন্দ হয়। আদৌ নীরস নহে, সুন্দর সুন্দর গল্প ও উদাহরণ দিয়া চিত্তাকর্ষক করা হইয়াছে। "প্রশংস্য প্রতিহিংসা"য় দুইটি তরুণ বালক কিভাবে দুর্দ্দান্ত নরঘাতক ফায়ারক্লাউড্‌কে বধ করিয়া মাতৃহত্যার প্রতিশোধ লইয়াছিল, তাহার অতি চমৎকার লোমহর্ষক বিবরণ পাওয়া যায়। 'ব্যাঘ্র' প্রসঙ্গে একটি গল্পে জনৈক বাঙ্গালী শিকারীর বীরত্ব বর্ণিত হইয়াছে। তাহার অংশ বিশেষ এইরূপ :

"ব্যাঘ্র দেখিয়া এবং তাহার ভীষণ গর্জ্জন শুনিয়া নৌকার লোকেরা ভয়ে হতচেষ্ট হইয়া পড়িল। এস-সি রায় মাঝিকে অভয় দিয়া নৌকা

সোজা করিয়া রাখিতে বলিলেন; এবং নিজ বন্দুক হাতে করিয়া নৌকার গলুইয়ে দাঁড়াইলেন। ব্যাঘ্রটা যখন পঞ্চাশ হস্ত মাত্র ব্যবধানে রহিয়াছে, তখন মাঝির সাহস বিচলিত হইল; সুতরাং সে নৌকা আর ঠিক রাখিতে পারিল না। সহসা তরীখানি ঘুরাইয়া দিলে শিকারী যুবক 'কি করিলি' 'কি করিলি' বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন। নৌকাও যেই ফিরাইয়া দেওয়া হইল, অমনি বাঘ পশ্চাদ্ ভাগে গর্জ্জিয়া 'হাইল' কামড়াইয়া ধরিল এবং তাহার অর্দ্ধেকটা মট্ করিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিল। নৌকাখানি তরঙ্গ-নিক্ষিপ্ত তৃণের মত বিচলিত হইতে লাগিল—" (পৃঃ ১৩১—৩২)

জীবন-আদর্শ (১৮৮২):

"বঙ্গদেশীয় বিদ্যালয়সমূহের জন্য" কালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য রচনা করিয়াছিলেন। "যাহাতে বালকগণ সচ্চরিত্র, বুদ্ধিমান ও চিন্তাশীল হয়, তাহাই এই ক্ষুদ্র পুস্তকের উদ্দেশ্য।" দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ, রামনারায়ণ তর্করত্ন প্রভৃতি বইখানিকে প্রশংসাপত্র দিয়াছিলেন। বইখানি খুবই চলিয়াছিল, ১৮৮৪ সালে ইহার চতুর্থ সংস্করণ ছাপা হইয়াছে—অর্থাৎ দুই বৎসরে চারিটি সংস্করণ হইয়াছিল।

'মনুষ্যজীবন ও সৌন্দর্য্য', 'বাল্যাবস্থা ও সৎসঙ্গ', 'অভ্যাস ও কুসংস্কার', 'বিনয়', 'ক্ষমা' ইত্যাদি নানা প্রসঙ্গ সুললিত সাধু ভাষায় লিখিত। মধ্যে মধ্যে পাদটীকায় প্রশ্ন দিয়া ছাত্রদের বুদ্ধিমত্তার পরীক্ষা করা হইয়াছে। কিন্তু পাঠ্য পাঠ্যপুস্তকরূপে কল্পিত হইলেও কোথাও কোথাও এমন কাহিনী দেওয়া হইয়াছে, যাহা অন্যবিধ স্বাদ বহিয়া আনে।

একটি গল্পে আছে, ঢাকার কোন ব্যক্তি নিরামিষাশী হইলে তাঁহার পত্নীও মাছ খাওয়া ছাড়িয়া দেন। তাহাতে শ্বশুর ক্রুদ্ধ হইয়া পুত্রবধূকে মাছ রাঁধিয়া আনিতে আদেশ করেন।

"শ্বশুর মহাশয় অশ্রুবর্ষিণী পুত্রবধূকে মৎস্য প্রস্তুত করণার্থ উদ্যত দেখিয়া চমৎকৃত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, বৎসে! তুমি মৎস্য

পরিত্যাগ করিয়াছ, তবে কেন আবার উহা প্রস্তুত করণার্থী হস্তপ্রসারণ করিলে ? সাধ্বী রমণী উত্তর করিলেন, পিতঃ আপনার আদেশে প্রস্তুত করা দূরে থাকুক যদি আহার পর্য্যন্ত করিতে অনুরোধ করেন, তাহাও করিতে হইবে, কিন্তু আমি নিশ্চয় জানি, মৎস্যভক্ষণে আমার পীড়া জন্মিবে কারণ উহার প্রতি আমার একে বিতৃষ্ণা জন্মিয়াছে, তাহাতে আবার উহা পাপকর্ম্ম বলিয়া বোধ হইয়াছে। আপনার আদেশ পালন করিতে যদি আমার মৃত্যু হয় তাহাও সুখের বিষয়। শ্বশুরদেব, সাধ্বী শান্তশীলা পুত্রবধূর মুখ হইতে অমৃতময় বাক্যগুলি শ্রবণ করিয়া, আনন্দে রোমাঞ্চিত কলেবর হইয়া বলিলেন,—মাতঃ! তুমি আমাকে আজ যে কি সন্তুষ্ট করিলে তাহা বলিবার নহে, অদ্য হইতে তোমাকে মৎস্যের সংস্রবেও থাকিতে হইবে না।" (পৃঃ ৫০-৫১)

শিশু রামায়ণ—১২৯১ (১৮৮৫)

১৩০১ সালে উপেন্দ্রকিশোরের 'ছেলেদের রামায়ণ' এবং আরো পরে যোগীন্দ্রনাথ সরকারের 'ছোটদের রামায়ণ' প্রকাশিত হইবার অনেক পূর্ব্বেই গদ্য-ভাষায় সংক্ষেপে শিশুদের জন্য একটি রামায়ণ রচনার প্রয়াস হইয়াছিল। 'শিশু রামায়ণে' প্রণেতার নাম নাই, চন্দননগর হইতে তিনকড়ি চক্রবর্ত্তী মুদ্রিত করিয়াছিলেন। ৩৮ পাতার মধ্যে মোটামুটি মূল রামায়ণের আখ্যানটি বিবৃত হইয়াছে। ভাষায় সারল্যের অভাব থাকিলেও প্রচেষ্টা মন্দ নয়। শেষাংশে উপদেশ। রচনার নমুনা :

"বালকের পক্ষে জন্মদাতা এবং শিক্ষাদাতার নিকট বশ্যতা এবং ভাইভগিনীর প্রতি এমনি সস্নেহ ব্যবহার কর্ত্তব্য যে যাবজ্জীবন, কখন পরস্পরের প্রেমবন্ধন শিথিল না হয়—যৌবনে কোন একটি গুরুতর উদ্দেশ্য সাধনে অভিলাষ মনে মনে পোষিত করিয়া স্থির সংকল্প হইয়া যথানীতি সেই উদ্দেশ্য সাধনের দিকে অগ্রবর্ত্তী হওয়া এবং প্রৌঢ়াবস্থায় নিজহস্তে কর্তৃত্ব প্রাপ্ত হইলে প্রভুশক্তির এরূপে

নিয়োগ করিতে হয় যেন অধীন সকলেই সুখী হইতে পারে—এই সকল বিষয় রামচরিতে অতি পরিস্ফুটরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে।”

(৩৮ পৃঃ)

গল্প-স্বল্প ঃ—১৮৮৫ হইতে ১৮৮৮র মধ্যে স্বর্ণকুমারী দেবীর এই বইখানি প্রকাশিত হয়। প্রথমে ইহা একটি খণ্ডে ছিল, পরে ইহাকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া দেওয়া হয় এবং ইহাতে কিছু কিছু নূতন রচনাও সন্নিবিষ্ট হয়। নাম দেখিয়া পড়িতে প্রলোভন জাগে, কিন্তু আসলে ইহা বিশুদ্ধ পাঠ্যগ্রন্থ। একেবারে স্কুলের দিকে দৃষ্টি রাখিয়াই লেখা।

তথাপি স্বর্ণকুমারীর প্রতিভার চিহ্ন ইহার মধ্যেও জাগিয়া আছে। কি গদ্য—কি পদ্য সর্ব্বত্রই একটি সাহিত্যিক সত্তার উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। তাঁহার 'বোনের ভালবাসা' নামে স্নিগ্ধ কবিতাটির কয়েকটি পংক্তি এই ঃ

“আমার খুকুরাণী, সোনামণি
আয় ত কোলে ভাই,
বুকে থুয়ে মুখখানি তোর
সদাই দেখতে চাই।
অমন মধুর হাসি, মধুর মুখে
কোথায় আছে কার ?
চাঁদা মামা ঢেলে গেছে
সুধা যত তার।”

(দ্বিতীয় খণ্ড, ৩য় সং, পৃঃ ৬৩)

নীতি-কুসুম ঃ—ভবনাথ চট্টোপাধ্যায় দুইখণ্ডে রচনা করেন। প্রথম খণ্ডটি প্রকাশিত হয় সম্ভবতঃ ১৮৮৫ সালে—গ্রন্থ সম্পর্কিত মতামত দেখিয়া তাহাই অনুমিত হয়। ১২৯৮ সালে লিখিত 'বিজ্ঞাপন' হইতে জানা যায়—ইহা তৎকালীন একটি বিশিষ্ট শিশুপাঠ্য

ছিল। ইহার একটি 'উপহার' আছে—সেটি বিশেষত্বপূর্ণ। লেখক তাঁহার পাঠক-পাঠিকাদের সম্ভাষণ করিয়া বলিয়াছেন :

"সুকুমারমতি কোমল হৃদয় বালকবালিকাগণ! আমি তোমাদিগকে ভালবাসি ও তোমাদের প্রফুল্লমুখে স্বর্গের পবিত্র চিহ্ন দেখিয়া সুখী হই, সেইজন্য যত্নের সহিত এই কুসুমগুলি সংগ্রহ করিয়া তোমাদিগের জন্য মালা গাঁথিলাম। বালকের গলায় ফুলের মালা যেরূপ শোভা পায় আর কাহারও গলায় সেরূপ পায় না। তোমরা যদি এই মালার একটি ফুলেও সন্তুষ্ট হও, তাহা হইলেও আমার পরম আহ্লাদ!" পাঠক পাঠিকাদের প্রতি এই স্নেহসিক্ত কণ্ঠস্বরটি সুন্দর।

বইখানি মনোহর। নীতি উপদেশের ছলে পৌরাণিক এবং স্থানীয় নানা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গল্প সন্নিবেশিত হইয়াছে। ছোটদের জন্য গল্প লিখিবার ভাষা ও ভাবনা দুই-ই ভবনাথের ছিল। বইখানিতে কয়েকটি ছবিও আছে। একটি প্রসঙ্গ উদ্ধৃত হইল :

প্রকৃত উত্তর :

যখন দাস ব্যবসায় প্রচলিত ছিল, সেই সময় কোন ব্যবসায়ী আমেরিকা হইতে একটি সুন্দর বলিষ্ঠ ও চতুর বালককে বিক্রয় করিবার জন্য বিলাতের বাজারে আনয়ন করে। কোন দয়ালু ব্যক্তি তাহাকে দেখিয়া ভাবিলেন, যদি এই বালক কোন নির্দ্দয় লোকের হস্তে পড়ে, তাহা হইলে ইহার যন্ত্রণার একশেষ হইবে। তিনি তাহার নিকটে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, বৎস! যদি আমি তোমায় ক্রয় করি তুমি সৎ হইবে ত! বালক বিনম্র মুখে উত্তর করিল, মহাশয়! আপনি আমায় ক্রয় করুন আর না করুন, আমি সৎ হইব।

(প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৫৭)

আর্য্য পাঠ ও আর্য্য শিক্ষা :

'আর্য্যচরিত' রচয়িতা বীরেশ্বর পাঁড়ের এই বই দুইখানি ১৮৮৯ এবং ১৮৮৯-৯০ সালে প্রকাশিত হইয়াছিল। এই দুখানিতেও লেখক

বালক-বালিকাদের মনে দেশাত্মবোধ সঞ্চারের এবং তাহাদের চরিত্র সংগঠনের প্রয়াস পাইয়াছেন। অবশ্য 'শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টরগণকে' স্মরণে রাখিয়া লেখকের দেশপ্রেম স্বাভাবিকভাবেই কিছুটা নিয়ন্ত্রিত হইয়া গিয়াছে: 'ছাত্রবৃন্দ মধ্যে নীতিবিস্তার জন্য শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টরগণ নীতিপূর্ণ পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করিতে গ্রন্থকারগণকে একপ্রকার অনুরোধ করিয়াছিলেন। একদিকে এই অনুরোধ রক্ষার্থে, অন্যদিকে কর্ত্তব্যবোধে আমি এই আর্য্যপাঠ সংকলন ও প্রণয়ন করিলাম।' (আর্য্যপাঠের বিজ্ঞাপন)।

বীরেশ্বর পাঁড়ে স্থলেখক ছিলেন, তাঁহার যথেষ্ট আন্তরিকতাও ছিল। লেখকের মনোভঙ্গি ও রচনারীতির নিদর্শনরূপে 'আর্য্যশিক্ষা' হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত হইল:

"হিন্দুর আশা ভরসা হিন্দুর উপরই নির্ভর করিতেছে। আমাদের রাজন্যগণ জাতীয় বীরত্ব হারাইয়াছেন, আমাদের মহিলাগণ পবিত্র সম্মান হইতে বিচ্যুত হইয়াছেন। এই বিশাল বিপণিতে আকবরই একমাত্র ক্রেতা। একমাত্র উদয়ের পুত্র ভিন্ন তিনি আর সকলকেই ক্রয় করিয়াছেন; ক্ষত্রিয়ের প্রধানতম পণ্য সকলেই বিক্রয় করিয়াছে বলিয়া কি চিতোরও এই হাটে আসিবে? প্রতাপ রাজ্য, ধন, বিষয়, বিভব সমস্তই ত্যাগ করিয়াছেন, তথাপি সে অমূল্য ধন অদ্যাবধি ত্যাগ করেন নাই। তরবার ও মহাপ্রাণতার দ্বারা তিনি ক্ষত্রিয়ের গৌরব সম্পূর্ণরূপেই রক্ষা করিতে পারিয়াছেন।"

(চিতোর পৃঃ ১২১)

বই দুইটী নিতান্ত স্থূল পাঠ্যতায়ই পরিসমাপ্ত হয় নাই, রচনার মধ্যে তেজস্বিতা এবং হৃদয়াবেগের একটি সুন্দর সমন্বয় সাধিত হইয়াছে।

আদর্শ নরনারী: (১৮৮৯?) ভবনাথ চট্টোপাধ্যায় ও কালীকৃষ্ণ দত্ত একযোগে রচনা করিয়াছিলেন।

"ইহাতে আদর্শ বালক বালিকা যুবক-যুবতী ও বৃদ্ধবৃদ্ধার ছবি আঁকা হইয়াছে। এই ছবি পাঠকদিগের হৃদয়ে অঙ্কিত থাকিয়া

সংসারপথে উচ্চ লক্ষ্যের দিকে চলিতে সাহায্য করিবে বলিয়া আশা করা যায়।'—সঞ্জীবনী, ২৭ মাঘ, ১২৮৬।

কয়েকটি জীবনীর সংকলন। সহজভাষায় পরিবেষণ করা হইয়াছে।

চারু নীতিপাঠ: কালীকৃষ্ণ দত্ত (আনুমানিক ১৮৮৯-৯০)।

কয়েকটি নীতিমূলক সন্দর্ভ সন্নিবিষ্ট করিয়া পূর্ব্বভাগ ও উত্তরভাগে লেখক গ্রন্থটি রচনা করিয়াছিলেন। বইখানি 'উচ্চশ্রেণীস্থ বালিকা এবং নিম্নশ্রেণীস্থ বালকে'র পাঠোপযোগী ছিল। সংবাদপত্র ও "সুযোগ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইসচানসেলার শ্রীযুক্ত ডাক্তার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ সর্ব্বজন" ইহার প্রশংসা করিয়াছিলেন।

পাঠ্যগ্রন্থ হিসাবে বইখানি প্রচারিত হইয়াছিল মনে হয়। বালিকাদের শিক্ষার মান যে সে যুগে বালকদের তুলনায় অনেকখানি নত করিয়া রাখা হইয়াছিল, ইহার ভূমিকা হইতে তাহারও নিদর্শন মিলিতেছে।

ঐতিহাসিক গল্প: প্রথমভাগ ১৮৯০, লেখক জগদ্বন্ধু ভদ্র।

ঢাকার বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী, বৈষ্ণব গবেষক এবং 'ছুছুন্দরী বধে'র স্রষ্টা কতকগুলি ঐতিহাসিক গল্প লইয়া গ্রন্থটি রচনা করেন। তৎকালীন গবর্ণমেন্ট গেজেটে "স্কুলে নীতিশিক্ষা বিষয়ক মন্তব্য প্রকাশের পর বঙ্গদেশের নানা মুদ্রাযন্ত্র হইতে রাশি রাশি নীতিবিষয়ক পুস্তক প্রস্তুত হওয়ায় এবং অনেক শিক্ষাবিভাগ অসংস্পৃষ্ট নূতন লোকেও হস্তকণ্ডুয়ণ নিবারণ জন্য নৈতিক উপদেশপূর্ণ বহুল গ্রন্থ লিখিতেছেন" দেখিয়া জগদ্বন্ধু এই বইখানি লিখিবার প্রেরণা পান। অন্যান্য লেখকদের প্রতি বক্র কটাক্ষ করিয়া তিনি বলিয়াছেন "উপদেশে কস্মিনকালে কাহারও কোন উপকার হইয়াছে কিনা সন্দেহ।" তাই তিনি "এক অভিনব পন্থা অবলম্বন" করিয়াছেন—অসংখ্য ঐতিহাসিক গল্প হইতে নীতিগর্ভ পঞ্চাশটি ইহাতে বাছিয়া লইয়া সাজাইয়া দিয়াছেন।

লেখক যে "অভিনবত্ব" দাবী করিয়াছেন, দুখের সঙ্গে বলিতে হয় তাহাতে তাঁহার সম্পূর্ণ অধিকার নাই। 'সদগুণ ও বীর্য্যের ইতিহাস'

হইতে আরম্ভ করিয়া এই ধরণের গ্রন্থ ইতঃপূর্ব্বে অনেকগুলিই সংকলিত হইয়াছিল—আমরা তাহাদের কিছু কিছু পরিচয়ও দিয়াছি। তথাপি একজন খ্যাতমামা পণ্ডিত ও লেখকের লেখনী-নিঃসৃত এই বইটির কিছু মূল্য আছে। প্রত্যক্ষভাবে উপদেশ না দিয়াও ছোট ছোট গল্পের সাহায্যে লেখক সুন্দরভাবে নীতি পরিবেষণ করিয়াছেন। "ক্ষুদ্রের প্রতি মহতের দায়" হইতে একটি কাহিনী এই ঃ

তৃতীয় গল্প

সিসিলি ও নেপলসের অধিপতি অল্‌ফন্স যখন সিসিলি দ্বীপে সমরে ব্যাপৃত ছিলেন তখন একদা শত্রু কর্ত্তৃক তদীয় সৈন্যের গতিরুদ্ধ হইলে, তাঁহাকে 'একটি নদীতীরে সামান্য দিন অতিবাহিত করিতে হইয়াছিল। এবং শিবিরে কিছুমাত্র খাদ্য না থাকাতে আলফন্সকে সসৈন্যে উপবাস করিতে হইয়াছিল। সন্ধ্যার প্রাক্কালে একটী সেনা-রাজাকে কিঞ্চিৎ খাদ্য আনিয়া দিল। রাজা সেনাকে সমুচিত ধন্যবাদ করিয়া খাদ্য দ্রব্য প্রত্যাখ্যান করিলেন, এবং বলিলেন, "যখন আমার সমস্ত সৈন্যসামন্ত উপবাসী, তখন কেমন করিয়া আমি উহা আহার করিব ?" (পৃঃ ৫১)

লেখক জানাইয়াছিলেন যে বইখানি বিদ্যালয়ে গৃহীত ও বালকদের উপকারার্থে নিয়োজিত হইলে 'ইহার অন্যান্য ভাগ প্রকাশ করিব এবং শুদ্ধ হিন্দু বালকদিগের জন্য একখানি পৌরাণিক গল্প পুস্তক প্রকাশ করিব। নতুবা এ পথে বিচরণ এই প্রথম ও শেষ।'

বোধ হইতেছে বিচরণ তিনি আর করেন নাই।

সন্দর্ভহার—শ্রীপতি কবিরত্ন ও প্রমথনাথ কাব্যতীর্থ। ১৮৯৬।

"বালকগণের নৈতিক চরিত্র সংগঠিত করিতে হইলে, স্বদেশীয় উপাদান সংগ্রহ করা অতীব প্রয়োজনীয়। স্বদেশের পুরাণ ইতিহাস প্রভৃতিতে বর্ণিত নরনারীর চরিত্র সহজেই হৃদয়মুকুরে প্রতিফলিত হয়। ইহাতে সুকুমারমতি বালকবৃন্দের চরিত্রোৎকর্ষ সাধনে সবিশেষ

সাহায্য হইয়া থাকে"—এই কারণেই পণ্ডিতদ্বয় গ্রন্থখানি সংকলন করিয়াছিলেন। বিষয়সূচীতে শাক্যসিংহের গৃহত্যাগ, একলব্য, বাল্মীকি ও রামায়ণ, পলাশীর যুদ্ধ ও সিরাজদ্দৌলার পরিণাম ও নিমাই সন্ন্যাস প্রভৃতি আছে। ঠিক সাধারণ পাঠ্যগ্রন্থ নয়। লেখনভঙ্গি ও বক্তব্যের মধ্যে নূতনত্বের পরিচয় আছে। যেমনঃ "সিরাজ! তুমি বঙ্গ বিহার উড়িষ্যার মসনদ যেরূপে কলঙ্কিত করিয়াছ, তোমার পূর্ব্বতন কোন নবাব সেরূপ করেন নাই। তুমি আপনার অদৃষ্টলক্ষ্মীকে আপনি পদদলিত করিয়াছ; আপনার পদে আপনি কুঠারাঘাত করিয়াছ। ইতিহাস তোমাকে যেরূপ গভীর কলঙ্ককালিমায় চিত্রিত করিয়াছে প্রকৃতপক্ষে তুমি ততদূর পাপী কিনা জানিনা। আজীবন কারাগারে বদ্ধ থাকাপেক্ষা তোমার মৃত্যুই মঙ্গল, পিঞ্জরাবদ্ধ সিংহের মৃত্যুই প্রার্থনীয়।"

এই সমস্ত বইগুলি আলোচনা করিয়া দেখা যায়, ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ পর্য্যায়ে আসিয়া কেহ কেহ বিদ্যালয়-নিরপেক্ষ শিশু গ্রন্থ রচনা করিলেও ইহার প্রধান প্রবাহটি তখনো শিক্ষাক্ষেত্রের মধ্য দিয়াই প্রবাহিত হইতেছে। তথাপি ইহার মধ্যে সাহিত্যের কলধ্বনিও যে একেবারে শ্রুতিগোচর নয়, এ কথা বলা যায় না। স্বর্ণকুমারী দেবী, কৃষ্ণকুমার মিত্র, রজনীকান্ত গুপ্ত বা হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় যখন পাঠ্যপুস্তক রচনা করেন, তখন নিছক শিক্ষকতাকে ছাপাইয়া তাহাতে সাহিত্যের কিছু আস্বাদ আসিবেই এবং সমকালীন অপরাপর লেখকদিগকেও তাহা প্রভাবিত করিবে। পাঠ্যগ্রন্থের সহিত কখনো একান্তভাবে মিশিয়া গিয়া, কখনো বা পাশাপাশি প্রবাহিত হইয়া ঊনবিংশ শতাব্দীর শিশু-সাহিত্য বিংশ শতাব্দীতে পদক্ষেপ করিয়া নিজস্ব স্বাতন্ত্র্যটি খুঁজিয়া পাইয়াছে।[১]

১। ১২৯৫ সালের মজুমদার লাইব্রেরীর বিজ্ঞাপনে 'বঙ্গসন্তান' এবং 'দুই ভাই' নামে দুইখানি সচিত্র "স্কুলও গৃহপাঠ্য" গ্রন্থের উল্লেখ দেখিতেছি। মনে হয়, ইহারা উপপাঠ্য বা প্রাইজ বই রূপে রচিত হইয়াছিল।

নবম অধ্যায়

বিংশ শতাব্দী : সংক্ষিপ্ত পরিচয়

উনবিংশ শতাব্দীর শিশু-সাহিত্যের একটি পরিক্রমা করা হইল। ইহাতে তিনটি ভাগ সুস্পষ্ট ভাবে দেখিতেছি। দিগ্‌দর্শন হইতে আরম্ভ করিয়া প্রায় চল্লিশ বৎসর যাবৎ শিশুদের জন্য যাহা কিছু রচিত হইয়াছে, সেগুলি শিক্ষার সঙ্গে অবিচ্ছিন্ন ভাবে যুক্ত—প্রত্যেকটি গ্রন্থই বিদ্যালয়ের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া লিখিত। পঞ্চ-তন্ত্র ও হিতোপদেশ প্রভৃতির সরল অনুবাদ, পারস্যের নীতিগল্প, ইংল্যাণ্ড, গ্রীস্‌ ও রোম প্রভৃতি দেশের ঐতিহাসিক ও পৌরাণিক শিক্ষামূলক আখ্যান, চরিতমালা, ঈশপের অনুবাদ, ভারতীয় আদর্শ-চরিত্রের কিছু কিছু উদাহরণ, উপদেশাত্মক দুই চারিটি মৌলিক গল্প—ইহারাই শিশু-সাহিত্যের প্রধান স্থান জুড়িয়া আছে। ইংরেজ মিশনারী ও শিক্ষাব্রতীদের সহিত ভারতীয় শিক্ষক এবং পণ্ডিতেরা এই সময়ের বালকপাঠ্য বইগুলি রচনা করিয়াছেন।

১৮৫১ সালে বঙ্গীয় অনুবাদক সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইলে ইহার দ্বিতীয় স্তর আরম্ভ হইয়াছে। বলিতে গেলে, 'গার্হস্থ্য গ্রন্থমালা'ই প্রথম স্বাধীন শিশু-সাহিত্যের ভিত্তি রচনা করিয়া দিয়াছে। শিশু নারী এবং স্বল্প-শিক্ষিত সাধারণ মানুষের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া 'বিবিধার্থ সংগ্রহ' ও 'রহস্য সন্দর্ভের' পাশাপাশি এই যে গ্রন্থাবলী আবির্ভূত হইল, এগুলি বাংলা সাহিত্যের আলোচনায় এ পর্য্যন্ত উপেক্ষিত হইয়া আসিলেও, অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মধুসূদন মুখোপাধ্যায় ও রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন তাঁহাদের বহু বিচিত্র রচনা-সম্ভারে পারিবারিক সাহিত্যের ভাণ্ডার ভরিয়া দিলেন।

ঈশপ, পঞ্চ-তন্ত্র, তুতিনামার সংকীর্ণ গণ্ডী মধুসূদনই প্রধানতঃ ভাঙ্গিয়া দিলেন—ব্যাপক ভাবে হ্যান্স অ্যাণ্ডারসন, টমাস্ ডে, ইভান ক্রিলভ প্রভৃতি হইতে অনুবাদ করিয়া আমাদের শিশু-সাহিত্যকে বিশ্ব-সাহিত্যের সহিত সংযুক্ত করিলেন। মিশনারী যুগের সহিত সংযুক্ত হইয়াও ইহাকে খানিকটা স্বায়ত্ত-শাসিত বলিতে পারা যায়; বিদ্যাসাগরের নেতৃত্বে ইহা কেবল নূতন সাহিত্যের সূচনাই করে নাই; নূতন ভাষারও দ্বার মুক্ত করিয়া দিয়াছে।

তৃতীয় পর্য্যায় পাইতেছি উচ্চাঙ্গের পত্র পত্রিকাগুলি হইতে। ইংরেজদের হাত হইতে নব-বলদীপ্ত ব্রাহ্ম-সমাজ নেতৃত্ব লইয়াছেন, ১৮৭৮ সালে বালক-বন্ধু প্রকাশিত হইলে এক নব-দিগন্ত উন্মোচিত হইয়াছে। 'সখা' ও 'সাথী' ও 'মুকুল' প্রভৃতি নীতিশিক্ষাকে প্রেরণা রূপে গ্রহণ করিলেও প্রত্যক্ষ ভাবে শিক্ষা-প্রচারের প্রয়াস ক্রমশঃই গৌণ হইয়া অসিয়াছে। স্বাধীন শিশু-সাহিত্য মাথা তুলিয়াছে, ঠাকুর বাড়ীর 'বালক' নামক একটি অসাধারণ মান রচনার প্রয়াস পাইতেছে, দিকপাল লেখকেরা দেখা দিয়াছেন। জাতীয় চেতনার বিকাশ ঘটিয়াছে, চারিদিকেই একটা সম্পূর্ণতার আয়োজন হইয়াছে।

বিংশ শতাব্দীতে 'মুকুল' সগৌরবে চলিতেছে। নব-বিধানের **'প্রকৃতি'** (১৯০৭) বাহির হইতেছে, ঢাকা হইতে সুলেখক অনুকূলচন্দ্র শাস্ত্রীর সম্পাদনায় **'তোষিণী'** (১৯১০, ১৩১৭) নামে একটি সুন্দর পত্রিকা দেখা দিয়াছে। পূর্ব্ব পরিচিত লেখকেরা ক্রমেই পরিণত হইতেছেন, গল্প, কবিতা, ইতিহাস, বিজ্ঞান ও নানা সন্দর্ভে তাঁহারা শিশু-সাহিত্যের ভাণ্ডার ভরিয়া দিতেছেন। হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ পত্রিকার পাতায় যে সমস্ত মজার গল্প লিখিতেছিলেন, সেগুলি গ্রন্থবদ্ধ হইয়াছে **'আষাঢ়ে গল্প'**-(১৯০১)-তে। যোগীন্দ্রনাথ সরকারের **'ছবির বই'** (১৯০২), **'হাসিরাশি'** (১৯০২) এবং **'নূতন ছবি'** (১৯০৩) প্রকাশিত হইয়াছে। যোগীন্দ্রনাথ ইতিমধ্যেই শিশু-

রাজ্য জয় করিয়া ফেলিয়াছেন, ১৯০২ সালে 'খেলার সাথী'র তৃতীয় সংস্করণ আবির্ভূত হইয়াছে। নবকৃষ্ণের 'ছেলেখেলা'র দ্বিতীয় মুদ্রণ হইয়াছে ১৯০৪ সালে। যোগীন্দ্রনাথ ও নবকৃষ্ণের ধারায় আর একজন নূতন শক্তিমান লেখক পদক্ষেপ করিয়াছেন—তিনি মনোমোহন সেন। তাঁহার শিশুচিত্তজয়ী **'খোকার দপ্তর'** (১৯০২) দুই খণ্ডে বাহির হইয়াছে, অল্প পরেই আসিয়াছে **'মোহন ভোগ'**। ১৯০৪ সালে মনোমোহনের **'শিশুতোষ'** বাহির হইয়াছে। উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী প্রাচীন কালের জীবজন্তু লইয়া যে সমস্ত মনোরম প্রবন্ধ লিখিতেছিলেন, সেগুলিকে একত্রে গ্রথিত করিয়া নিজের অঙ্কিত কতকগুলি চমৎকার চিত্রসহ প্রকাশ করিয়াছেন **'সেকালের কথা'** (১৯০৩) নামে। রামায়ণের চরিত্রাবলী অবলম্বনে কিশোরদের উপযোগী করিয়া অপূর্ব্ব ভাষায় দীনেশচন্দ্র সেন রচনা করিয়াছেন তাঁহার **'রামায়ণী কথা'** (১৯০৪)—রবীন্দ্রনাথ একটি অসামান্য মুখবন্ধ লিখিয়া বইখানির গৌরব বাড়াইয়াছেন।'

বাংলা শিশু-সাহিত্যে এতদিন বিশুদ্ধ ভূতের গল্পের কোনও সংকলন চোখে পড়ে নাই, বটতলা হইতে দুই একটি প্রকাশিত হইলেও হইতে পারে। মিশনারীরা এবং বাইবেল ট্রাক্ট্ সোসাইটি ভৌতিক গল্পের কথা কল্পনাও করেন নাই, ব্রাহ্ম শিক্ষাব্রতীরা এই সংস্কারটিকে সযত্নেই পরিহার করিয়াছেন। 'মুকুলে' দু-একটি ভূতের গল্প বাহির হইয়াছে (যেমন হেমেন্দ্র-প্রসাদ ঘোষের 'বলবন্ত সিংহ') কিন্তু সেগুলি মূলতঃ রূপকথা-জাতীয়, ভূত লইয়া কৌতুক সৃষ্টিই তাহার লক্ষ্য। প্রমদাচরণ, ভুবনমোহন বা শিবনাথ যদি বা কালে ভদ্রে এক-আধটি অস্বাভাবিক গল্প ছাপিয়াছেন, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই সসংশয় পাদটীকা যুক্ত করিয়া দিতে বিস্মৃত হন নাই।

বিংশ শতাব্দীতেই কুসংস্কারগ্রস্ত উৎকট ভৌতিক গল্পের আবির্ভাব হইল আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের হাতে। তাঁহার **'ভূত-পেত্নী'** (১৩০৯)

এবং **'রাক্ষস-খোক্কসে'**ই (১৩১০) ইহার সূত্রপাত। দ্বিতীয়টিকে যদি বা রূপকথা বলিয়া মানিয়া লওয়া যায়, প্রথমটি একান্তভাবেই গ্রাম্যতার প্রতিমূর্ত্তি—ইহার স্থূল কাহিনী ও কদাকার চিত্রগুলি বহু বৎসর ধরিয়া শিশু মনে আতঙ্ক সৃষ্টি করিয়াছে। আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের **'সপ্ত আশ্চর্য্য'** (১৯০৩) অবশ্য পৃথিবীর সপ্ত আশ্চর্য্যের বর্ণনা-মূলক একটি সুন্দর বই।

১৩১০ সালে মোহিতচন্দ্র সেন সম্পাদিত কাব্য গ্রন্থাবলীর সপ্তম খণ্ড রূপে দেখা দেয় রবীন্দ্রনাথের **'শিশু'**। ১৩০৯ সালের ৭ই অগ্রহায়ণ কবিগৃহিণী মৃণালিনী দেবী লোকান্তরিতা হন। পত্নীর মৃত্যুর পর পীড়িতা কন্যা রেণুকা এবং পুত্র শমীন্দ্রনাথকে লইয়া রবীন্দ্রনাথ আলমোড়া যাত্রা করেন। সেখানে মাতৃহারা সন্তানদের সান্ত্বনা দিবার মানসে শিশুদের উপযোগী কয়েকটি কবিতা তিনি রচনা করেন এবং প্রভাত সঙ্গীত, কড়ি ও কোমল, ছবি ও গান, সোনার তরী, চিত্রা ও ক্ষণিকা হইতে কতকগুলি কবিতা আহরণ করিয়া 'শিশু' নামে একত্রে গ্রন্থন করেন। 'নদী' ইহার সহিত যুক্ত হয়। রবীন্দ্রনাথের শিশু-কবিতা সম্পর্কে পূর্ব্বেই আমরা কিছু আলোচনা করিয়াছি। শিশুর কল্পনা-প্রবণতার সহিত বাৎসল্যের মমতা-প্রবাহ মিলিয়া ইহা এক স্বতন্ত্র পর্য্যায়ের শিল্প-সৃষ্টি—সর্ব্ব স্তরের পাঠক-পাঠিকার জন্যই ইহার আবেদন। বোলপুর ব্রহ্মাচর্য্যাশ্রমের ছাত্রদের অভিনয়ের জন্য **'মুকুট'** নাট্যরূপে প্রকাশিত হয় ইহার পাঁচ বছর পরে (১৯০৮, ১৩১৫)। 'শিশু ভোলানাথ' সংকলিত হইয়াছিল দীর্ঘ ব্যবধানের পর—১৩২৯ সালে।

ইহার মধ্যে বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলনকে কেন্দ্র করিয়া ১৯০৫ সালে দেশে যেন সমুদ্রের তুফান আসিয়া ভাঙিয়া পড়িয়াছিল। সেই অভূতপূর্ব্ব প্রচণ্ড সংঘাতে বাঙালীর জীবনে যে নবজাগরণ দেখা দিল, তাহাতে তাহার আত্মমর্য্যাদাবোধ উদ্দীপিত হইল, ঐতিহ্য সম্পর্কে অনুসন্ধিৎসা জাগ্রত হইল। রবীন্দ্রনাথের বাংলার মাটি, বাংলার জল,

বাঙালীর হৃদয়ের তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে ঝঙ্কৃত হইতে লাগিল, 'ডান হাতে যাঁর খড়গ জ্বলে বাঁ হাত করে শঙ্কাহরণ'—সেই রুদ্রাণী কল্যাণী দেশ-জননীর 'সোনার মন্দিরে' ভক্ত প্রাণের লক্ষ লক্ষ দীপশিখা জ্বলিয়া উঠিল। সেই আলোকেই উদ্ভাসিত হইল দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদারের বহু যত্ন ও নিষ্ঠার দ্বারা সংকলিত—তাঁহার স্বহস্ত অঙ্কিত চিত্র-গৌরবে সুসজ্জিত, পল্লী বাংলার মর্ম্ম-সৌরভ **ঠাকুরমার ঝুলি** (১৯০৭) :

"পায়ের নীচে কড়ির পাহাড় হাড়ের পাহাড় চুর
রাজপুত্র কে গিয়েছে পাশাবতীর পুর ?
হিল্ হিল্ হিল্ কাল-নিশিতে গর্জ্জে কোথায় সাপ,
রাজার পুরীর ধ্বসল কোথায় হাজার সিঁড়ির ধাপ—"

রবীন্দ্রনাথ একসঙ্গে ইহাকে আশীর্ব্বাদ ও অভিনন্দন জানাইলেন, স্বয়ং ইহার ভূমিকা লিখিয়া গ্রন্থটির মূল্য বাড়াইয়া দিলেন। (দক্ষিণা-রঞ্জন মহিলাপাঠ্য রূপে বাংলার লোক-কথার সংকলন 'ঠাকুরদাদার ঝুলি' প্রকাশ করেন ১৯০৮ সালে।)

আবির্ভূত হইয়াই শিশু-সাহিত্যে মহিমচ্ছটা বিকীর্ণ করিয়া চলিলেন দক্ষিণারঞ্জন। ১৯০৮—১৯০৯ সালে কালীপ্রসন্ন দাসগুপ্তের সহযোগিতায় রচনা করিলেন দুই খণ্ড **'আর্য্যনারী'**—ভারতীয় নারী চরিত্রের মহিমা অতি সুন্দর ভাবে বই দুইখানিতে বর্ণিত হইল। কালীপ্রসন্নের সহযোগে আর একখানি চমৎকার বই তিনি রচনা করিয়াছিলেন, সেখানি **'সচিত্র সরল চণ্ডী'** (১৯০৯)। শিশুদের জন্য মার্কণ্ডেয় চণ্ডীকে গদ্যে পদ্যে ইহাতে পরিবেষণ করা হইয়াছিল এবং প্রচুর রঙীন ছবিও ছিল। ঢাকার 'তোষিণী' পত্রিকায় তাঁহার শিশুপাঠ্য উপন্যাস **'চারু ও হারু'** ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হইতেছিল, ১৯১২ সালে বইখানি দুইখণ্ডে বাহির হইয়া চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করিল। ধনীর সন্তান চারু এবং গরীবের ছেলে হারু—এই দুই জনকে অবলম্বন করিয়া সুশিক্ষার সহিত আনন্দের সংমিশ্রণে ইহা বাংলা শিশু-সাহিত্যে দক্ষিণারঞ্জনের আর একটি স্মরণীয় অবদান

হইয়া দেখা দিল। ডে রচিত 'Sandford and Marten'এর সহিত সূচনায় সামান্য সাদৃশ্য আছে—কিন্তু সমগ্রভাবে ইহা দক্ষিণারঞ্জনের মৌলিক প্রতিভা এবং গল্প-রচনার নিজস্ব কৌশলে সমুদ্ভাসিত।

অন্যান্য লেখকদের মধ্যে কয়েকটি জাপানী উপকথার স্বচ্ছন্দ অনুবাদ করিয়া 'ভারতী সম্পাদক' মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় প্রকাশ করিলেন তাঁহার মনোরম **'জাপানী ফানুষ'** (১৯০৮)।

'বালক' সম্পাদিকা জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর **'টাকডুমাডুম'** ও **'সাতভাই চম্পা'** দেখা দিল ১৯১০-এ। দীনেন্দ্রকুমার রায় পত্র-পত্রিকায় নানাধরণের গল্প লিখিতেছিলেন, সেগুলি একত্রিত হইল **'দানোর দান'** (১৯১৩, ১৩২০)-এ।

১৩১৭ সালের বৈশাখে শিশুদের জন্য একখানি ক্ষুদ্রাকার চমৎকার বই প্রকাশিত হইয়া দুই মাসের মধ্যেই পুনর্মুদ্রিত হয়। বইখানির নাম **'অমৃত'**—লেখক বাণী-কল্যাণী-অভয়ার রচয়িতা কান্তকবি রজনীকান্ত সেন। উপদেশপূর্ণ প্রসঙ্গ লইয়া অনেকগুলি মনোহর ছোট ছোট কবিতার সমাবেশ। রবীন্দ্রনাথের 'কণিকা'র সঙ্গে ভাবগত ঐক্য থাকিলেও কান্ত কবির এই কবিতাগুলি স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যে উজ্জ্বল। বর্ত্তমানকাল পর্য্যন্তও বইখানি আদৃত হইতেছে। "নদী কভু পান নাহি করে নিজ জল" অথবা "প্রভু-ভৃত্য দুইজনে নৌকা বাহি যায়" প্রভৃতি শিশু-সাহিত্যে স্থায়ী হইয়া আছে।

পত্রিকার ক্ষেত্রে 'মুকুলে'র সাফল্যকে অনুসরণ করিয়া আসিল **'শিশু'** নামে আর একটি উচ্চাঙ্গের মাসিক—১৩১৯ (১৯১৩) সালে। মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী ছিলেন ইহার পৃষ্ঠপোষক, সম্পাদনা করিতেন বরদাকান্ত মজুমদার। ছোট আকারের পত্রিকা, কিন্তু বেশ পরিচ্ছন্ন ও রুচিসম্মত। প্রথম সংখ্যায় সম্পাদক জানাইয়াছিলেন, " **'শিশু'** শিশুদের খেলার সাথী—শিক্ষার সহচর। শিশুদিগকে আমোদের সহিত শিক্ষাদান করাই শিশুর উদ্দেশ্য।"

দক্ষিণারঞ্জনের একটি কবিতা দিয়াই পত্রিকাটির সূচনা হইয়াছিল:

শিশু

ওগো

আমরা এসেছি আজ

শিশুর প্রাণ   আমরা এসেছি আজ

সোনার স্বপন   দুটি ভাই বোন্

সোনার দেশের বুকে

হাসিয়া এসেছি মুখে।—ইত্যাদি।

এই পত্রিকাতেই হাসির কবিতার রচয়িতারূপে বিশিষ্ট লেখক হরিপ্রসন্ন দাশগুপ্ত আবির্ভূত হন। তাঁহার 'সোনার দাঁত', 'পান্তা বুড়ী', 'বিদ্যাভূতুম' ও 'সাতখানি পিঠে' প্রভৃতি মজার কবিতা প্রথমে ইহাতেই প্রকাশিত হইয়া পরে তাঁহার কাব্যগ্রন্থ **'রঙ্গিলা'** (১৯১৪)-য় সংকলিত হয়।

যে বৎসর 'শিশু' প্রকাশিত হয়, সেই বৎসরেই **'ধ্রুব'** (১৩১৯) নামে "ছেলে মেয়েদের জন্য সচিত্র মাসিক পত্র" প্রকাশিত হয় বীরেন্দ্রনাথ ঘোষের সম্পাদনায়। বার্ষিক মূল্য ছিল একটাকা চার আনা। প্রথম সংখ্যার প্রথমেই 'মঙ্গলাচরণ' করিয়াছিলেন পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়। লিখিয়াছিলেন : "সেই পুরাণের অপূর্ব্ব সৃষ্টি ধ্রুব আর আমাদের ধ্রুব। আশার মোহময় সূত্রে দুইই সংবদ্ধ। সেই ধ্রুব যাহা শিখাইয়াছে, আমাদের ধ্রুবের তাহাই ইষ্টমন্ত্রের স্বরূপ হইবে। সেই ধ্রুবের যে সাধনা ছিল, আমাদের ধ্রুব সেই সাধনার পথে ধীর পদক্ষেপে অগ্রসর হইবে। সেই ধ্রুবের যাহা আদর্শ, আমাদের ধ্রুবের তাহাই তপস্যার সম্বল।"

আকারে এবং রচনারীতির দিক হইতে 'ধ্রুব' মোটের উপর 'মুকুলে'রই অনুগামী ছিল। ইহাতে প্রচুর পরিমাণে লিখিয়াছেন নবকৃষ্ণ ঘোষ, জলধর সেন ও দীনেন্দ্রকুমার রায় প্রভৃতি ; তাহা ছাড়া

কৃষ্ণবিহারী গুপ্ত, ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, হেমদাকান্ত চৌধুরী, চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিজয়রত্ন মজুমদার, মুনীন্দ্রনাথ ঘোষ ও প্রভঞ্জন দেব ইত্যাদিও ছিলেন। প্রথম বর্ষের ফাল্গুন সংখ্যায় কিশোরীদের জন্য দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের লেখা 'কুৎসা' নামে একটি নাটিকা আছে। দ্বিতীয় বৎসরের আষাঢ় সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথের একটি গান 'তুমি আমাদের পিতা, তোমায় পিতা বলে যেন জানি' ইন্দিরা দেবীকৃত স্বরলিপিসহ প্রকাশিত হইয়াছে, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ স্বরলিপিতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিয়া দিয়াছেন। কাগজটি সুন্দর হইয়াছিল, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে দুই তিন বৎসরের বেশি চলে নাই।

১৩২০ (১৯১৪) সালে দেখা দিল উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরীর সম্পাদনায় দিগ্বিজয়ী **"সন্দেশ"**। সব্যসাচী সম্পাদকের গল্প প্রবন্ধ কবিতা ইত্যাদি তো ছিলই, সেই সঙ্গে তাঁহার আঁকা একবর্ণ ও বহুবর্ণ চিত্রে পত্রিকাটি যেন ঝলমল করিয়া উঠিয়াছিল। দামী কাগজে চমৎকার ছাপা, সরস ও বহু-বিচিত্র রচনার সম্ভারে সমৃদ্ধ এই পত্রিকাখানি হাতে পাইলে আজও বালক-কিশোরের মন খুশিতে ভরিয়া উঠিবে। রচনা এবং অঙ্গসজ্জার গুণে 'সন্দেশ' চির নবীন।

"সন্দেশ এসেছে ঘরে থালা নিয়ে আয়,
খোকা খুকী দাদা দিদি আয়রে ত্বরায়।
এ 'সন্দেশ' টপ করে মুখে পুরে দিলে,
খাইলে পাবিনে রস একেবারে গিলে।
মার কাছে ভাইবোন সকলে বসিয়া
ধীরে সুস্থে মিষ্ট রস লইবে চুষিয়া।
খাজা গজা রসগোল্লা 'আবার খাবার',
বাজারেও মিলিবে না এমন আবার—"

('সন্দেশ,' প্রসন্নময়ী দেবী, ১ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা)

পত্রিকাটি সম্বন্ধে এই আহ্বান যথার্থই প্রযোজ্য।

১৩২০ হইতে ১৩২৭ পর্য্যন্ত উপেন্দ্রকিশোর 'সন্দেশে'র সম্পাদনা করেন, ১৩২৮ হইতে ভারগ্রহণ করেন তাঁহার সুযোগ্য পুত্র বিশ্রুত-কীর্ত্তি সুকুমার রায়। ১৩৩৩ সালে সুকুমার রায়ের অকাল মৃত্যুতে সুবিনয় রায় দায়িত্ব লন। কিন্তু সুকুমারের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই যেন পত্রিকাটিরও প্রাণশক্তি নষ্ট হইয়া গিয়াছিল এবং আর দীর্ঘস্থায়ী হয় নাই। কিছুকাল পরে একবার ইহার পুনর্জ্জীবন ঘটিয়াছিল, কিন্তু তাহা নিতান্তই সাময়িক।

সন্দেশের সর্ব্বাপেক্ষা বিশেষত্ব এই, যে প্রধানভাবে একটি পরিবারের যৌথ সাহিত্য-সাধনাতেই ইহা উদ্ভাসিত হইয়াছিল। এক সঙ্গে এতগুলি প্রতিভার সমাবেশের দিক হইতে রায় পরিবারকে জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারের সঙ্গে তুলনা করা যায়। উপেন্দ্র-কিশোর, সুকুমার রায়, সুবিনয় রায়, কুলদারঞ্জন রায়, সুখলতা রায় (রাও), লীলা রায় (মজুমদার), পুণ্যলতা চক্রবর্ত্তী, দেবব্রত রায়চৌধুরী ইত্যাদি সকলে মিলিয়া ইহাতে যেন একটি নক্ষত্র-মণ্ডলী রচনা করিয়াছিলেন। বাংলা শিশু-সাহিত্যের অনেকগুলি শ্রেষ্ঠ গ্রন্থই 'সন্দেশে'র পাতায় প্রথম দেখা দিয়াছে। সুকুমার রায়ের **'আবোল তাবোল'**-এর আশ্চর্য্য কবিতাগুলি, তাঁহার 'এলিস্ ইন্ ওয়াণ্ডারল্যাণ্ড্'-এর ধরণে লেখা **'হযবরল'**, **'পাগলা দাশু'**র মজার গল্পগুলি এবং **'লক্ষ্মণের শক্তিশেল'** ও **'অবাক জলপান'** নাটক—ইহাতেই আবির্ভূত হইয়াছিল। ১৩৩৩ সালে মৃত্যুর কিছু পূর্ব্বে 'সন্দেশে'র দুই সংখ্যায় **'হেঁসোরাম হুঁশিয়ারের ডায়েরী'** নামে যে ব্যঙ্গাত্মক ভ্রমণ কাহিনীটি বাহির হয়, তাহাই সুকুমার রায়ের শেষ সার্থক রচনা।

১৩২৮, ১৩২৯ ও ১৩৩০ সালে আবার তিনখানি উচ্চাঙ্গের পত্রিকা দেখা দিল। ইহারা যথাক্রমে **মৌচাক, শিশুসাথী** ও **খোকাখুকু**। প্রথমটির নামকরণ করিয়াছিলেন কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, প্রথম সংখ্যায় প্রথম কবিতাটিও তিনিই রচনা করিয়া দিয়াছিলেন। সম্পাদক ছিলেন সুধীরচন্দ্র সরকার—এখনও আছেন। 'শিশুসাথী' ও 'খোকা-

খুকু'র সম্পাদক ছিলেন যথাক্রমে আশুতোষ ধর এবং নিশিকান্ত সেন। 'খোকাখুকু' লুপ্ত হইয়া গিয়াছে, কিন্তু প্রথম দুটি পত্রিকা এখনো সগৌরবে বিদ্যমান।

'মৌচাকে'র পাতায় আবার একটি অসাধারণ লেখকের আবির্ভাব হইল—ইনি হেমেন্দ্রকুমার রায়। ১৩৩০ সালে হইতে তাঁহার সম্পূর্ণ মৌলিক রোমাঞ্চকর উপন্যাস **'যকের ধন'** ধারাবাহিক ভাবে এই পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়া শিশু-সাহিত্যের একটি নবীন প্রবাহ মুক্ত করিয়া দিল। ইহার অনুসরণ করিল পরবর্ত্তী বৈজ্ঞানিক ফ্যাণ্টাসিয়া **'মেঘদূতের মর্ত্ত্যে আগমন'** (মৌচাক, ১৩৩২) এবং **'ময়নামতীর মায়াকানন'** (মৌচাক, ১৩৩৩)। ভাষার সাহিত্যিক সৌন্দর্য্যে এবং গল্প জমাইয়া তুলিবার কুশলতায় হেমেন্দ্রকুমার যেন শিশু-রাজ্যে এইচ, জি ওয়েল্‌স্ এবং স্যার আর্থার কোনান ডয়েলের দ্বৈত-ভূমিকা গ্রহণ করিলেন। বর্ত্তমান বাংলা শিশু-সাহিত্যে গোয়েন্দা কাহিনী ও অ্যাডভেঞ্চার সাহিত্যের পথিকৃৎ হেমেন্দ্রকুমার এবং পরিণত বার্দ্ধক্যেও এখনো শ্রেষ্ঠত্বের আসনে সমাসীন।

হেমেন্দ্রকুমার ছাড়াও উক্ত তিনখানি পত্রিকায় বহু শক্তিমান নবীন লেখক আত্মপ্রকাশ করিলেন, যাঁহাদের অনেকেই বর্ত্তমানে জীবিত আছেন। খোকাখুকুতে প্রথম বৎসরেই নিজের আঁকা ছবির সঙ্গে 'গোঁট্রা মিঞা পাট্রাদার' লিখিয়া দেখা দিলেন সুনির্ম্মল বসু—সুকুমার রায়ের উত্তর-সাধক আসিয়া গেলেন। রূপকথার ইন্দ্রজাল ছড়াইলেন হেমেন্দ্রলাল রায়। সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় রূপকথা লিখিতে লিখিতে **'লাল কুঠি'** (মৌচাক)-র রহস্য-জগতে প্রবেশ করিলেন, শিশু সাথীতে হাসির গল্প উপহার দিতে লাগিলেন নলিনী-ভূষণ দাশগুপ্ত ; যোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের **'কুটকুটের দপ্তর'** শিশু-সাথীর একটি প্রধান আকর্ষণ হইয়া দাঁড়াইল, জুল ভার্ণের অনুবাদ অবলম্বনে রমেশচন্দ্র দাসের **'সাগরিকা'** শিশু মহলকে উতরোল করিয়া তুলিল। সত্যচরণ চক্রবর্ত্তীর গল্প উপন্যাস, নিশিকান্ত সেন ও ফটিক

বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতায় 'খোকাখুকু'র পাতা লোভনীয় হইয়া দাঁড়াইল, কার্ত্তিকচন্দ্র দাশগুপ্ত লৌকিক গল্পের আসর জমাইয়া তুলিলেন। ক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, সুরেন্দ্রনাথ সেন এবং ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় নিয়মিতভাবে ঐতিহাসিক গল্প লিখিতে লাগিলেন। কবিশেখর কালিদাস রায় ও সুকবি কুমুদরঞ্জন মল্লিক নীতিগর্ভ সুন্দর কবিতা লিখিয়া চলিলেন। হাসির গল্প ও উপন্যাসে আরো দেখা দিলেন কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় (জগন্নাথ পণ্ডিত), প্রফুল্লচন্দ্র বসু ও জ্ঞানেন্দ্রনাথ রায় প্রভৃতি।

স্বাভাবিক ভাবেই এই সময়ে অসংখ্য উৎকৃষ্ট শিশুপাঠ্য গ্রন্থ প্রকাশিত হইতে আরম্ভ করে। ১৯০০ হইতে ১৯৩০ সালের মধ্যে উনবিংশ শতাব্দীর ক্ষীণকায়া নির্ঝরিণী পরিপূর্ণা স্রোতস্বিনীর মতো ভরিয়া ওঠে। এই সমস্ত গ্রন্থের কিছু কিছু পরিচয় পূর্ব্বেই দিয়াছি, ১৯৩০ সালের মধ্যে প্রকাশিত আরো কতকগুলি বিশিষ্ট গ্রন্থের নাম উল্লেখ করিলাম ঃ

দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু ঃ কীট পতঙ্গ।

ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ ছড়া ও গল্প, আহ্লাদে আটখানা।

যোগীন্দ্রনাথ সরকার ঃ মজার গল্প, হিজিবিজি, ছবি ও গল্প, আষাঢ়ে স্বপ্ন, ছোটদের রামায়ণ, ছোটদের মহাভারত।

নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য ঃ টুকটুকে রামায়ণ।

উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী ঃ টুনটুনির বই, ছেলেদের মহাভারত।

আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ঃ ছেলে ও ছবি, ছেলে ভুলানো ছড়া, খেলাধুলা, বিশ্ববৈচিত্র্য।

বরদাকান্ত মজুমদার ঃ চিন্তা, দময়ন্তী, সীতা, সুভদ্রা, খোকাবাবুর ক-খ, খুকুরাণীর খেলা।

যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত ঃ ধ্রুব, অর্জ্জুন, অহল্যাবাই, বিজয়কৃষ্ণ, রাণী দুর্গাবতী, কান্তকবি রজনী।

অনুকূলচন্দ্র শাস্ত্রী : নূতন গল্প।

ক্ষীরোদচন্দ্র রায় : শ্রীকৃষ্ণ, শিশুর মহাভারত, রাম লক্ষ্মণ।

রামকমল বিদ্যাভূষণ : ছেলেদের সরল রামায়ণ।

শিবরতন মিত্র : সাঁজের গল্প।

কুলদারঞ্জন রায় : পুরাণের গল্প, রবিন হুড, ইলিয়াড, ওডিসিয়ুস, টালিস্‌ম্যান, টম কাকার কুটীর, অজ্ঞাত জগৎ, কথাসরিৎসাগরের গল্প।

নবকৃষ্ণ ঘোষ : ইলিয়াডের গল্প, ওডিসির গল্প, প্যারীচরণ সরকার।

হেমদাকান্ত চৌধুরী : সচিত্র পুরীর চিঠি।

হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ : রবিনসন ক্রুশো।

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর : রাজ কাহিনী, নালক, খাতাঞ্চীর খাতা।

সত্যচরণ চক্রবর্ত্তী : সাবিত্রী, বামনের দেশ ও দৈত্যপুরী (গালিভার্স ট্রাভেল্‌স্‌-এর অনুবাদ), ঠাকুরমার ঝোলা, ঠাকুরদাদার ঝোলা, দেবব্রত, দাগোবার্ট, সিন্ধবাদ।

সুখলতা রাও : আরো গল্প, গল্পের বই।

কার্ত্তিকচন্দ্র দাসগুপ্ত : সাবিত্রী, টুলটুল।

জগদানন্দ রায় : গ্রহ-নক্ষত্র, মাছ ব্যাঙ সাপ, পোকা মাকড়, গাছ-পালা, বিজ্ঞানের গল্প।

রাজেন্দ্রলাল আচার্য্য : বেলুনে পাঁচ সপ্তাহ, ৮০ দিনে ভূ-প্রদক্ষিণ (দুই খানিই জুল ভার্ণের অনুবাদ), বাংলার প্রতাপ।

দেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য : রাজা রামমোহন, মধুসূদন, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, কৃষ্ণদাস পাল, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, কেশবচন্দ্র, বিবেকানন্দ, ঠাকুর রামকৃষ্ণ, রামদুলাল সরকার, রমেশচন্দ্র দত্ত ও হাজী মহম্মদ মহসীন প্রভৃতি [ক্ষুদ্রাকার সুরচিত জীবনী]।

জলধর সেন : কিশোর (সুশিক্ষামূলক সুন্দর কয়েকটি সামাজিক গল্প), সীতা, হিমাদ্রি, দুঃখিনী।

বিনয়কুমার সরকার : নিগ্রোজাতির কর্ম্মবীর (বুকার টি ওয়াশিংটনের জীবনী)।

সুনির্ম্মল বসু : হাওয়ার দোলা, হুলুস্থুল, টুনটুনির গান।

কালীপ্রসন্ন দাসগুপ্ত : রাজপুত কাহিনী।

অতুলচন্দ্র ঘটক : আশুতোষের ছাত্রজীবন।

যামিনীকান্ত সোম : ছেলেদের বিদ্যাসাগর, ছেলেদের রবীন্দ্রনাথ।

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় : আরব্য উপন্যাস।

রামপ্রাণ গুপ্ত : হজরত মহম্মদ।

সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার : ছেলেদের বিবেকানন্দ।

অমৃতলাল গুপ্ত : ছেলেদের গল্প।

সীতা দেবী ও শান্তা দেবী : হিন্দুস্থানী উপকথা (উপেন্দ্রকিশোরের ছবিতে সুশোভিত)।

সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় : সাঁঝের বাতি।

যোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় : পুরস্কার, হাতেম তাই।

গঙ্গাচরণ দাসগুপ্ত : কলাম্বাস, মার্কো পোলো, ক্যাপ্টেন কুক।

গুরুদাস আদক : কাহিনী।

বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য : মহাভারতের গল্পগুচ্ছ।

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় : রণডঙ্কা, কেল্লা ফতে, শিবাজী মহারাজ (ঐতিহাসিক)।

অনঙ্গচন্দ্র ঘোষ : বীরত্বে বাঙ্গালী, ব্যায়ামে বাঙ্গালী।

নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় : শতাব্দীর সূর্য্য।

শিশিরকুমার মিত্র (সম্পাদক) : গল্পে রামকৃষ্ণ, রামকৃষ্ণের আরো গল্প, রামকৃষ্ণের নতুন গল্প।

সুরেন্দ্রনাথ সেন : অশ্বিনীকুমার দত্ত।

দুর্গামোহন মুখোপাধ্যায় : টলস্টয়ের গল্প, ঋষি টলস্টয়।

চন্দ্রকান্ত দত্ত সরস্বতী : কালকেতু, চাঁদ সদাগর, শ্রীমন্ত।

উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য : পৃথিবীর আশ্চর্য্য।

পূর্ব্বে উল্লিখিত বইগুলি এবং এই নির্ব্বাচিত তালিকা হইতে দেখা যাইবে, বিংশ শতাব্দীর ত্রিশ দশকের মধ্যেই বাংলা শিশু-সাহিত্য কী বিপুল ঐশ্বর্য্যে ভরিয়া উঠিয়াছে। গল্প, উপন্যাস, বিজ্ঞান, ইতিহাস, জীবনী, কবিতা, রূপকথা, ছড়া এবং রাশি রাশি অনুবাদ বাঙালী শিশুর সম্মুখে যেন রাজ-ভাণ্ডারের দ্বার মুক্ত করিয়া ধরিয়াছে। লেখকদের মধ্যেও এমন অনেকেই আবির্ভূত হইয়াছেন, যাঁহারা পৃথিবীর যে-কোনো দেশে জন্মিয়াই খ্যাতি ও গৌরবের অধিকারী হইতেন।

ইতোমধ্যে 'রামধনু,' 'সাজি,' 'মাস পয়লা,' 'রং মশাল' প্রভৃতি নূতন নূতন পত্রিকা দেখা দিয়াছে এবং শিশু-সাহিত্যে নবীন লেখকদের পদক্ষেপ ঘটিতেছে। মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, সরোজকুমার রায় চৌধুরী, নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, বুদ্ধদেব বসু, শিবরাম চক্রবর্ত্তী, অখিল নিয়োগী, ধীরেন্দ্রলাল ধর, বিমলকুমার ঘোষ (মৌমাছি), চারুচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়, ননীগোপাল চক্রবর্ত্তী, প্রভাতকিরণ বসু, প্রভাবতী দেবী সরস্বতী, শৈলবালা ঘোষজায়া, ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, নীহাররঞ্জন গুপ্ত, মণীন্দ্র দত্ত, আশাপূর্ণা দেবী, শশিভূষণ দাশগুপ্ত, লীলা মজুমদার, খগেন্দ্রনাথ মিত্র, ইন্দিরা দেবী, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ও বিশু মুখোপাধ্যায় প্রমুখ লেখকেরা বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত শিশু-সাহিত্যের সেবা করিয়া চলিয়াছেন। ইঁহাদের মধ্যে কয়েকজন লোকান্তরিত হইয়াছেন, অবশিষ্ট সকলেরই লেখনী সজাগ হইয়া আছে। ইঁহারা অনেকেই বয়স্কদের সাহিত্যে স্বনামধন্য কিন্তু শিশু-পাঠকদেরও যে ইঁহারা উপেক্ষা করিয়া দূরে সরাইয়া রাখেন নাই, ইহাই সবিশেষ আনন্দের কথা।

বিংশ শতাব্দীর শিশু-সাহিত্যের একটি সংক্ষিপ্ত রূপরেখা দেওয়া হইল। ইহা আমাদের মূল আলোচনার অন্তর্গত নয়, কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীতে যে সাধনা পূর্ব্বাচার্য্যগণ আরম্ভ করিয়াছিলেন, তাহার

একটি মোটামুটি পরিণাম ফল ইহার মধ্যে লক্ষিত হইবে বলিয়া মনে করি। বিংশ শতাব্দীর কালবৃত্ত এখনও সম্পূর্ণ হয় নাই, তাহার সম্যক্ মূল্যায়ন ও পূর্ণাঙ্গ পরিচিতির দায়িত্ব ভবিষ্যৎই গ্রহণ করিবে।

কিন্তু আধুনিক বাংলা শিশু-সাহিত্যের দিকে চাহিয়া একটি বিশেষ প্রবণতা যে-কোনো সাধারণ পাঠককেও কিছু পরিমাণে বিচলিত করিয়া তুলিবে বলিয়া মনে হয়। শিশুদের পাঠযোগ্যতার দিক হইতে গোয়েন্দা-কাহিনী ও রোমাঞ্চকর গল্পের সার্থকতা লইয়া বিতর্কের অবকাশ আছে। এইগুলিকে শোভন ও পরিমিতভাবে পরিবেষণ করিলে হয়তো অভিযোগের তেমন কারণ ঘটে না, কিন্তু এই জাতীয় সাহিত্যের অতি-বিস্তার এবং রচনার মানের ক্রমাবনতি আজ আশঙ্কার কারণ হইয়া উঠিয়াছে। এই পর্য্যায়ের নিকৃষ্ট রচনা শিশু মনের যে কী অপরিসীম ক্ষতি সাধন করে এবং তাহাদের মূল্যবোধ ও কল্পনা-শক্তিকে কিভাবে নষ্ট করিয়া দেয়—তাহার বিবরণ অনাবশ্যক। মাত্র এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে আমেরিকায় বর্ত্তমানে শিশু অপরাধীর সংখ্যাধিক্য প্রধানভাবে ঘটিয়াছে অযোগ্য ও আদর্শহীন লেখকদের তথাকথিত অপরাধ-সাহিত্যের মাধ্যমেই। বাংলা শিশু-সাহিত্যের যে ইতিহাস বিদ্যাসাগর, মধুসূদন মুখোপাধ্যায় ও প্রমদাচরণ সেনের সাধনার আজ সহস্র শাখা বিস্তার করিয়া মহীরুহের গৌরবে দাঁড়াইয়াছে, তাহার মর্ম্মকেন্দ্রেও যাহাতে অনুরূপভাবে মৃত্যুবিষ সঞ্চারিত হইয়া না যায়, সেই জন্যই বর্ত্তমানের Crime এবং Horror Story-গুলি সম্পর্কে আমাদের কিছু সতর্ক থাকা উচিত।

দশম অধ্যায়

॥ ১ ॥

ইয়োরোপ ও আমেরিকা

উনবিংশ শতাব্দীতে আধুনিক বাংলা-সাহিত্যের একটি ক্রম-বিবর্ত্তন আমরা দেখিয়াছি। বিংশ শতাব্দীতে আসিয়া ইহা নিজেকে সম্পূর্ণ শক্তিতে বিকশিত করিয়া তুলিয়াছে এবং এই একশ বছর ধরিয়া প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে ইয়োরোপীয় শিশু-সাহিত্যের নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করিয়াছে। উনিশ শতকের প্রথম হইতেই ঈশপ অনূদিত হইতেছেন 'সাথী'র প্রথম সংখ্যায় যোগীন্দ্রনাথ বসু বা চিরঞ্জীব শর্ম্মা 'Reynard the Fox'-এর আংশিক অনুবাদ করিয়াছেন; বলিতে গেলে ভারতবর্ষে সর্ব্বপ্রথম হ্যান্স অ্যাণ্ডার-সনকে আমদানি করিয়াছেন মধুসূদন মুখোপাধ্যায়। অবনীন্দ্রনাথ সহজ ভাবেই 'Peter Pan' ও 'Tom Thumb' হইতে ঋণ গ্রহণ করিয়াছেন। অন্যান্য অসংখ্য অনুবাদ তো আছেই।

সুতরাং বাংলা শিশু-সাহিত্যের পাশাপাশি পাশ্চাত্য শিশু-সাহিত্যের একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস আমরা উদ্ধৃত করিব। আরো একটি কারণ আছে। ইয়োরোপ ও আমেরিকার তথা পৃথিবীর যাহা শ্রেষ্ঠ শিশু-সাহিত্য, তাহাও উনবিংশ শতাব্দীতেই গড়িয়া উঠিয়াছে।

আমাদের 'পঞ্চ-তন্ত্রের' মতো ইয়োরোপেও ঈশপের নামে প্রাণীমূলক নীতি-কথা স্মরণাতীত কাল হইতেই চলিত ছিল। Reynard নামে এক ধূর্ত্ত শিয়াল—যে সিংহরাজকে ফাঁকি দিয়া অন্যায়ের জোরে বহু সৌভাগ্যের অধিকারী হইল এবং অবশেষে অতি বুদ্ধির ফলে যার পতন ঘটিল, ইয়োরোপের সর্ব্বত্রই বহুলভাবে

প্রচারিত এই Animal Epic-টিও খুবই জনপ্রিয় ছিল। তাহার সহিত বিভিন্ন দেশের রূপকথা ও ঘুমপাড়ানি গান (Nursery Rhymes) তো ছিলই।

পঞ্চদশ শতাব্দীতে ইংল্যাণ্ডে (Caxton) ক্যাক্‌স্‌টন প্রথম মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন করেন এবং তাঁহার মুদ্রিত বইগুলির মধ্যে 'Reynard the Fox' (১৩৩১) এবং ঈশপের গল্পাবলী (১৩৩৪)-ও ছিল।

পরবর্ত্তী কালে ধীরে ধীরে 'গাই অফ ওয়ারউইক' (Guy of Warwick), রবিন হুড্ এবং রাজা আর্থারের গোল টেবিলের গল্পগুলি আসিতে আরম্ভ করে এবং এইগুলির সাহায্যেই ইউরোপে শিশু-সাহিত্যের ভিত্তিভূমি রচিত হইয়া যায়।

১৬৬৮, ৭৩ ও ৯৩ সালের মধ্যে ফ্রান্সে লা ফঁতেন (La Fontaine) তাঁহার বিখ্যাত Fables প্রকাশ করেন। ইহার গল্পগুলি ঈশপের উপর ভিত্তি করিয়াই রচিত হইয়াছিল। কিন্তু কল্পনার ঐশ্বর্য্যে ও কবিতার ছন্দে এগুলি নিজস্ব শিল্পরূপ গ্রহণ করে এবং প্রচুর পরিমাণে সমাদৃত হয়।

১৬৭৮, ১৭১৯ এবং ১৭২৬ সালে ইংল্যাণ্ডে এমন তিনখানি বই প্রকাশিত হয়—যাহাদের সঙ্গে শিশু-সাহিত্যের বস্তুতঃ কোন সম্পর্কই ছিল না। ইহারা হইল যথাক্রমে জন বুনিয়ানের (Bunyan) "The Pilgrim's Progress", ড্যানিয়েল ডিফোর (Defoe) রবিন্‌সন ক্রুশো এবং জোনাথান সুইফ্‌টের (Swift) এর গালিভারস্ ট্রাভেল্‌স্। বুনিয়ান তাঁহার রূপক উপন্যাসে আধ্যাত্মিক তত্ত্ব ফুটাইতে চাহিয়াছেন; ডিফো আলেক্‌জাণ্ডার সেলকার্কের অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করিয়া নির্জ্জন দ্বীপে এক নিঃসঙ্গ নাবিকের অজ্ঞাতবাসের দীর্ঘ দৈনন্দিন চিত্র আঁকিয়াছেন এবং জীবন ও জগতের উপর নানা কারণে বীতশ্রদ্ধ হইয়া রুদ্ধদ্বার কক্ষে বসিয়া মনের সমস্ত তিক্ততা কঠোর ব্যঙ্গের সাহায্যে সুইফ্‌ট গালিভারের ভ্রমণ কাহিনীর

মধ্যে ঢালিয়া দিয়াছেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও শিশুমন এগুলিকে পরম কৌতূহলে আকর্ষণ করিয়া লইল। তাহারা বুনিয়ানের তত্ত্ব বুঝিল না—রবিনসন্ ক্রুশোর তুচ্ছাতিতুচ্ছ বিষয়ের বর্ণনাগুলি তাহাদের উপভোগ্য মনে হইল এবং সুইফ্‌টের আন্তরযন্ত্রণাময় প্রতীক কাহিনী তাহাদের উদ্দাম কল্পনার খোরাক যোগাইল। প্রসঙ্গতঃ স্মরণীয় ১৬০৫ সালে স্প্যানীশ লেখক মিগুয়েল জে সাভেদ্রা সারভেন্টিস্ (Cerventes) রোমান্স-সাহিত্যকে ব্যঙ্গ করিয়া যে ডন কুইকসোট্ (Don Quixote) রচনা করিয়াছিলেন তাহার অন্তর্নিহিত তাৎপর্য্য উপেক্ষা করিয়া শিশু-কিশোরের দল ডন্ কুইকসোট্ এবং সাঙ্কো পাঞ্জার অদ্ভুত অভিযানের কাহিনী পরমানন্দে আত্মসাৎ করিয়াছিল।

রূপকথা সাহিত্যের সংকলন ইউরোপে প্রথম করেন ফ্রান্সের চার্লস পেরো (Perrault) ১৬৯৮ সালে। সঙ্গে সঙ্গেই ইংরাজীতে ইহার অনুবাদ হয় এবং ইয়োরোপের সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়ে। বিশ্ব-সাহিত্যের অনেকগুলি শ্রেষ্ঠ রূপকথা পেরোর কল্যাণেই আমরা লাভ করিয়াছি। ইহাদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য 'Cinderella', 'Puss-in-Boots' এবং 'Blue Beard'।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে অলিভার গোলড্‌স্মিথ (Goldsmith) "Goody Two Shoes" নামে চমৎকার একটি আখ্যান প্রকাশ করেন। নীতিধর্ম্মী হইলেও গল্পটি সুন্দর ও হৃদয়-গ্রাহী। ইহার কাছাকাছি সময় ইংরাজী শিশু-ছড়ার একটি সংকলন আত্মপ্রকাশ করে—"Mother Goose's Melody"। এই জাতীয় ছড়া-গ্রন্থের এইটিই প্রথম এবং অতি মূল্যবান সংগ্রহ; সম্ভবতঃ সংকলনটি করিয়াছিলেন গোলড্‌স্মিথ্।

উনবিংশ শতাব্দীতে শিশু-সাহিত্যের স্বর্ণযুগ সূচিত করিয়া দেন ভ্রাতা-ভগ্নী চার্লস ও মেরী ল্যাম্ (Lamb) তাঁহাদের "Tales form Shakespeare"—এর সাহায্যে। অমর নাট্যকারের নাটকের কাহিনীগুলিকে ইঁহারা ছোটদের মতো করিয়া এমন সুন্দর

ভাবে সংক্ষেপে সরস ভাষায় সাজাইয়া দিয়াছেন যে ইহাদের মাধ্যমে শিশু-মন যে মাত্র শেক্‌সপীয়ারের মহত্ত্ব সম্পর্কে সচেতন হয় তাহাই নয়—গল্প পড়িবার এমন আর একটি আনন্দ লাভ করে, যাহার কৃতিত্ব একান্তভাবে মেরী এবং চার্লস ল্যামেরই প্রাপ্য। চার্লস গ্রীক কবি হোমারের ওডিসির উপর ভিত্তি করিয়া Adventures of Ulysses লেখেন, শিশু-সাহিত্যে ইহাও তাঁহার একটি বিশিষ্ট দান।

১৮১২-২৪ সালের মধ্যে আর একটি অসামান্য রূপকথার সংকলন প্রকাশিত হয়। এই বইখানি জার্ম্মান রূপকথার সঞ্চয় "Kinder-märchen" (ছোটদের জন্য ঘরের গল্প)—সংগ্রহ করেন জার্ম্মানীর দুই বিশিষ্ট ভ্রাতা জ্যাকব লুডভিগ্‌ কার্ল গ্রিম এবং ভিলহেল্‌ম্‌ কার্ল গ্রিম (Grimm)। দুইজনেই প্রসিদ্ধ ভাষাবিজ্ঞানী। ইঁহাদের গ্রিম সূত্র (Grimm's Law) আজও ভাষাতত্ত্বের ছাত্রদের পড়তে হয়। এই ভাষাতত্ত্বের গবেষণা প্রসঙ্গেই জার্ম্মান রূপকথার অপূর্ব্ব সংগ্রহটি প্রকাশ করিয়া ইঁহারা সমস্ত ইয়োরোপকে মাতাইয়া দেন। দেখিতে দেখিতে ইয়োরোপের সমস্ত ভাষায় গ্রিমের রূপকথা ছড়াইয়া পড়ে—আমাদের বাংলা-সাহিত্যেই ইহার একাধিক অনুবাদ লভ্য। ইয়োরোপের শিশুদের মুখে মুখে The Goose Girl-এর ছড়া ঘুরিতে থাকে—

"Blow, blow thou wind
Blow Conrad's hat away,
Till I have combed my hair
And tied it up behind."

বাংলা দেশে গ্রিমের রূপকথা পুস্তকাকারে অনুদিত হয়তো তখনও হয় নাই, কিন্তু তাহার প্রভাব কতখানি পড়িয়াছিল, তাহা ১২৯৮ সালে লেখা রবীন্দ্রনাথের 'বিম্ববতী' (সোনার তরী) কবিতা

হইতেই বোঝা যায়। ইহা একেবারে "Little Snow-White" —এর প্রত্যক্ষ প্রভাবে রচিত :

"Oh, mirror, mirror on the wall
Who is the fairest of us all?
Thou wert the fairest, Lady queen;
Snow-white is fairest, now I ween".

"সুবর্ণ মুকুর রাখি কোলের উপরে
শুধাইল মন্ত্র পড়ি—কহ সত্য করে
ধরামাঝে সব চেয়ে কে আজি রূপসী
দর্পণে উঠিল ফুটে সেই মুখশশী"। (বিম্ববতী)

ইহার পরে ডেনমার্কে এই যুগের শ্রেষ্ঠ শিশু-সাহিত্য স্রষ্টার আবির্ভাব ঘটে। ইনি হ্যানস্ ক্রিশ্চিয়ান অ্যাণ্ডারসন্। ১৮৩৫ সালে তাঁহার অনন্য রূপকথার প্রথম সংগ্রহ প্রকাশিত হয়। শিশু-সাহিত্যের মধ্যেও নিত্যকালের জীবন সত্যকে কিভাবে প্রতিফলিত করা যায়—শিশুর মনকে জাহুমন্ত্রের স্পর্শ দিয়া কেমন করিয়া জীবন-রহস্যের গভীরে উত্তীর্ণ করিয়া দিতে পারা যায়—হ্যান্স অ্যাণ্ডারসন্ তাহার প্রমাণ। তাঁহার 'The Ugly Duckling', 'The Wild Swans', 'The Tinder box' অথবা 'The little Mermaid' —বলিতে গেলে বিশ্বজয় করিয়াছে। গার্হস্থ্য গ্রন্থমালায় মধুসূদন মুখোপাধ্যায় তাঁহার "কুৎসিত হংসশাবক" ও "মারমেত বা মৎস্য-নারীর উপাখ্যান" যথাক্রমে অ্যাণ্ডারসনের 'The Ugly Duckling' এবং 'The Little Mermaid' হইতেই অনুবাদ করিয়াছিলেন অর্থাৎ গল্পগুলি প্রকাশিত হওয়ার কুড়ি-বাইশ বছরের মধ্যেই তাহারা বাংলাদেশে আ সয়া গিয়াছিল। অ্যাণ্ডারসন্ তাঁহার আত্মজীবনী, "The Story of My life" গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা

হইতেই আধুনিক শিশু-সাহিত্য সম্রাটের সোনার কাঠির সন্ধান মিলিবে।

ইহারই কাছাকাছি সময়ে [redacted] বিখ্যাত চিন্তানায়ক ও প্রাবন্ধিক জন রাস্‌কিনের (Ruskin) 'The King of the Golden River" বাহির হয়। এই অতুলনীয় নীতিগর্ভ রূপকথাটিও দিগ্বিজয় করিয়াছে—এই গল্পের বামনটিকে স্বপ্নে দেখে নাই ইংরাজী-ভাষী এমন শিশু কমই জন্মিয়াছে।

১৮৪৬-এ একখানি খেয়াল-খুশি কবিতার অদ্ভুত বই লেখেন এডওয়ার্ড লীয়ার—"The Book of Nonsense"। কবিতাগুলি 'লিমারিক'। অপূর্ব্ব ছন্দে, মাত্র পাঁচটি লাইনের মধ্যে একটি খেয়ালী কল্পনার রূপদানই ইহার বৈশিষ্ট্য। এগুলি পড়িয়া মুগ্ধ রাস্‌কিন বলিয়াছিলেন, "I should place himself first of my hundred authors"। Nonsense Rhyme-এর প্রকৃষ্টতম উদাহরণ লীয়ারের লিমারিকগুলি। দু-একটির নমুনা :

"There was an Old Person of Anerly
Whose conduct was strange and unmannerly
He rushed down the strand
With a pig in each hand,
But returned in the evening to Anerly."

অথবা

There was on Old Man who said
"How shall I flee from that horrible cow ?
I will sit on this stile,
and continue to smile,
Which may soften the heart of the cow."

কিছুকাল আগে ইহারই অনুকরণে গুরুসদয় দত্ত "ভজার বাঁশী" লিখিয়াছিলেন। সুকুমার রায়ের কতগুলি টুকরো কবিতা—

যেমন "দাদাগো দাদা, হুগলী গেলুম" প্রভৃতিও লীয়ারের দ্বারাই প্রভাবিত হইয়াছে।

প্রাচীন গ্রীসের দেবদেবীদের লইয়া সুন্দর দুখানি গল্পের বই রচনা করেন আমেরিকার প্রখ্যাত কথাশিল্পী ন্যাথানিয়েল হথর্ণ (Howthorne)। ইহাদের একখানি "The Wonder Book" (১৮৫২), অপরখানি "Tanglewood Tales" (১৮৫৩)। ইহারই ধারায় ইংলণ্ডের "Westward Ho!"র প্রথিতযশা লেখক চার্লস্ কিংসলি (Kingsley) রচনা করেন—"The Heroes", কিন্তু কিংসলির শিশু-সাহিত্যে শ্রেষ্ঠ দান তাহার "The Water Babies" (১৮৬৩)। রূপকথার সঙ্গে প্রকৃতির সমাবেশ ঘটাইয়া কিংসলি "The Water Babies"কে স্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছেন।

অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্ক-শাস্ত্রের বিশিষ্ট অধ্যাপক রেভারেণ্ড চার্লস লাটউইজ ডজসন (Dodgson) ছিলেন ভীরু শান্ত প্রকৃতির মানুষ—লোকের সঙ্গে আলাপ-ব্যবহারে তাঁহার মুখে কথা আটকাইয়া যাইত, তোতলামি আসিত। কিন্তু চিরকুমার এই মুখচোরা লাজুক মানুষটি শিশুদের জগতে আসিলে তাঁহার চেহারাই বদলাইয়া যাইত। বিশ্ববিদ্যালয়ের ডীন এইচ-জি-লিডেলের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে তাঁহার বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল, বিশেষ করিয়া ছোট এলিস্ লিডেল (Alice Liddel)-কে তিনি অত্যন্ত পছন্দ করিতেন। গ্রীষ্মের মধুর দিনগুলিতে নদীর ধারে ঘাসের মধ্যে বসিয়া শিশুদের যে গল্প তিনি মুখে মুখে রচনা করিয়া শোনাইতেন, তাহাই যখন লুই ক্যারলের (Lewes-Carrol) স্বাক্ষরে 'Alice in Wonderland' (১৮৬৫) নামে আত্মপ্রকাশ করিল, তখন শিশু জগতে হুলুস্থুলু পড়িয়া গেল।

আকারে ক্ষুদ্র, কিন্তু মহিমায় 'অ্যালিস্ ইন্ ওয়াণ্ডারল্যাণ্ড' এপিক। ইহার পরিচয় দিবার কিছু নাই। মধ্যাহ্ন-স্বপ্নের শৃঙ্খলে গাঁথা এই স্বপ্নরাজ্য অমর হইয়া আছে—অমর হইয়াই থাকিবে।

এমার্সনের ভাষায় "All children from six to sixty" এই বই পড়িতে বসিয়া সাদা খরগোসের পিছনে পিছনে বিচিত্র জগতে গিয়া উপস্থিত হয়; Mad Tea-Partyতে যোগদান করে এবং ডাচেসের মুখে সেই অদ্ভুত ঘুমপাড়ানি গান শোনে:

"Speak roughly to your little boy
And beat him when he sneezes ;
He only does it to annoy
Because he knows it teases".

বাংলা-সাহিত্যে সুকুমার রায়ের 'হ য-ব-র-ল' এই বইখানির প্রত্যক্ষ প্রভাবেই রচিত।

১৮৭১ সালে ক্যারলের "Alice through the Looking Glass" প্রকাশিত হয়। ওয়ান্ডারল্যাণ্ডের মত অত জনপ্রিয় না হইলেও উৎকর্ষে ইহাকেও কোন অংশে হীন বলা যায় না।

অ্যামেরিকার লুইসা-এম-অ্যালকট্ (Alcott)" "Little Women" নামে বইখানি লেখেন ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে। ঘরোয়া জীবনের স্নিগ্ধ উপস্থাপনায় ও শিশু-মনস্তত্ত্বের ব্যাখ্যায় 'Little Women' শিশু-সাহিত্যের একখানি শ্রেষ্ঠ বই।

১৮৭৬ সালে মার্কিনী সাহিত্যের অন্যতম মহান প্রতিভা মার্ক টোয়েন (Twain) ছোটদের দু'খানি ক্লাসিক বই উপহার দেন: "The Adventures Tom Sawyer" এবং "Hurklberry Finn"। দ্বিতীয়টিকে প্রথমটির উত্তরপর্ব্ব বলা যাইতে পারে। নিজের বাল্য-জীবনের অনেকখানি সত্য-স্মৃতির উপর নির্ভর করিয়া টম এবং হাক্‌লবেরী নামে দুটি দুরন্ত কিশোরের যে অভিযান-কাহিনী রোমাঞ্চ ও কৌতুকের সঙ্গে লেখক পরিবেষণ করিয়াছেন, তাহারা মহৎ প্রতিভার মহৎ সৃষ্টি। শিশু-সাহিত্যের সমগ্রতার কথা বলা যায় না কিন্তু কিশোর-সাহিত্যে ইহারা পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাস। এবং, আমেরিকার মহত্তম উপন্যাস-

গুলির মধ্যে এই দুখানিও স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে। মার্ক টোয়েনের স্বভাবসিদ্ধ কৌতুকপ্রবণতার সহিত জীবন-রহস্যের গভীরতার সংযোগ ইহাদের মধ্যে ঘটিয়াছে; বংশগত বিদ্বেষের ভয়াল পরিণাম হইতে লিঞ্চিং-এর বীভৎসতা, নিগ্রো দাস-জীবনের করুণ ছবি—সবই আশ্চর্য্যভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। বিশেষ করিয়া হাক্ ফিনের মত একটি বখাটে ছেলেকে যে ভাবে স্নেহ ও মমতা দিয়া নব-জীবনের মধ্যে প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে তাহা একমাত্র প্রথম শ্রেণীর ঔপন্যাসিকের পক্ষেই সম্ভব।

১৮৮১ সালে রবার্ট লুই ষ্টিভেনসনের (Stevenson) 'Treasure Island' প্রকাশিত হইয়া অ্যাড্ভেঞ্চার সাহিত্যের উৎস-প্রবাহ মুক্ত করিয়া দেয়। রবিনসন্ ক্রুশোয় যাহার সূত্রপাত ঘটিয়াছিল এবং ১৮৫৭ সালে আর-এম্ ব্যালাইন্টাইন (Ballantyne) 'Coral Island' ও 'Gorilla Hunturs' (বই দুইখানি খুব আদর পাইয়াছিল) লিখিয়া বিঘ্ন-বিপদের মধ্য দিয়া দূর-দূরান্তের অজানা দেশে অভিযানের যে উন্মাদনা কল্পনা-প্রবণ কিশোর চিত্তে জাগাইয়া দিয়াছিলেন, তাহারই পূর্ণ প্রকাশ ঘটিল স্টিভেনসনের 'রত্নদ্বীপে'।

পৃথিবীর শিশু-সাহিত্যের পাঁচখানি শ্রেষ্ঠ বই বাছিতে হইলেও এখানি তাহাদের মধ্যে স্থান পাইবে। এইটি সম্বন্ধে বলিবার কিছুই নাই—Long John Silver এবং তাহার তোতা পাখীটি সমস্ত দেশের পাঠক-চিত্তে চিরন্তন হইয়া আছে। ইহার ধারা অনুসরণ করিয়া পৃথিবীতে হাজার হাজার বই লেখা হইয়াছে, কিন্তু ট্রেজার আইল্যাণ্ডকে কেহ অতিক্রম করিতে পারিয়াছে কিনা সন্দেহ। ১৮৮৮ সালে প্রকাশিত অত্যাচারী জমিদার-তন্ত্রের বিরুদ্ধে শোষিত জন-সাধারণের সংগ্রাম 'Black Arrow' নামে আর একটি ইতিহাসাশ্রিত রোমাঞ্চকর কিশোর উপন্যাসে স্টিভেন্সন লিপিবদ্ধ করেন। ১৮৮৬ সালে প্রকাশিত তাঁহার 'Kidnapped' বয়স্কদের জন্য লেখা হইয়াও বালক-বালিকা মহলেই প্রধানতঃ স্থান করিয়া

লইয়াছে। ফরাসী লেখক জুল ভার্ণের বিজ্ঞান-নির্ভর উপন্যাসগুলিও এই ভাবেই তরুণ-সাহিত্যে আসিয়া গিয়াছে।

কিশোর-জীবনের আর একটি অপূর্ব্ব দিকের উপর আলোকপাত করে ১৮৮৫ সালে টমাস্ হিউয়েসের (Hughes), 'Tom Brown's School Days'। ডিকেন্সের নিকোলাস্ নিকেলবি অথবা ল্যামের "Eassys of Elia" প্রভৃতি নানা গ্রন্থে প্রসঙ্গতঃ উনিশ শতকের স্কুল-জীবনের ছোটখাটো ছবি ফুটিয়াছে বটে, কিন্তু ইহাই প্রকৃতপক্ষে "The First great School Story"। স্কুল-জীবনের অতি-বাস্তব চিত্রটির মধ্য দিয়া হিউয়েস্ আদর্শবাদ, পৌরুষ, সত্যনিষ্ঠা, অত্যাচারী প্রবলের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, দুর্ব্বলকে রক্ষা করা, বন্ধুত্বের স্বরূপ এবং সব মিলিয়া একটি উন্নত চরিত্র-গঠনের নির্দেশ দিয়াছেন।

ইংলণ্ডের স্বনামধন্য নাট্যকার, সমালোচক ও ঔপন্যাসিক অস্কার ওয়াইলড্ ১৮৮৮ এবং ১৮৯১ সালে তাঁহার দুখানি রূপকথার সংকলন করেন। ছোটদের জন্য নামতঃ লেখা হইয়াও এগুলি রূপক-ব্যঞ্জনায় সর্ব্বকালের সাহিত্যের গৌরবে উত্তীর্ণ হইয়াছে। এই বই দুটি "The Happy Prince" এবং "The House of Pomegranates"। অপূর্ব্ব কাব্যমণ্ডিত ভাষায়, রচনার পরিপাট্যে এবং গূঢ়ার্থের গৌরবে এগুলি অপূর্ব্ব শিল্পবস্তু। তাঁহার "The Selfish Giant" অথবা "The Nightingle and the Rose" উৎকৃষ্টতম পর্য্যায়ের ছোট গল্পের নিদর্শন। ছোটরা ইহা পড়িয়া রূপকথার আনন্দ পায়, বড়রা ইহা হইতে মহত্তর সত্যের সন্ধান পান। কিছুকাল পূর্ব্বে বাংলা সাহিত্যে বুদ্ধদেব বসু অস্কার ওয়াইল্ডের কয়েকটি গল্পের অত্যন্ত সুন্দর অনুবাদ করিয়াছেন।

১৮৯২ সালে ইতালীয় লেখক কার্লো লরেন্জিনি (Lorenzini) কার্লো কলোদী (Collody) ছদ্মনামে একখানি বিশ্বজয়ী শিশু-গ্রন্থ রচনা করেন "The Adventrues of Pinocchio"। খেয়ালী কল্পনার দিক হইতে অ্যালিস্ ইন্ ওয়াণ্ডারল্যাণ্ডের পাশেই

'পিনোচ্চিয়ো'র স্থান। একটি কাঠের পুতুল প্রাণ পাইয়া কি ভাবে নানা অঘটন ঘটাইল, এবং অসংখ্য অ্যাডভেঞ্চারের মধ্য দিয়া পরীর নির্দ্দেশে কেমন করিয়া একটি ভালো ছেলেতে পরিণত হইল—গল্পের স্বপ্নজাল বুনিয়া কালোদী সেইটিই বিবৃত করিয়াছেন। আপাতঃ-দৃষ্টিতে এলিসের সমধর্ম্মী হইলেও পিনোচ্চিয়ো মাত্র Fantasy-ই নয়, ইহার অন্তরালে নীতি-শিক্ষার একটি প্রবাহও বহমান। কলোদীর বৈশিষ্ট্য এই, তাঁহার নীতি প্রচার কখনো গল্পকে ছাপাইয়া ওঠে নাই। অ্যালিসের মতোই বাংলা ভাষায় 'পিনোচ্চিয়োর' বিভিন্ন অনুবাদ করা হইয়াছে।

এই নীতি-শিক্ষার প্রসঙ্গে শিশু-সাহিত্যের আর একটি ধারাও স্মরণ করিতে হয়। ১৭৬২ সালে প্রকাশিত ফরাসী দার্শনিক জঁা জেক রুশোর (Rousseau) "Emile" উপন্যাসে প্রথম এই কথাটি ফুটিয়া ওঠে যে শিক্ষার চাপ হইতে মুক্তি দিয়া শিশুকে স্বাধীনভাবে বাড়িতে দেওয়া উচিত। ইহারই প্রভাবে ইংরেজ লেখক টমাস ডে (Day) তাঁহার "Sandford and Marten" রচনা করেন। বইখানি কতগুলি নীতি গল্পের সমষ্টি—একটী সামান্য সূত্রে গাঁথিয়া দেওয়া। বাংলা দেশে যখন "গার্হস্থ্য গ্রন্থাবলী"র প্রকাশ আরম্ভ হয়, তখন ইহার অংশবিশেষ "কথা তরঙ্গ" নামে মধুসূদন মুখোপাধ্যায় অনুবাদ করিয়াছিলেন—আমরা পূর্ব্বেই তাহা বলিয়াছি। বস্তুতঃ বাংলা দেশে শিক্ষায় সহায়করূপে শিশু-সাহিত্য যখন প্রথম রচিত হইতে আরম্ভ করে—তখন এই ধারাই তাহাকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করিয়াছিল।

পিতা রিচার্ড এজ্ওয়ার্থের সহযোগিতায় ও উপদেশে আমেরিকায় মেরিয়া এজ্ওয়ার্থ উপদেশকে নেপথ্যে রাখিয়া আনন্দমুখ্য সাহিত্যের কয়েক খানি উল্লেখযোগ্য বই রচনা করেন। তাঁহার প্রথম বই "The Prent's Assistant" (১৭৯৬) কয়েকটি গল্পের সমষ্টি। হাতে-কলমে কিভাবে বাস্তব শিক্ষা লাভ করিতে পারা যায়, তাহাই ইহাতে প্রমাণ করা হইয়াছে। ১৮০০ সালে তাঁহার "Moral

Tales" প্রকাশিত হয়—উদ্দেশ্য নামের মধ্যেই নিহিত। ১৮০৩ সালে আসে 'Popular Tales' এবং ১৮১৩ সালে তাঁহার বিখ্যাত Rosamond Series আরম্ভ হয়।

রিচার্ডের নেতৃত্বে সমস্ত এজ্‌ওয়ার্থ পরিবারই সাহিত্যের মাধ্যমে শিশু-চরিত্র গঠনের দায়িত্ব লইয়াছিলেন—Harry and Lucy একটি পারিবারিক প্রচেষ্টার ফসল। মেরিয়ার প্রথম শ্রেণীর ঔপন্যাসিকের প্রতিভা ছিল, এই বইগুলির মধ্যেও তাহা প্রতিফলিত হইয়াছে।

স্যার ওয়ালটার স্কট (Scott)—যাঁহার "Rob Roy" (১৮১৭) "Ivanhoe" (১৮১৯) অথবা "Talisman" (১৮২০) বয়স্কদের জন্য লেখা হইলেও পরে ছোটরাই দখল করিয়া বসিয়াছে—এজওয়ার্থ পরিবারের প্রেরণাতেই তিনি "Tales of a Grandfather" রচনা করেন। গল্পকে আশ্রয় করিয়া ইতিহাসের চমৎকার রূপায়ণ করিয়াছিলেন স্কট। অবনীন্দ্রনাথের রাজকাহিনীর নেপথ্যে ইহার প্রেরণা থাকা অসম্ভব নয়।

সুসান চাউন্‌সি উল্‌সি (Woolsey), যিনি লেখনা নাম লইয়াছিলেন সুসান কুলিজ (Coolidge)—তাঁহার Katy Seriesও এই শিক্ষামূলক সাহিত্যের সঙ্গেই যুক্ত। 'What Katy did' (১৮৭২), 'What Katy did at School' (১৮৭৩), 'What Katy did Next' (১৮৮৬), 'Clover' (১৮৮৮) এবং 'In the High Valley' (১৮৯২) তাঁহার বিশিষ্ট অবদান।

এই উপন্যাসমালা ডাক্তার কারের পরিবারের কাহিনী। তাঁহার কয়েকটি মাতৃহারা সন্তান, কেটি তাহাদের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠা। এই শিশুরা শৈশব হইতে যৌবন পর্য্যন্ত কিভাবে জীবনের সম্পর্কে শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া বাড়িয়া উঠিল, তাহাই সুন্দর করিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে গ্রন্থগুলিতে। এই উপন্যাসপঞ্চক আজও ইংরাজীভাষী কিশোর-কিশোরীরা অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে পড়িয়া থাকে

উনিশ শতাব্দীতে ইয়োরোপ ও আমেরিকায় শেষ-প্রধান লেখক ইংরেজ রুডিয়ার্ড কিপলিং (Kipling)। প্রধানতঃ ভারতের বনভূমি ও জীব-জন্তুকে আশ্রয় করিয়া তিনি লিখিয়াছেন তাঁহার চমৎকার বই "Jungle Books" (১৮৯৪—১৮৯৫)। রিকি-টিকি-টাভি (Rikki-Tikki-Tavi), টুমাই (Too-mai of the Elephants), অথবা মোগলি (Mowgli) চিরন্তন হইয়া আছে। 'Kim' (১৮৯৯) ঠিক ছোটদের জন্য লেখা নয়—কিন্তু আরো অনেক বয়স্কপাঠ্য গ্রন্থের মতো শিশুরাও এটিকে আত্মসাৎ করিয়াছে।

বিংশ শতাব্দীতে অসংখ্য লেখক দেখা দিয়াছেন, তাহাদের আলোচনা এখানে আমরা করিব না। ঊনবিংশ শতাব্দীতেই ইয়োরোপীয় ও মার্কিনী শিশু-সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ প্রতিভারা প্রায় সকলেই আসিয়া গিয়াছেন। বিংশ শতকে বাংলার শিশু-সাহিত্য যখন শিক্ষার প্রত্যক্ষ সম্পর্ক হইতে মুক্তি পাইয়া স্বাধীনতার দাবিতে মাথা তুলিল তখন পশ্চিমই তাহাকে প্রধানতঃ প্রেরণা দিল। এই প্রেরণা আজও সমভাবে সক্রিয়। অনুবাদের তো কথাই নাই, ইহাদের পরোক্ষ ঋণ একালের বাংলা শিশু-সাহিত্যে সর্ব্বত্রই দেখিতে পাওয়া যাইবে।

॥ ২ ॥

শিশু-সাহিত্যের স্বরূপ

শিশু-সাহিত্য কি হওয়া উচিত?

পৃথিবীর সমস্ত দেশেই সমালোচকেরা এ সম্বন্ধে প্রশ্ন তুলিয়াছেন এবং উত্তরও দিয়াছেন। দীর্ঘ দিন আগে এ বিষয়ে প্রমথ চৌধুরী একটি তীক্ষ্ণধার প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন, "শিশু সাহিত্য বলে কোনও পদার্থের অস্তিত্ব নেই এবং থাকতে পারে না। কেন না শিশু-পছন্দ সাহিত্য শিশু ব্যতীত অপর কেউ রচনা করতে পারে না; আর শিশুরা সমাজের আর যে অত্যাচারই করুক না কেন, সাহিত্য রচনা করে না।"[১]

তাহা হইলে শিশুদের জন্য পাঠ্য-সাহিত্য বলিয়া কিছুই কি লেখা হইবে না? ইহার উত্তরে বীরবল বলিতেছেন: "শিশুপাঠ্য না হোক বালকপাঠ্য সাহিত্য আছে এবং থাকা উচিত।" কি ভাবে আছে? "ছেলেরা যে সাহিত্য পড়ে আর পড়তে ভালবাসে, তা মুখ্যতঃ কি গৌণতঃ ছেলেদের জন্য নয়, বড়দের জন্যই লেখা হয়েছিল। রূপকথা, রামায়ণ, মহাভারত, আরব্য উপন্যাস, Don Quixote, Gulliver's Travels, Robinson Crusoe—এ সবের কোনটিই আদিতে শিশুদের জন্য রচিত হয়নি। এর থেকেই প্রমাণ হয় যে, উচ্চ অঙ্গের সাহিত্যেরই একটি বিশেষ অঙ্গ ছেলেরা আত্মসাৎ করে নেয়।"

মাত্র প্রমথ চৌধুরীই নন—অনেকেই শিশু-সাহিত্য সম্পর্কে অনুরূপ মতামত পোষণ করিয়া থাকেন।

১। সবুজপত্র, অগ্রহায়ণ, ১৩২৩

কিন্তু ইহার মধ্যে আংশিক সত্য আছে—সম্পূর্ণ সত্য নাই ; স্মরণ রাখিতে হইবে, ডন কুইকসোট্, গালিভার বা রবিনসন ক্রুশো যখন লেখা হইয়াছিল, তখন পৃথিবীর কোথাও শিশু-সাহিত্যের জন্ম হয় নাই—ছোটদের জন্য বিশেষভাবে কিছু লিখিবার কথাও কেহ কল্পনা করেন নাই। রাজা আর্থারের যে গোল টেবিলের গল্প তাহারা শুনিত—সেই শিভাল্‌রির কাহিনীগুলি তাহাদেব কথা ভাবিয়া গড়িয়া ওঠে নাই, "রেনার্ড দি ফক্সের" অন্তরালে নির্ব্বোধ রাজা ও ধূর্ত্ত এবং মূর্খ রাজপুরুষদের রূপক নিহিত আছে বলিয়াই অনেকে অনুমান করিয়াছেন। ঈশপের নীতি গল্পও পূর্ব্বে সর্ব্বজনীন ভাবেই ছিল—পরে উহা শিশুদের জগতে আসিয়া বাসা নিয়াছে।

বলিতে গেলে, অষ্টাদশ শতাব্দীতেই শিশু-সাহিত্য স্বতন্ত্র একটি রূপ লইয়া প্রথম আবির্ভূত হইয়াছে। তাহার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বয়স্ক-সাহিত্যের মধ্য হইতেই শিশুরা যতটুকু পারে নিজেদের প্রয়োজন-মতো আহরণ করিয়াছে, কারণ তাহাদের ক্ষুধার্ত্ত মন আর কোনো খাদ্য সেদিন পায় নাই। তাহা হইতে এ কথা প্রমাণিত হয় না যে শিশু-সাহিত্যের কোনো সার্থকতাই নাই ; বরং যেদিন হইতে এই বিশিষ্ট সাহিত্যটি জন্ম লইয়াছে, সেই দিন হইতেই ইহা নিজস্ব মহিমায় সমৃদ্ধি লাভ করিতেছে—আজ পৃথিবীর সাহিত্য-ইতিহাসে ইহা একটি স্বতন্ত্র অধ্যায় রূপে পরিগণিত হইবার জন্য দাবী জানাইতে পারে। পূর্ব্বে ইউরোপীয় ও মার্কিনী সাহিত্যের যে সংক্ষিপ্ত পরিচয় আমরা দিয়াছি, তাহা হইতে বোঝা যাইবে—প্রমথ চৌধুরীর উক্তির বিপরীতটিও ঘটিয়াছে, অর্থাৎ শিশুদের জন্য রচিত হইয়াও কোনো কোনো গ্রন্থ নিত্য-সাহিত্যের জগতে উত্তীর্ণ হইয়াছে পাঁচ-ছয় বছরের শিশুদের জন্য কোনো 'তথাকথিত' সাহিত্য হয়তো সৃষ্টি হইতে পারে না, কিন্তু তাহাদের জন্য যে সমস্ত Picture Books এবং ছড়ার বই আজ সহস্র সহস্র প্রকাশিত হয়—সেগুলি বর্ত্তমান শিশু-জীবনের অঙ্গ হইয়া গিয়াছে। একান্ত শিশুদের মনের

কতখানি অংশ যে তাহারা জুড়িয়া আছে—তাহা ব্যাখ্যা করিয়া বোঝাইবার অবকাশ নাই। কিন্তু শিশু-সাহিত্যকে যে ব্যাপক অর্থে আমরা ধরিয়াছি (শিবনাথ শাস্ত্রী 'মুকুলে' ৮।৯ হইতে ১৬।১৭ বৎসর পর্য্যন্ত যে বয়সের সীমা নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন), সেদিক হইতে দেখিলে বলা যায়, শিশুদের কথা মনে রাখিয়াই অন্ততঃ কয়েকটি গ্রন্থ লিখিত না হইলে সমগ্র ভাবে বিশ্ব-সাহিত্যই বঞ্চিত হইত।

শিশু সমাজের বাহিরে নয়—বরং তাহারাই ভবিষ্যৎ-সমাজের অঙ্কুর। সেই আগামী লোক-সমাজকে জ্ঞানে-কর্ম্মে-মহত্ত্বে সর্ব্বাঙ্গীণ-ভাবে গড়িয়া তুলিতে হইলে তাহার জন্য বিপুলভাবেই আয়োজন করা উচিত। অনাগত ইতিহাসের নেতৃত্ব যাহারা গ্রহণ করিবে, পূর্ণ সার্থকতার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া তাহাদের মানসিক পুষ্টিসাধন করা বলিতে গেলে মানুষের প্রাথমিক কর্ত্তব্য ঃ

"For it is the very nature of children to grow. They cannot stand still. They must have change and activity of both mind and body. Reading which does not stir their imaginations, which does not stretch their minds, not only wastes their time but will not hold the children permanently"। [১]

সুতরাং শিশু-সাহিত্য গড়িয়া তোলা একটি সুকঠিন দায়িত্ব। তাহাদের উপযুক্ত আত্মিক বিকাশ ঘটাইতে হইলে এমন সুসাহিত্য রচনা-করিতে হইবে—যাহা তাহাদের মনকে প্রসারিত করিবে, কল্পনা শক্তিকে উদ্বুদ্ধ করিবে—তাহাদের চরিত্রে একটি স্থায়ী প্রভাব মুদ্রিত করিয়া দিবে। এই কাজ কাহারা করিবেন এবং কি ভাবে করিবেন ?

ম্যাক্সিম গোর্কী দ্ব্যর্থহীন ভাষায় তাহার একটি সুস্পষ্ট পরিকল্পনা উপস্থাপন করিয়া বলিয়াছেন ঃ

১। The Unreluctant Years, Lilian H. Smith. P—14

"To successfully create fiction and educative literature for children we need the following : first, writers of talent capable of writing simply, interestingly and meaningfully ; then editors of culture, with sufficient political and literary training, and, finally, the technical facilities to guarantee timely publication and due quality of books for children."[১]

গল্প বা শিক্ষামূলক সাহিত্য—শিশুদের জন্য যাহাই রচিত হউক, তাহার জন্য প্রতিভাবান লেখক আবশ্যক। শিশু-পত্রের যাঁহারা সম্পাদনা করিবেন, তাঁহাদের উপযুক্ত মানসিক প্রকর্ষ থাকা চাই—উৎকৃষ্ট রচনা-সম্ভার সহযোগে নিয়মিত ভাবে শিশু-পত্রের প্রকাশনা করা চাই।

এ গুলি মাত্র নীতির দিক হইতে; এ ক্ষেত্রে শিশু-সাহিত্য সম্পর্কে আমাদের সামাজিক কর্ত্তব্যেরই নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু এইটিই সর্ব্ব শেষ কথা নয়। বিশুদ্ধ-সাহিত্যের দিক হইতেও শিশু-মন একটি অত্যন্ত মূল্যবান উপকরণ। স্বপ্ন-কল্পনায় গড়া, আবেগে উচ্ছ্বসিত, নব প্রাণের আনন্দে চঞ্চল এই শিশুর নিভৃত মর্ম্মকোষে যে রহস্য লুকানো রহিয়াছে—তাহা এক অপরিচিত মহাদেশের মতোই বিরাট ও বিচিত্র। সেই মহাদেশের আবিষ্কার সহজ কাজ নয়; তাহার মানস আকাশে কল্পনার যে ইন্দ্রধনু ফুটিতেছে এবং মিলাইতেছে, তাহাকে তুলির রেখায় জাগাইয়া তোলা শক্তিমান শিল্পী ব্যতীত অসম্ভব। "পথের পাঁচালী"র 'অপু'কে সৃষ্টি করিয়াছেন বিভূতিভূষণ, "Oliver Tiwst"-এর জন্য চার্লস্ ডিকেন্সের প্রতিভার প্রয়োজন হইয়াছে।

১। বিস্তৃত পরিকল্পনাটির জন্য Maxim Gorky-র "On Literture" গ্রন্থটির Page 220-227 দ্রষ্টব্য।

তাই শিশু-সাহিত্য রচনা আপাতঃ দৃষ্টিতে যেমন সহজ, তেমনি কঠিন। তাহাদের নীতি গল্প শিখাইতে গেলেও লা-ফঁতেন বা ইভান্ ক্রিলভের মতো শক্তিমান লেখকের প্রয়োজন হয়। যে কেহই ইচ্ছা করিলে ঈশপ পারেন না, তাহাদের রূপকথা বলিতে গেলে গ্রিম ভ্রাতৃদ্বয়ের মতো জার্ম্মানীর 'পল্লীকুটির' হইতে কৃষক রমণীর কণ্ঠস্বরটি অবিকৃত তুলিয়া তুলিয়া আনিতে হয় (যেভাবে বাঙালী দক্ষিণারঞ্জনও করিতে সক্ষম হইয়াছেন) নতুবা হ্যান্স্ অ্যাণ্ডারসনের মতো রূপকথার জগতে নিজেরই মগ্ন হইয়া যাইতে হয়। খেয়ালী কল্পনার জাল বুনিবার শক্তি লুই ক্যারল বা কার্লো কলোদীর মতো সকলের থাকে না; কিশোর-হৃদয়ের সম্পূর্ণ পরিচয় উদ্‌ঘাটন করিতে টমাস্ হিউয়েস্ অথবা মার্ক টোয়েনের পরিণত শক্তির অপেক্ষা রাখে; অ্যাডভেঞ্চারের জগতে শিশুকে সহযাত্রী করিতে হইলে স্টিভেনসনের প্রতিভার আবশ্যক করে।

আসল কথা হইল, আদৌ যাহা সাহিত্য নয়, তাহা শিশু-সাহিত্যও নয়। শিশুদের জন্য যিনি লিখিবেন, তাঁহাকে প্রথমতঃ সাহিত্যিক হইতে হইবে; এবং তাঁহার হাত হইতে যাহা সৃষ্টিলাভ করিবে তাহার নায়ক-নায়িকা শিশু হইতে পারে—শিশু-চিত্তের ছন্দই তাহাতে স্পন্দিত হইতে পারে, কিন্তু তাহাতে নিত্য-সাহিত্যের রসই সঞ্চিত থাকিবে। উপরে যে-সমস্ত লেখকের উল্লেখ করিয়াছি, পৃথিবীর সম্মুখে তাঁহাদের পরিচয় সাহিত্যিকরূপেই—শিশু-সাহিত্যিক হিসাবে নয়; এবং হ্যান্স্ অ্যাণ্ডারসনের গল্প, গ্রিমের রূপকথা, এলিসের আশ্চর্য্য দেশে অভিযান কিংবা মার্ক টোয়েনের টম ও হাক্‌লবেরী সাহিত্যরূপেই উত্তীর্ণ—শিশু-সাহিত্য রূপে নয়।

উৎকৃষ্ট গ্রন্থ যেমন বয়ঃপ্রাপ্তদের জগৎ হইতে শিশুদের জগতে সঞ্চারিত হইয়া আসে (যথা স্কটের রোমান্স্, জুল ভার্নের বিজ্ঞান-ধর্ম্মী উপন্যাস), অনুরূপভাবে সার্থক শিশু-সাহিত্যও বয়স্কদের পৃথিবীতে অনায়াসেই প্রবেশ করে। যথার্থ শিশু-সাহিত্য বলিতে

তাহাই বুঝিব, যাহা সর্ব্ব বয়সের নরনারীর কাছেই একটি রসাস্বাদ আনিয়া দেয়; বয়সের পার্থক্য অনুসারে আস্বাদনের ব্যাপারে কিছু বিভিন্নতা ঘটিতে পারে—কিন্তু সর্ব্ব স্তরের মানুষকে আনন্দ দান করিবার মতো শিল্প গুণ তাহাতে থাকিবেই। "All children from six to sixty" কেহই তাহা হইতে বঞ্চিত হইবেন না।

এ সম্পর্কে চমৎকার ভাবে C. L. Lewis বলিয়াছেন: "No book is really worth reading at the age of ten which is not equally (and often farmore) worth reading at the age of fifty."

যে কোনো মহৎ সৃষ্টিকেই আমরা এক হিসাবে মায়া-দর্পণ বলিতে পারি। মায়া-মুকুরের একটি স্থির সীমার মধ্যে যেমন বারে বারে ছবির বদল ঘটে তেমনি উচ্চাঙ্গের সাহিত্য যত বার পড়া যায়, ততবার তাহা হইতে এক একটি নূতন উপলব্ধি আসিয়া আমাদের মনকে স্পর্শ করে। যৌবনে, প্রৌঢ় বয়সে বা পরিণত বার্দ্ধক্যে শেকস্‌পীয়ারের একই গ্রন্থ হইতে নিত্য নবীন সত্য দেখা দেয়—তাহা কখনও পুরাতন হয় না।

তাই ছেলেবেলায় এ্যালিসের কাহিনী যে রোমাঞ্চ জাগায় বার্দ্ধক্যে তাহা আরো গভীর আনন্দ বহিয়া আনে। শিশু-মন হ্যান্স অ্যাণ্ডার-সনের রূপকথা পড়িয়া জীবনের সরোবরে আলোর খেলা দেখে, প্রৌঢ়ত্বে সেই মন তাহার গম্ভীর-গভীরতায় মগ্ন হয়। আমাদের বাংলা সাহিত্যে সুকুমার রায়ের 'আবোল তাবোল' বইখানির কথাই আমরা স্মরণ করিতে পারি। ইহার লঘুতা ও কৌতুককে শিশু এক ভাবে গ্রহণ করিয়া খুশী হয়—কিন্তু বয়স বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে ইহার অন্যবিধ সৌন্দর্য্য, ইহার সূক্ষ্ম ব্যঙ্গের কৌশল, সুকুমার রায়ের স্বাভাবিক কবিত্ব-শক্তির স্বরূপটি আবিষ্কৃত হইতে থাকে।

ইহাই সত্যকারের সাহিত্য—শিশু-সাহিত্যেরও পরিচয়।

অক্ষম লেখকের স্থান কোথাও নাই, শিশু-সাহিত্যে তো নাই-ই।

অযোগ্য লেখকের কৃত্রিম ছেলেমানুষী করিবার চেষ্টা বয়স্কের দৃষ্টি এড়াইয়া যাইতে পারে, কিন্তু শিশু-পাঠককে অত সহজেই প্রবঞ্চনা করা যায় না। বুদ্ধির পূর্ণ-বিকাশ না হওয়া পর্য্যন্ত প্রকৃতি-ই একটি স্বাভাবিক অনুভব-শক্তি দিয়া তাহাকে সংরক্ষিত করে; সেই সহজাত অনুভূতির দ্বারাই সে সত্যাসত্যকে অনেকখানি চিনিয়া লইতে পারে; যেখানে লেখকের আন্তরিকতার স্পর্শ পায় এবং যাহার রচনার সহিত সে স্বাভাবিক মানস-সংযোগ অনুভব করে তাহাকেই সে নিজের প্রিয় লেখকরূপে চিহ্নিত করিয়া লয়।

মাত্র শিশুর সহিত আন্তরিকতার দ্বারা সহযোগ করিলেই যথেষ্ট হয় না। মনে রাখিতে হইবে, শিশুরও একটি নৈতিক-জগৎ আছে, উচিত-অনুচিত, সৎ-অসৎ, ভালো-মন্দ, সব কিছু সম্পর্কে কতগুলি সিদ্ধান্তও আছে। অর্থাৎ পরিবার ও পরিবেশ হইতে যে ধরণের শিক্ষা সে লাভ করে এবং তাহার মনে যে সমস্ত মূল্যবোধ সৃষ্টি হইয়া থাকে, সেগুলির আলোকেই সে সব কিছু বিচার করিয়া লয়। তাই দুর্ব্বলের উপর সবলের জয় সে পছন্দ করে না; অন্যায়ের প্রতিবিধান না হইলে তাহার মন পীড়িত হয়। Snow-White যদি তাহার শবাধার হইতে জাগিয়া না ওঠে তবে তাহার আনন্দ নাই; নেকড়ে আসিয়া ছাগলছানাগুলিকে খাইয়া যাইতে পারে কিন্তু যতক্ষণ পর্য্যন্ত না সেই ছানাগুলি নেকড়ের পেট চিরিয়া বাহির হইতেছে ততক্ষণ পর্য্যন্ত সে তৃপ্তি পায় না :

"I have never come across any story much liked by intelligent children that had any trace of shakiness in its implicit ethical standard. And we have found that by following their own tastes and pleasure in reading, our young fry have tapped substantial reservoir of wisdom, philosophy and common sense in the matter of responsible living" [১]।

১। 'Longer Flight', Annis Duff. Page 16-17

তাহা হইলে শিশু-সাহিত্যের জন্য তিনটি মৌলিক বস্তুর প্রয়োজন আছে। প্রথমতঃ শক্তিমান ও সহানুভূতিশীল লেখক, দ্বিতীয়তঃ উৎকৃষ্ট সাহিত্য রস, এবং তৃতীয়তঃ চরিত্র গঠনের উপযোগী উপযুক্ত নীতি-বিন্যাস।

অক্ষমের হাতে সাহিত্যরসপুষ্ট বস্তু গড়িয়া উঠিতে পারে না। তাহার রচনা হয়তো আংশিক ও সাময়িক সাফল্য লাভ করিতে পারে কিন্তু নবীন পাঠক-পাঠিকার মনে কোন স্থায়ী প্রভাব রাখিয়া যায় না। অপর পক্ষে যাহা সত্যকারের সাহিত্য তাহা আপনা হইতেই শিশুর মনে আসন পাতিয়া লয়। যেমন ঃ

"পূবদিকে মাঝরাতে ছোপ দিয়ে রাঙা
রাতকানা চাঁদ ওঠে আধখানা ভাঙা।
চট্ করে মনে পড়ে মট্‌কার কাছে
মালপোয়া আধখানা কাল থেকে আছে।
দুড়্ দুড়্ ছুটে যাই, দূর থেকে দেখি,
প্রাণপণে ঠোঁট চাটে কানকাটা নেকী!
গালফোলা মুখে তার মালপোয়া ঠাসা
ধুক্ করে নিভে গেল বুক ভরা আশা।"

(হুলোর গান—সুকুমার রায়)

নিতান্তই কৌতুকের আশ্রয়ে হুলো-বেড়ালের মনোবেদনা বর্ণনা—বস্তু-গৌরব কিছুই নাই। কিন্তু সাহিত্যিকের চিত্তের আলো পড়িয়া মাত্র প্রথম দুইটি পংক্তিতেই মধ্য-রাত্রির চন্দ্রোদয়ের একটি আশ্চর্য্য ছবি ফুটিয়াছে। এবং, আধখানা চাঁদ হইতে আধখানা মালপোয়াকে মনে পড়িবার ভাবানুষঙ্গ, দ্রুত ছুটিয়া যাওয়া, কানকাটা নেকী বিড়াল সেটিকে ইহার মধ্যেই গালে পুরিয়াছে দেখিয়া "ধুক করে নিভে গেল বুকভরা আশা"—পূর্ব্বপর একটি সামগ্রিক শিল্প-নৈপুণ্য ইহাকে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে। নিখুঁত ছন্দ, একটি শব্দকেও স্থানান্তরিত

করিবার জো নাই। পড়িবার সঙ্গে সঙ্গে মনের মধ্যে একটি অনুরণন জাগাইয়া দেয়, স্মৃতিতে আসিয়া বাসা বাঁধে।

চাঁদ, জ্যোৎস্না ও আকাশের হাজার তারা লইয়া অগণিত কবিতা লেখা হয়, শিশুরা পড়ে এবং ভুলিয়াও যায়। কিন্তু :

"চাঁদটা যেন সত্যিকারের আলোরই মৌচাক
দুষ্টু ছেলের ঢিলটা লেগে হঠাৎ হোলো ফাঁক।
আজকে রে তাই সাঁজের বেলায়
আলোর মধু সব ঝরে যায়
হাজার তারা মৌমাছিরা উড়লো ঝাঁকে ঝাঁক
নীল আকাশের নিতল নীলে উড়ল ঝাঁকে ঝাঁক—"

(মৌচাক—সুনির্ম্মল বসু)

ইহা গতানুগতিক চাঁদ ও জ্যোৎস্নার বর্ণনা নয়। কবি-কল্পনার স্পর্শ লাগিয়া সব কিছুই একটা নূতন তাৎপর্য্য ও সৌন্দর্য্যে ভরিয়া উঠিয়াছে এবং সেই সঙ্গে শিশুর কল্পনাকেও জাগাইয়া দিয়াছে। কবির হাতে শরতের বর্ণনা এই রকম :

"স্থল-পদ্মের পোষাকপরা, গলায় কমল-হার
কর্ণমূলে কুরুবকের বীরবৌলি তার।
নামলো এসে হিরণ কিরণ চতুর্দ্দোলায় চড়ে
সোনার গুঁড়ো ছড়িয়ে দিলে ঝর্ণাধারার তোড়ে।"

(শরৎ – নিশিকান্ত সেন)

'কর্ণমূল' 'কুরুবক' 'বীরবৌলি' এবং 'চতুর্দ্দোলা' কঠিন গম্ভীর শব্দ, কিন্তু সামগ্রিক চমৎকার ছবিটির সঙ্গে কী আশ্চর্য্য ভাবে মিলিয়া গিয়াছে। শিশুর মন সঙ্গে সঙ্গে দেখিতেছে অপরূপ সাজে কে যেন শরতের আলোর রথে চড়িয়া পৃথিবীতে নামিয়া আসিতেছে, আর মুঠো মুঠো করিয়া সোনার রেণু ঝরণার জলে ছড়াইয়া দিতেছে।

এই ধরণের কবিতাই শিশুর মনে স্থায়িত্ব লাভ করে—তাহার মনে যে কবি আছে,তাহাকেও জাগাইয়া দেয়। এ কাজে সফল হইতে

হইলে কেবল সাহিত্য-প্রতিভাই যথেষ্ট নয়, শিশুর হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া তাহারই চোখ ও মন লইয়া জগৎকে দেখিতে হয়। এই দৃষ্টি ও মন আয়ত্ত করিতে না পারিলে প্রথম সারির সাহিত্য-প্রতিভাও শিশু-চিত্ত জয় করিতে পারেন না। যাঁহারা পারেন, তাঁহাদের সাফল্য লাভ হয় দুদিক হইতে ; শিশুরা তাঁহাদের লেখায় নিজেদের দেখিতে পায় এবং বয়স্কেরা নিজেদের শৈশবকে খুঁজিয়া পান। রবীন্দ্রনাথ যখন লেখেন :

“একে একে মাঠ পেরোলুম
কত মাঠের পরে,
তার পরে উঃ—বলি মা শোন !
সামনে এলো প্রকাণ্ড বন
ভিতরে তার ঢুকতে গেলে
গা ছম্ ছম্ করে।
জামতলাতে বুড়ী ছিল
বললে, ‘খবরদার’।
আমি বললেম বারণ শুনে
‘ছ পণ কড়ি এই নে গুণে’
যতক্ষণ সে গুণতে থাকে
হয়ে গেলাম পার”—

(পথহারা, শিশু ভোলানাথ)

তখন এই নায়কটির সঙ্গে শিশু অবলীলাক্রমে নিজের অভিন্নত্ব কল্পনা করিয়া লয় ও প্রাপ্ত-বয়স্ক আপন শৈশবের মনটিকে ইহার মধ্যে খুঁজিয়া পান : “In these poems children can see themsleves, while adults catch nostalgic glimpses of the children they once were, the children they once knew.” ১।

১। A critical Survey of Children's Literature, Page-594

শিশু-সাহিত্যে নীতি শিক্ষার কথা বলিয়াছি। বস্তুতঃ কোন একটি নীতির উপর নির্ভর না করিলে কোন সাহিত্যই সত্য হয় না— জীবনের প্রতি তাহার কর্ত্তব্যও পালিত হয় না। কিন্তু নীতিকে শুষ্ক উপদেশে পর্য্যবসিত না করিয়া আনন্দের মোড়কে মুড়িয়া দেওয়াই শিশু-সাহিত্যিকের প্রধান কৃতিত্ব। নীতি-বাক্য হাক্‌লবেরি ফিনে আছে, ট্রেজার আইল্যাণ্ডেও আছে; শিশুরা ইহার আনন্দের স্বাদটিই গ্রহণ করে, উপদেশ তাহার রক্ত-ধারায় নিঃশব্দে স্বাস্থ্য-সঞ্চার করিয়া দেয়। এই কারণেই শিশুদের সাহিত্যকে শিক্ষার আতঙ্ক হইতে মুক্ত করিয়া তাহার একটি স্বতন্ত্র শিল্পরূপকে পৃথিবীর সর্ব্বত্রই স্বীকার করিয়া লওয়া হইয়াছে।

প্রশ্ন উঠিবে ছড়ায় কিম্বা রূপকথায় কি কোন নীতির সন্ধান মেলে? রূপকথায় অবশ্যই মেলে, কারণ সত্যের জয়, শক্তির মর্য্যাদা এবং জীবন সম্পর্কে সহানুভূতি ইহাদের আশ্রয়েই শিশুর মনে জাগিয়া ওঠে। কেহ কেহ বলেন, রূপকথা অবাস্তব, এগুলি পড়িয়া শিশুরা অলীক কল্পনা-বিলাসে প্রলুব্ধ হয়, তাহাদের সুস্থ স্বাভাবিক বুদ্ধি আচ্ছন্ন হইয়া যায়। এই প্রসঙ্গে বিখ্যাত ইংরেজ কবি অডেন যে বক্রোক্তিটুকু করিয়াছেন, তাহা উপভোগ্য :

"There are the people who object to fairy stories on the grounds that they are not objectly true, that giants, witches, two-headed dragons, magic carpets, etc. do not exist : and that, instead of indulging his fantasies in fairy tales, the child should be taught how to adapt reality by studying history or mechanics.... I do not know how to arguge with them. If their case were sound the world should be full of Don-Quixote-like mad men attempting to fly from Newyork to Philadelphia in a broom-stick

or covering a telephone with kisses in the belief that it was their enchanted girl friend".[১]

ছড়া বা খেয়ালী কবিতায় কোন প্রত্যক্ষ উপদেশ না থাকিতে পারে, কিন্তু রূপকথার পাশাপাশি তাহারা যেমন কল্পনা-শক্তিকে উত্তেজিত করে, তেমনি শিশুর মনে সঙ্গীতের ঝঙ্কার তুলিয়া দেয়—তাহার দৃষ্টিতে জীবন ও পৃথিবীকে সৌন্দর্য্যের বর্ণরাগে অনুরঞ্জিত করে। ইহার মূল্য যে কতখানি, সে বিষয়ে প্রথম অধ্যায়েই আমরা কিছু আলোচনা করিয়াছি।

শুধু গল্প-কবিতা-ছড়াই নয়; ইতিহাস, বিজ্ঞান, ও জীবনের নানাবিধ জিজ্ঞাসা—সব লইয়াই শিশু-সাহিত্যের সামগ্রিক আয়োজন। তরুণ মনের রহস্য-ভাণ্ডারটির সন্ধান তাঁহারা জানেন, তাঁহারা সেই রহস্যলোকে প্রবেশ করিয়া সেখানে নিজেদের সাম্রাজ্যও প্রতিষ্ঠা করিতে পারেন। মাত্র বৈজ্ঞানিক বা ঐতিহাসিক হইয়াই নয়—মূলতঃ সাহিত্যিক এবং শিশু-সাহিত্যিক হইয়াই এই সাফল্য অর্জ্জন করিতে হয়। কেমন করিয়া তাহা সম্ভব হয় বাংলা দেশে জগদানন্দ রায়ের বৈজ্ঞানিক গ্রন্থগুলি হইতেই আমরা তাহা দেখিয়াছি, তাঁহার "গ্রহ-নক্ষত্র" কিংবা "মাছ-ব্যাঙ-সাপ" ছোটরা রূপকথার মত এক নিঃশ্বাসে পড়িয়া যায় এবং বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসা তাহাদের সজাগ করিয়া তোলে।

আজ বিজ্ঞানের উপরে নির্ভর করিয়া শিশু-সাহিত্যের অসীম সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে। মানুষ মহাকাশে যাত্রা সুরু করিয়াছে, পৃথিবীর মেঘলোক ছাড়াইয়া উল্কা-চিহ্নিত শূন্যতার পথ বাহিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে অনন্তের দিকে; জীব-বিজ্ঞানে, ভূ-বিদ্যায়, পূর্ত্ত-বিদ্যায়, রসায়নে, পদার্থ-বিদ্যায়—সর্ব্বত্রই নব নব আবিষ্কারের করাঘাতে অজ্ঞাতের বন্ধ দুয়ার একটি একটি করিয়া খুলিয়া যাইতেছে। সেই

(১) W. H. Auden, Introduction, Tales of Grimm and Anderson.

দ্বারোন্মোচনে ইয়োরোপ ও আমেরিকার শিশুরা অগ্রবর্ত্তী হইয়াছে —আমাদের ভাবীকালকেও তাহাদের সহযাত্রী করিয়া দিতে হইবে। এ কাজ মাত্র গোয়েন্দা কাহিনী, হালকা হাসির গল্প কিংবা নকল রূপকথা লিখিয়াই করা যাইবে না; বিজ্ঞানের নামে ফ্যান্টাসি তৈয়ার করিয়াও তাহা সম্ভব হইবে না। উপযুক্ত জ্ঞান লইয়া, সাহিত্যের লেখনী ধরিয়া, যোগ্য ব্যক্তিরা অগ্রসর হইলেই তবে ইহা সাধিত হইতে পারে :

আধুনিক শিশু-সাহিত্যের যে সূত্রপাত ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ পাদে বাংলা দেশে ঘটিয়াছিল তাহা আজ পূর্ণতার গৌরবে ভরিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু বিংশ-শতাব্দীর এই শিশু-সাহিত্য সম্ভার লইয়া যেদিন সম্পূর্ণ হিসাব-নিকাশ করিবার সময় আসিবে, সেদিন উপযুক্ত অধিকার ও দায়িত্ববোধ লইয়া আমাদের কর্ত্তব্য আমরা কতখানি পালন করিতে পারিয়াছি, উত্তরাধিকারীদের নিকট তাহারও যে জবাবদিহি করিতে হইবে—এ কথা যেন আমরা কখনোই ভুলিয়া না যাই।

পরিশিষ্ট

সংযোজন ও সংশোধন

(ক)

সত্যপ্রদীপ

১৩২ পৃষ্ঠার পাদটীকায় খ্রীষ্টান ভার্নাকিউলার এডুকেশন কমিটির বঙ্গীয় শাখা প্রকাশিত 'সত্যপ্রদীপ' পত্রিকার উল্লেখ করিয়াছি। পত্রিকাখানি একেবারেই দুষ্প্রাপ্য—এখানে কোথাও ইহার সন্ধান পাই নাই। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার 'বাংলা সাময়িক পত্রে' ইহার যে অতি সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়াছেন (প্রথম খণ্ড, পৃঃ ১৬২), তাহাতে মনে হয় তিনিও ইহাব কোনো সংখ্যা দেখেন নাই।

লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার দাস বহু অনুসন্ধানের পর ব্রিটিশ মিউজিয়ামে রক্ষিত ইহার দ্বিতীয় বৎসরের একটি খণ্ড আবিষ্কার করিয়াছেন এবং পত্রিকাটির কিছু নিদর্শন আমাকে পাঠাইয়া অনুগৃহীত করিয়াছেন।

পত্রিকাটি আয়তনে অত্যন্ত ক্ষুদ্র। আয়তন আনুমানিক ৪½″ × ৩½″ ইঞ্চি। ইহার নামপত্র এইরূপ :

সত্যপ্রদীপ
The Lamp of Truth
No. I. January 1861
Calcutta
Bengali Branch of the Christian Vernacular
Education Society for India
1861

সূচনায় সম্পাদকীয় বক্তব্য :

"হে প্রেমাস্পদ বালক বালিকাগণ বিগত বৎসরের প্রতিমাসে প্রকাশিত পত্রিকা দ্বাদশ খণ্ড একত্র করাতে তোমাদের প্রত্যেকের এক ২ খানি পুস্তক হইয়াছে। এইক্ষণে আর একখানি পুস্তক যাহাতে হইতে পারে, এতৎ অভিপ্রায়ে, এই নূতন বৎসরে, দ্বিতীয় খণ্ডের প্রথমাংশ প্রকাশ করিতেছি।

নূতন বৎসরের প্রারম্ভে বন্ধু বান্ধব আত্মীয়গণের মঙ্গল ইচ্ছা করা বিলাতীয় লোকের পদ্ধতি। সেই প্রকার আমাদের দেশে ভাল হইতে পারে তাহার সন্দেহ নাই। সে যাহা হউক, আমরা এই সময়ে এই পত্রিকা পাঠক সকলকার মঙ্গল ইচ্ছা করিতেছি। জগদীশ্বরের কৃপায়, যেন তোমাদের পক্ষে এই অভিনব বর্ষ সুখকর হয়, এই আমাদিগের বাঞ্ছা। ভরসা করি, গত বৎসরে সত্যপ্রদীপ পাঠক মাত্রেই তৎপ্রকটিত ছবি দর্শনে ও গল্পচ্ছলে রচিত প্রবন্ধ পাঠে সন্তুষ্ট হইয়াছে। আগত বৎসরে যেন তদপেক্ষা তাহাদিগকে অধিক সন্তুষ্ট করিতে পারি এমত চেষ্টা পাইব। অর্থাৎ যাহাতে প্রত্যেক মাসের পত্রিকা অধিকতর শিক্ষা প্রদায়িনী সুখকরা ও সুন্দরী হয়, এমত যত্ন আমরা করিব।"

সচিত্র পত্রিকাটি মাসিক ছিল। গল্পচ্ছলে নীতিশিক্ষা দানই ছিল উদ্দেশ্য, তৎসহ একটি অতিরিক্ত জিনিশও থাকিত, ইংরাজী ও বাংলা প্রবাদের সংকলন।

অত্যন্ত সরল ভাষায় ইতিহাস, ভূগোল, ধর্ম্ম ও পশুপক্ষীর বিবরণ দেওয়া হইত। যেমনঃ 'তালবৃক্ষ', 'পারস্যদেশের লোকদের বিবরণ', 'তৃতীয় জর্জ্জ রাজার বিবরণ', 'শৃগাল', 'বৌদ্ধধর্ম্ম', 'চীনদেশীয় আচার', 'দরবেশ', 'ভল্লুক', 'ঈশ্বর সকল বস্তুর সৃষ্টিকর্ত্তা', 'বানর', 'সমুদ্র অশ্ব', 'ইস্পাহান নগরী' ও 'জিরাফ' ইত্যাদি। উপদেশমূলক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এইরূপ প্রসঙ্গ দেওয়া হইত : 'ক্ষুদ্র বালক বালিকারা কি কাহারও উপকার করিতে পারে', 'সময় বৃথা ব্যয় করিও না', 'উৎকৃষ্ট পরামর্শ', 'কিরূপে দুঃখ দূর হইতে পারে', 'ঈশ্বর প্রেমময়।'

ইহারা ছাড়াও ছোট ছোট নীতিগর্ভ গল্প থাকিত, উপদেশ দানই ছিল তাহাদের প্রধান লক্ষ্য। যেমন 'আশ্চর্য্য ঘটনা', 'মেকি সিকি', 'চমৎকার জল', 'মিথ্যা কথা' 'এক চমৎকার চর্ম্মপাদুকা', 'এক বধির ও বোবা বালকের বিবরণ', 'অসুরঘাতক' 'এক বাজপক্ষী', 'বিড়াল ও এক শকরের (শূকর) বিবরণ'।

আয়তন ও পত্রসংখ্যা দুই-ই অল্প, রচনাগুলিও প্রায়শঃ ১০-১২ পংক্তির মধ্যেই শেষ হইত। রচনা সরল, জড়তা নাই—তবে স্থানে স্থানে ইংরাজী বাক্যরীতির প্রভাব পড়িয়াছে। যেমন "খিন্নমান লোকেরা ধন্য কেননা তাহারা সান্ত্বনা পাইবে"! 'খিন্নমান' ইংরাজি 'Repentant'-এর অনুবাদ।

(খ)

বঙ্গভাষানুবাদক সমাজ

এই সমিতি কি ভাবে গ্রন্থ প্রচারের পরিকল্পনা করিয়াছিলেন, ই-বি কাউয়েল্ স্বাক্ষরিত একটি বিজ্ঞপ্তি হইতে তাহা জানা যায়।

অনুবাদক সমাজের বিজ্ঞাপন

অনুবাদক সমাজের অধ্যক্ষেরা এই নিয়ম নির্দ্ধারিত করিয়াছেন যে, যে যে ব্যক্তি নিম্নলিখিত নিয়মানুসারে কোন অভিনব গ্রন্থ রচনা করিয়া উক্ত সমাজের মনোনীত করিতে পারিবেন, তাঁহাকে ২০০ দুই শত টাকা পারিতোষিক প্রদান করা হইবে। এই নিয়ম এক জনের এবং একবারের জন্য নহে, যখন যে ব্যক্তি এ নিয়মানুসারে গ্রন্থ রচনা করিবেন, তাঁহাকেই উক্ত ২০০ দুই শত টাকা পারিতোষিক দেওয়া হইবেক।

১ম। পুস্তকখানি সুনীতিসম্পন্ন বা চারিত্রশোধক হইবেক।

২য়। নিম্নলিখিত বিষয়ে অথবা তদ্রূপ অন্য কোন বিষয়ে লিখিত হইবে।

১। প্রাকৃতিক ইতিবৃত্ত ও বিজ্ঞানশাস্ত্র।

২। দেশ প্রদেশের বিবরণ ও ভূগোল বৃত্তান্ত।

৩। বাণিজ্য এবং লোকযাত্রা বিধান।

৪। লোকপ্রিয় ও উপকারক বিজ্ঞানশাস্ত্র।

৫। শিল্পবিদ্যা।

৬। নীতিগর্ভ গল্প।

৩য়। বঙ্গভাষার যথার্থ রীত্যনুসারে অথচ সরল ভাষায় গ্রন্থের রচনা হইবেক; বিশেষতঃ ঐ রচনা ও উহার ভাব এরূপ হওয়া আবশ্যক, যে এতদ্দেশীয় লোকের অনায়াসে হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে।

৪র্থ। পুস্তকখানি মুদ্রিত হইলে তাহার পৃষ্ঠা সংখ্যা ১২ পৃষ্ঠা ফরমার ১০০ পৃষ্ঠার ন্যূন না হয়।

৫ম। যে পুস্তকের লিখিত এই নিয়মানুসারে পুরস্কার প্রদান করা হইবেক, তাহাতে লেখকের কোন স্বত্ব থাকিবেক না।

৬ষ্ঠ। নূতন লিখিত পুস্তক প্রথমতঃ সমাজের অধ্যক্ষগণের বিবেচনাধীন হইবেক। কিন্তু সকল গ্রন্থকারেরাই তাঁহাদিগের ইচ্ছামত যন্ত্রালয়ে কেবল প্রথমবার আপন আপন গ্রন্থ মুদ্রিত করিয়া দিতে পারিবেন।

৭ম। পুস্তক প্রচারিত হওনাবধি এক বৎসরের মধ্যে ২০০০ দুই হাজার পুস্তক যদি যথার্থতঃ বিক্রয় হয়, তবে সমাজের অধ্যক্ষেরা গ্রন্থকারকে পুনর্ব্বার পুরস্কার প্রদান করিবেন। ঐ পুরস্কার ৫০ টাকার ন্যূন হইবে না।

ই, বি কাউয়েল

(গ)

রাজেন্দ্রলাল মিত্র

'বিবিধার্থ সংগ্রহে' রাজেন্দ্রলালের বহু রচনাই মুদ্রিত হইয়াছিল। 'বঙ্গ-ভাষানুবাদক সমাজ' হইতে এই রচনাগুলি অবলম্বনে অন্ততঃ তাঁহার তিনখানি বই প্রকাশিত হয়।

১। **শিল্পিক দর্শন**। অর্থাৎ প্রয়োজনীয় পদার্থ কতিপয়ের প্রস্তুত করণের বিবরণ গ্রন্থ। সেপ্টেম্বর, ১৮৬০। ১৭০ পাতার সচিত্র গ্রন্থ।

বিষয় বস্তু: অহিফেন, আলকাতরা, কর্পূর, কাগজ, কৃত্রিম মুক্তা, গাঁজা, চরস, চর্ম্ম পুরস্কার করণের প্রথা, ঢাকাই বস্ত্র, কয়লা, বাতি, নীল, লৌহ, শাল ও মাদক দ্রব্য ইত্যাদি।

২। **শিবজীর চরিত্র** অর্থাৎ যবন প্রমর্দ্দক মহারাষ্ট্রীয় বীরপ্রধানের জীবন বৃত্তান্ত। নবেম্বর ১৮৬০। পৃঃ ৭৮।

৩। **মেবারের রাজেতিবৃত্ত**।

(ঘ)

হরিনাথ মজুমদারের যে কয়েকখানি শিশু-গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছি, তাহা ছাড়াও "একলব্যের অধ্যবসায়" নামে তাঁহার আর একখানি পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছিল।

(ঙ)

১৮৫৮ সালে কালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্যের 'নবনীতিসার' প্রকাশিত হইয়াছিল। বইখানি বিভিন্নবিষয়ক উপদেশমূলক প্রসঙ্গ ও গল্পসংগ্রহ, 'জ্ঞানচন্দ্রিকা' ও 'জ্ঞানার্ণবঃ' প্রভৃতির সমপর্য্যায়ী। রচনা বৈশিষ্ট্যহীন।

(চ)

দশম অধ্যায়ে ইয়োরোপ ও আমেরিকার শিশু-সাহিত্যের আলোচনায় ইভান ক্রাইলভ (ক্রিলফ) এর নামটিও শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করিতে হইবে।

তাঁহার Fables উনবিংশ শতাব্দীর বিশ্বসাহিত্যে একটি বিশিষ্ট দান, ঈশপ, লা ফঁতেন এবং হ্যান্স্ অ্যাণ্ডারসনের পার্শ্বেই তাঁহার আসন।

(ছ)

রবীন্দ্র-রচনাবলীর দ্বিতীয় খণ্ডে 'রাজর্ষি'র ভূমিকায় শিশু-সাহিত্য সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মূল্যবান মন্তব্য স্মরণীয়: "অল্পবয়সের ছেলেদেরও সম্মান রাখার দরকার আছে, এ কথা শিশু সাহিত্যলেখকেরা প্রায় ভোলেন। সাহিত্য রচনায় গুণী-লেখনীর সতর্কতা যদি না থাকে, যদি সে রচনা বিনা লজ্জায় অকিঞ্চিৎকর হয়ে ওঠে, তবে সেটা অস্বাস্থ্যকর হবেই, বিশেষতঃ ছেলেদের পাকযন্ত্রের পক্ষে। দুধের বদলে পিঠুলিগোলা যদি ব্যবসার খাতিরে চালাতেই হয় তবে সে ফাঁকি বরঞ্চ চালানো যেতে পারে বয়স্কদের পাত্রে, তাতে তাদের রুচির পরীক্ষা হবে; কিন্তু ছেলেদের ভাগে নৈব নৈব চ।"

(জ)

সংশোধন

যথাসম্ভব সতর্কতা সত্ত্বেও কয়েকটি মুদ্রণপ্রমাদ বইটিতে ঘটিয়া গিয়াছে। যেগুলি গুরুত্বপূর্ণ সেগুলি সংশোধন করিয়া দেওয়া হইল :

পৃষ্ঠা ও পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৫, ৪	'বালক' ১৮৮৪	'বালক' ১৮৮৫
১১, ১৪	১৯০৬ সালে	১৯০৭ সালে
৩১, ১৩	মনোরঞ্জনেতিহাস (১৮৪২)	মনোরঞ্জনেতিহাস (১৮১৯)
৩৬, ১৫	এপ্রিল (১৮১০)	এপ্রিল (১৮২০)
৮০, ১৫	শিবাজীর চরিত্র, রামনারায়ণ	শিবজীব চরিত্র, রাজেন্দ্রলাল মিত্র
১৬৯, ২৫	জ্যৈষ্ঠ, ১৩২০	জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৩
১৭০, ১৩	„ ১৩০৩	„ ১৩০৪
১৭১, ১৪	চৈত্র, ১৩০১	চৈত্র, ১৩০২
২৬২, ৮	১২৮০	১২৮৭
২৮০, ১	"১৩২০ হইতে ১৩২৮"	"১৩২০ হইতে ১৩২২-এর পৌষ পর্য্যন্ত আমৃত্যু"
,, ৩	১৩৩৩	১৩৩০
,, ২০	,,	,,
২৯৩, ১	"দাদা গো দাদা"	"বলব কি ভাই"
২৯৪, ১৮	১৮৭৬ সালে	১৮৭৬ ও ১৮৮৪ সালে
,, ২০	Hurklberry	Huckleberry
৩০৪, ৪	"ইশপ পাবেন না"	"ইশপ হইতে পাবেন না"

১৩৮ ও ১৪২ পৃষ্ঠার ১৫ ও ২১ পংক্তিতে 'সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজে'র স্থলে 'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম-সমাজ' হইবে। অন্যান্য যে-সমস্ত ভুলত্রুটি রহিয়া গেল, সেগুলি গ্রন্থপাঠে প্রতিবন্ধকতা রচনা করিবে না আশা করি।

নামপঞ্জী

খ

গ

চ

ছ

জ

ভ

ম

ল

শ

স

হ

আলোচিত গ্রন্থাবলী

আত্মচরিত—শিবনাথ শাস্ত্রী

রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ—শিবনাথ শাস্ত্রী

সংবাদপত্রে সেকালের কথা (দুইখণ্ড)—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

বাংলা সাময়িক পত্র (দুইখণ্ড)—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্য—কেদারনাথ মজুমদার

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস—ডঃ সুকুমার সেন

বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (প্রথম খণ্ড) ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

যুগন্ধর মধুসূদন—ডঃ শীতাংশু মৈত্র

বাংলা গদ্যের প্রথম যুগ—সজনীকান্ত দাশ

বৃহদ্বঙ্গ—ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন

বঙ্গভাষা ও সাহিত্য—ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন

বিদ্যাসাগরের জীবনচরিত—চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়

মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত—যোগীন্দ্রনাথ বসু

মধুস্মৃতি—নগেন্দ্রনাথ সোম

অক্ষয়কুমার দত্তের জীবনচরিত—মহেন্দ্রনাথ রায়, বিদ্যানিধি

কেশব-চরিত—চিরঞ্জীব শর্ম্মা

রবীন্দ্র-জীবনী (সমগ্রভাবে)—প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

সাহিত্য-সাধক চরিতমালা (বিভিন্ন খণ্ড)—বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ

মধুসূদন গ্রন্থাবলী—বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ

সেকাল আর একাল—রাজনারায়ণ বসু

ভারতের জাতীয় কংগ্রেস (দ্বিতীয় খণ্ড)—হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত

রবীন্দ্র রচনাবলী (বিভিন্ন খণ্ড)

আপন কথা—অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ঘরোয়া—অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রমদাচরণ সেনের জীবনী—

এইগুলি ছাড়া অসংখ্য পত্র-পত্রিকা এবং ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ, স্কুলবুক সোসাইটি প্রভৃতির বহু রিপোর্ট ব্যবহৃত হইয়াছে।

The Mermaid Man (Story of My Life)—Hans Christian Anderson.

The History of Children's literature—Elva S. Smith

A Critical History of Children's Literature - Meig, Eaton, Nesbitt and Viguers.

"Longer Flight"—Annis Duff

"Bequest of Wings"—Annis Duff

The Unreluctant Years—Lilian H. Smith

The Child and His Book—E. M. Field.

Tales of Grimm and Anderson (Introduction)

On Literature—Maxim Gorky

A History of American Literature—Macmillan (specially Vol. V)

A History of English Literature—A Compton Rickett

A History of Eglish Literature—E. Legouis and L. Cazamian

The New Encyclopaedia (For children) Ed. by Hammerton (Various Volumes)

The Child's World (Various Volumes)

Encylopaedia Britannica (Various Volumes)